উত্থিত আফ্রিকা

অংশু দত্ত

অধ্যাপক, ইউনিভারসিটি কলেজ,

কেপকোস্ট, ঘানা।

আনন্দধারা প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র, ১৩৭৪

প্রকাশক :
মনোরঞ্জন মজুমদার
আনন্দধারা প্রকাশন
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

মুদ্রাকর :
বীরেশ্বর চক্রবর্তী
স্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রিণ্টার্স
১১৫-এ, আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা - ৯

প্রচ্ছদপট :
খালেদ চৌধুরী

১২.০০

ভূমিকা

১৯৫৩ সালে লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর ফ্রেডেরিক মারি ফন্ আসবেক-এর অনুপ্রেরণায় আমি আফ্রিকার সমস্যাবলী বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হই। তার আগে আফ্রিকা মহাদেশে ইওরোপীয় শাসন সম্পর্কে আমার ছিল ভাসাবাসা জ্ঞান এবং শোষিত ও অত্যাচারিত আফ্রিকানদের প্রতি সহানুভূতি। তথ্যের অভাবে কখনও ইওরোপীয় শাসনের বিশেষ কোন দিক আতসী কাঁচের চশমায় দেখতুম। পক্ষান্তরে ইতিহাসের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কোন উপাদান হয়তো উপেক্ষিত হত। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক ফন্ আসবেক্-এর তত্ত্বাবধানে লেইডেনের আফ্রিকা ইন্সটিট্যুট, লণ্ডনের তৎকালীন রয়্যাল এম্পায়্যার সোসাইটি ও কলোনিয়্যাল অফিস পাঠাগারের বই, পত্রপত্রিকা ও দলিল থেকে আফ্রিকার বিশেষ কয়েকটি সমস্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু মালমশলা সংগ্রহ করি।

পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভাগে 'বর্তমান আফ্রিকা' পড়াতে গিয়ে আমাকে নতুন নতুন তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহের কাজে মন দিতে হল। আর এর সঙ্গে অনেক নতুন প্রশ্ন মনে জাগল, যেগুলির ওপর আলোকপাত করা না হলে বর্তমান আফ্রিকার স্বরূপ বোঝা অসম্ভব হয়। এইসব প্রশ্ন, তাদের যুগোপযোগিতা ও প্রাসঙ্গিকতা আরও তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছি ১৯৬০ সালে, যখন সারা আফ্রিকায় অনেকগুলি দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এইরকম পরিস্থিতিতে বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পনা আমার মাথায় আসে।

১৯৬০ সালের মাঝামাঝি গ্রন্থরচনা শুরু করার পর আমি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি। দিল্লীতে থাকাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্ট-মেণ্ট অফ আফ্রিকান স্টাডিজ, সপ্রুভবনের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স ও ভারতসরকারের বৈদেশিক মন্ত্রিদপ্তরের ঐতিহাসিক বিভাগের পাঠাগার থেকে বহুমূল্য সাহায্য পেয়েছি। পরে ১৯৬৪ সালের শেষে ঘানায় অধ্যাপনা করতে এসে লেগনে ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগারের 'আফ্রিকানা' বিভাগ থেকে আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি, যেগুলি ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য।

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সাধারণভাবে আফ্রিকা হলেও আমরা সাহারা মরুভূমির দক্ষিণস্থিত আফ্রিকার ওপর মনোনিবেশ করেছি। উত্তর

আফ্রিকার ইতিহাস ও ভূপ্রকৃতি, অধিবাসীদের ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং এখানকার রাজনীতির গতিপ্রকৃতি পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সূচিত করে। তাই পশ্চিম এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্নভাবে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলি সম্পর্কে আলোচনা কতদূর সফল হবে সন্দেহ। তাছাড়া, বর্তমান গ্রন্থের সীমাবদ্ধ পরিসরে উক্ত আলোচনা অগভীর হতে বাধ্য। অতএব আমরা সাহারোত্তর আফ্রিকাকে আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে রেখেছি।

আমাদের নানা সমস্যার বিচারে যেসব ইংরাজী শব্দ এসে পড়েছে, সাধারণতঃ তাদের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছি। অবশ্য যেখানে ইংরাজী শব্দগুলি কোন ব্যক্তি, স্থান, রাজনৈতিক দল, কোন বিশেষ আইন, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম, সেখানে আসল নামটি আমরা বাংলা হরফে লিখেছি। বিদেশী শব্দ বাংলা অক্ষরে লেখা সবসময় সহজ নয়। ইংরাজী 'z'-এর সঙ্গে তুলনীয় বাংলায় কোন হরফ নেই। বাধ্য হয়ে 'z'-এর জায়গায় বাংলা 'জ' ব্যবহার করেছি। ইংরাজী 'V' সাধারণতঃ বাংলায় 'ভ" দিয়ে লেখা হয়, যদিও 'V' ও 'ভ'-এর উচ্চারণ ঠিক এক নয়। প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষার জন্য বর্তমান গ্রন্থে ইংরাজী 'V'-এর অনুলিখন বাংলা 'ভ'-এর সাহায্যে করা হয়েছে।

বর্তমান প্রচেষ্টার পেছনে আছে বহুলোকের উৎসাহ ও সাহায্য। ভূমিকার সকল্প পরিসরে তাঁদের সকলের নামোল্লেখ অসম্ভব। তবু কয়েক-জনের কথা না বললে এই বই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যাঁরা প্রেরণা জুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অজিত দত্ত, ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর শান্তিনারায়ণ ভার্মা, ডক্টর দিলীপ সিং ও শ্রীরাম রামচন্দানী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রণব ঘোষ। নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম কলেজের অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পড়ে অনেক ভুলত্রুটি সংশোধন করে দেন। কলকাতার জাতীয় পাঠাগারের শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আফ্রিকা সম্বন্ধে বাংলাভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুতিতে অনেক সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের বহুবিধ সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

৩১শে মার্চ, ১৯৬৭
কেপকোস্ট, ঘানা।

অংশু দত্ত

প্রস্তাবনা

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ যদি হয় এশিয়ার নবজাগরণের যুগ। দ্বিতীয়ার্ধ তবে নিশ্চয়ই আফ্রিকার। পরাধীন আফ্রিকা, অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আফ্রিকা নির্মম সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও অমানুষিক শোষণের শিকার আফ্রিকা আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এতে শুধু আফ্রিকার লাভ নয়, লাভ সারা বিশ্বের। কারণ, পৃথিবীর এই দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশের মুক্তি সাম্রাজ্য-লোলুপতা, পররাজ্য জয় ও শাসনের লালসার বিরুদ্ধে এক চরম আঘাত হানবে।

এই নবজাগ্রত মহাদেশের সংগ্রামী শক্তির বৈশিষ্ট উপলব্ধি ও তার মূল্য-নিয়ন্ত্রণ আজ সমগ্র মানবজাতির দায় ও অবশ্য কর্তব্য। ভারতবর্ষের পক্ষে একথা অধিকতর প্রযোজ্য। আফ্রিকার মত ভারতবর্ষও ইওরোপীয় সাম্রাজ্য-বাদের অধিকারে এসেছিল। আফ্রিকার অধিবাসীদের মত ভারতীয়রাও হয়েছে বর্ণবৈষম্যের শিকার। আজ আফ্রিকার দেশগুলির মত ভারতবর্ষের সামনেও দুটি প্রধান সমস্যা: অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জাতীয় সংহতি। এর ওপর, পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় লক্ষ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত রয়েছে। তাদের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য ও জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক। অতএব, আফ্রিকার আত্মপ্রতিষ্ঠার মূল্যনির্ধারণ আমাদের পক্ষে যত প্রয়োজনীয় তেমন বোধ করি আর কারো নেই।

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় আফ্রিকার গতিপ্রকৃতি বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে এ মহাদেশের অধিবাসীদের শ্রেণীবিভাজন কীভাবে সম্ভব সে-প্রসঙ্গ উঠেছে। এ আলোচনার তাৎপর্য শুধুমাত্র তত্ত্বের ক্ষেত্রে নয়। বর্তমান আফ্রিকায় যে বৃহত্তর ঐক্যের প্রচেষ্টা চলছে তার গতি কোন্‌দিকে হতে পারে বা তার সাফল্য অর্জন কতখানি সম্ভব: এসব প্রশ্নের ওপর আংশিক আলোকপাত করবে শ্রেণীবিভাজন নিয়ে পূর্বোক্ত আলোচনা।

তারপর এসেছি আফ্রিকার আধুনিক ইতিহাসে। সাম্প্রতিক ঘটনা-প্রবাহে অনেককিছু আছে যেগুলি আফ্রিকা বিভাজন, ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাস এবং ইওরোপীয় শাসনের রীতিনীতি না জানলে বোঝা যায় না। অতএব এমন আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

এর সঙ্গে আমরা বিচার করেছি কেমন করে সনাতন উপজাতীয় সমাজ ভেঙে যাচ্ছে, মুদ্রাকেন্দ্রিক অর্থনীতি, আধুনিক শ্রমবিভাগ, উপজাতি নিরপেক্ষ শিক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষ আইন এবং খৃষ্টধর্ম ও ইসলাম প্রাচীন সমাজে অনুপ্রবেশ করছে আর এর পাশাপাশি শহরগুলি চলেছে বাড়তির পথে। এই সব সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর আফ্রিকার নতুন শ্রেণীবিন্যাসের জন্ম দিচ্ছে। এবং নবগঠিত শ্রেণীসমূহ মুক্তি আন্দোলন তথা জাতীয় পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয়ে নেমেছে। সংক্ষেপে রাজনৈতিক চৈতন্যের এই হল পটভূমিকা।

রাজনৈতিক চৈতন্যের জন্মে ও মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও খানিকটা কাজ করে। আজকের দিনের জাতিসংঘের অছিব্যবস্থা তার পূর্বসূরী লীগ অফ্ নেশন্সের ম্যাণ্ডেটস ব্যবস্থা এবং তারও আগেকার আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলি বাদ দিয়ে আজকের আফ্রিকাকে আমরা বুঝতে পারবো না। আন্তর্জাতিক জনমত ও আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং আফ্রিকা নামক অধ্যায়ে আমরা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করেছি।

মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করার আগে আমরা সমগ্র নিগ্রোজাতির (অনাফ্রিকান নিগ্রোসহ) স্বাধীনতা ও সংহতির জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রসঙ্গ যা প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন নামে খ্যাত, প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি। প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, ১৯৫৭ সালকে বিভাজক হিসাবে ধরে। প্রথম যুগ হল পরাধীন আফ্রিকার যুগ। ১৯৫৭ সাল থেকে আফ্রিকার দেশগুলি ধীরে ধীরে এবং ১৯৬০ সালের পর থেকে বিদ্যুৎগতিতে, স্বরাজ লাভ করেছে।

দ্বিতীয় যুগে প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন যেমন রাষ্ট্রানুকূল্য পাচ্ছে এমন সাহায্য প্রথম যুগে অভাবনীয় ছিল। তবু, আজকের আফ্রিকায় ঐক্যচেতনায় পরিষ্কার একটি ফাটল দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে গিনি-মালি ও টানজানিয়া পরিচালিত বামপন্থী শক্তি, অন্যদিকে আইভরীকোস্ট কামেরুণ প্রজাতন্ত্র সেনেগাল পরিচালিত অন্যান্য রাষ্ট্র। বিপরীতমুখী এই দুই প্রবাহের প্রতিযোগিতা আজ প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের এক বাস্তব বৈশিষ্ট্য।

এর পর, আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ধরে আমরা তাদের মুক্তি-আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনমুখী প্রগতি ও স্বাধীনতার বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলি

বর্ণনা করেছি। সমগ্র ফরাসী সাম্রাজ্যের পতন পৃথক একটি অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। পর্তুগীজ আফ্রিকার শোচনীয় অনগ্রসরতা ও ইদানীং কালের রাজনৈতিক আন্দোলন আমরা আলোচনা করেছি স্বতন্ত্রভাবে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের বর্ণবৈষম্য নীতির বিষময় ফল, সেখানকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত অধিবাসীদের অবস্থা ও দক্ষিণ আফ্রিকান সরকারের বিশ্বরাজনীতিতে কোণঠাসা অবস্থা বর্ণনার জন্য একটি পৃথক পরিচ্ছেদের প্রয়োজন হয়েছে। সর্বোপরি, ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার এযুগের সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে পৃথক একটি অধ্যায়ে।

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

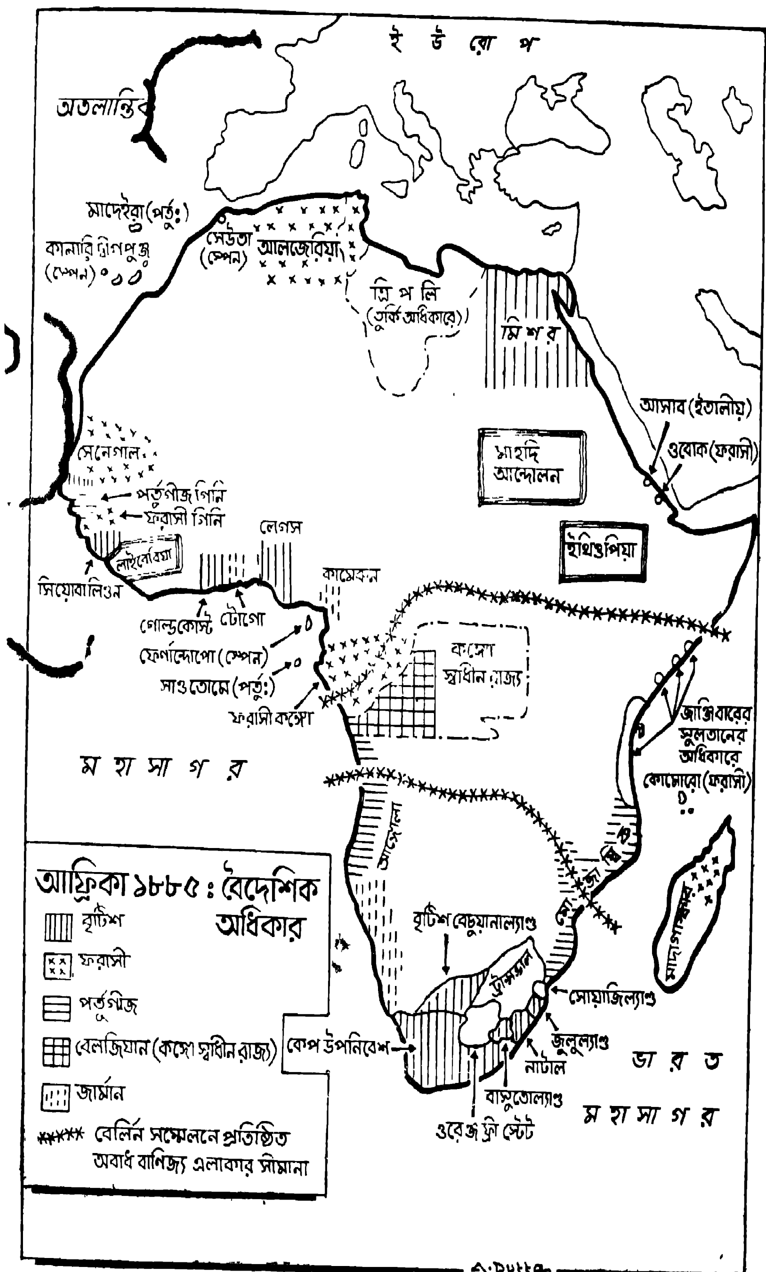


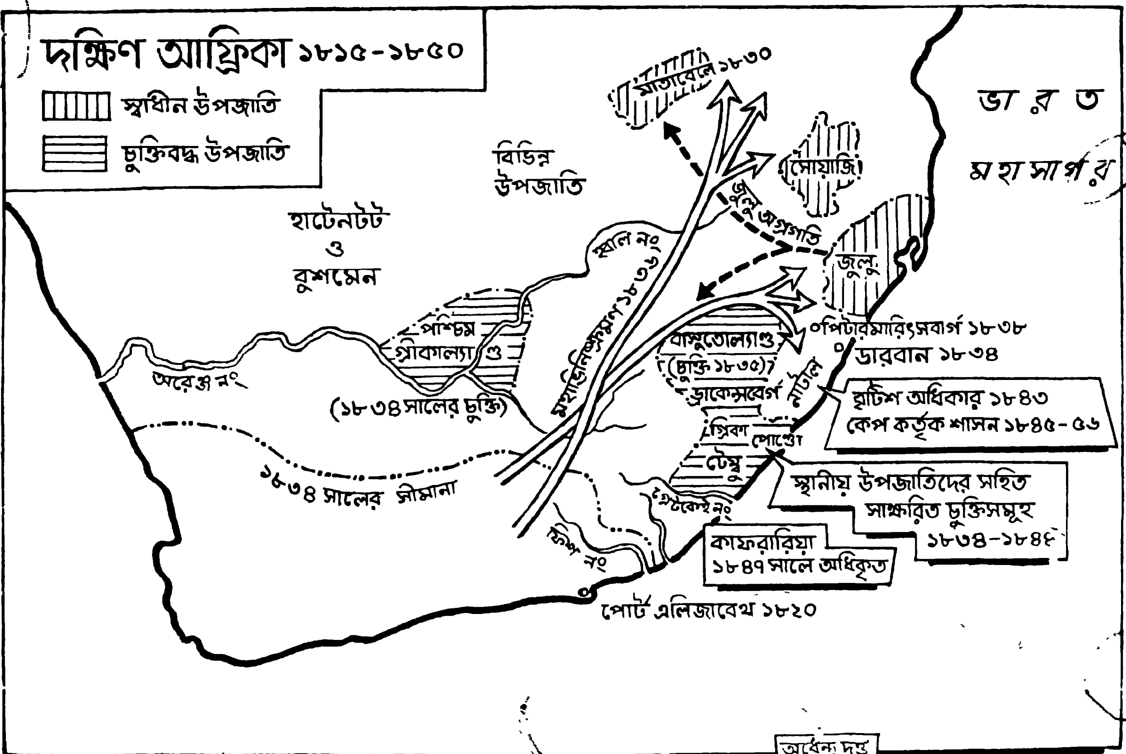
উৎসর্গ

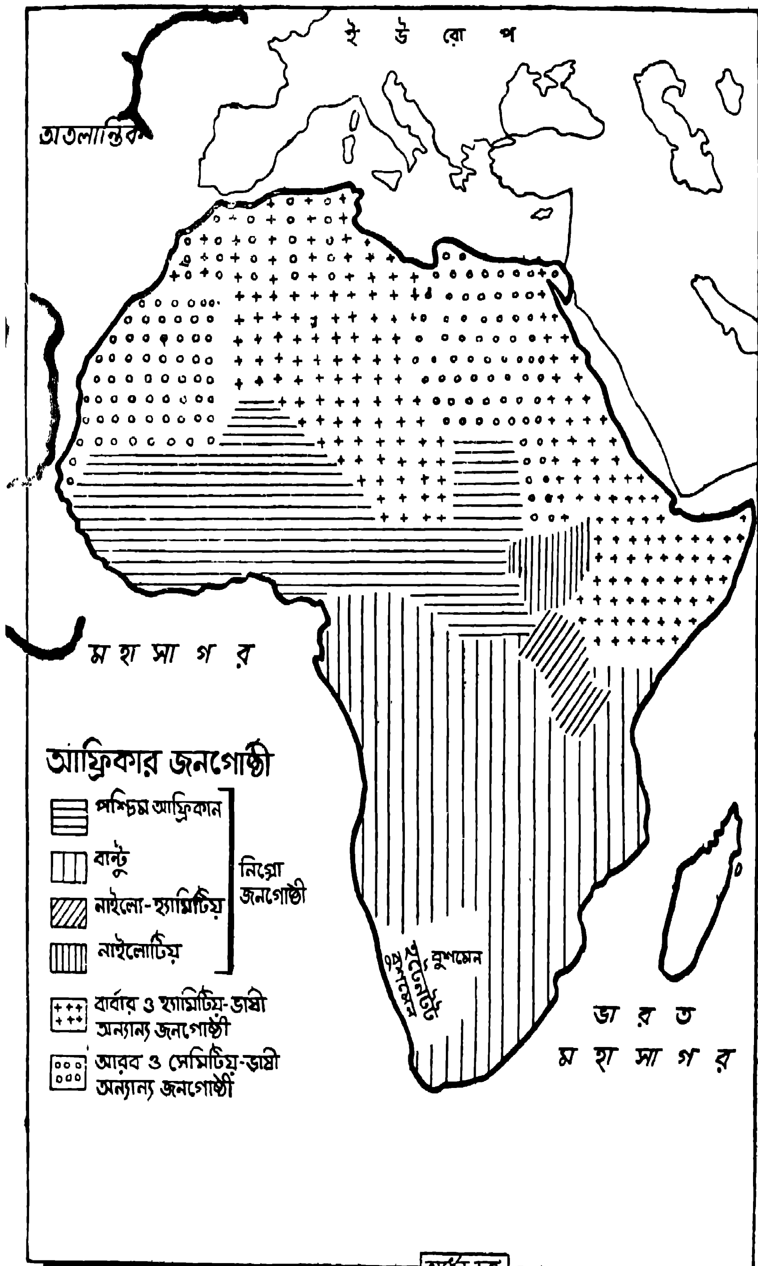
যাঁর কাছে প্রথম হাতেখড়ি
সেই মায়ের পায়ে।

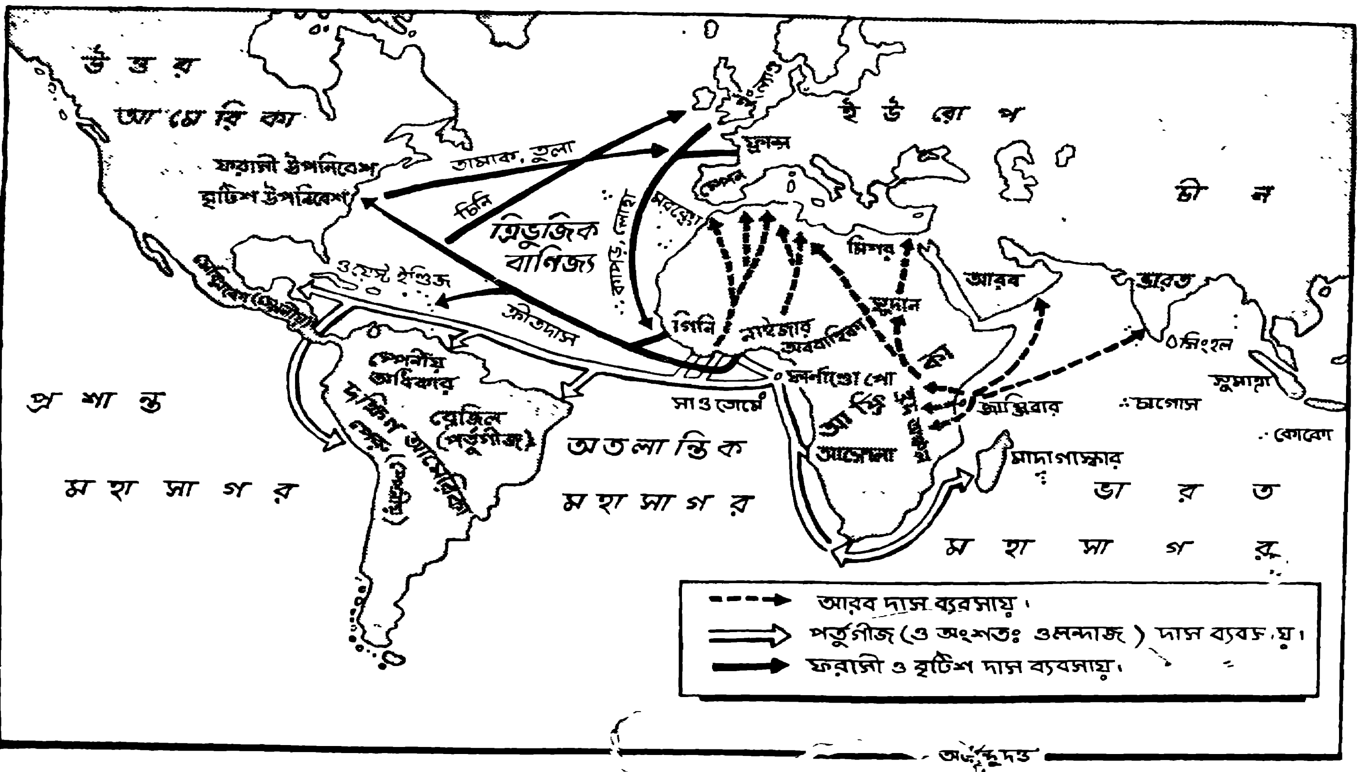
"এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে,
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে ॥"

—রবীন্দ্রনাথ


ই উ রো প
অতলান্তিক
মাদেইরা (পর্তু:)
কানারি দ্বীপপুঞ্জ
(স্পেন)
সেউতা
(স্পেন)
আলজেরিয়া
ত্রিপলি
(তুর্কি অধিকারে)
মিশর
আসাব (ইতালীয়)
ওবোক (ফরাসী)
মাহদি
আন্দোলন
ইথিওপিয়া
সেনেগাল
পর্তুগীজ গিনি
ফরাসী গিনি
লেগস
লাইবেরিয়া
সিয়েরালিওন
কামেরুন
গোল্ডকোস্ট
টোগো
ফের্নান্দোপো (স্পেন)
সাও তোমে (পর্তু:)
ফরাসী কঙ্গো
কঙ্গো
স্বাধীন রাজ্য
জাঞ্জিবারের
সুলতানের
অধিকারে
কোমোরো (ফরাসী)
ম হা সা গ র
অ্যাঙ্গোলা
মাদাগাস্কার
আফ্রিকা ১৮৮৫ : বৈদেশিক
অধিকার
বৃটিশ
ফরাসী
পর্তুগীজ
বেলজিয়ান (কঙ্গো স্বাধীন রাজ্য)
জার্মান
বের্লিন সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত
অবাধ বানিজ্য এলাকার সীমানা
বৃটিশ বেচুয়ানাল্যাণ্ড
ট্রান্সভাল
সোয়াজিল্যাণ্ড
জুলুল্যাণ্ড
নাটাল
কেপ উপনিবেশ
বাসুতোল্যাণ্ড
ওরেঞ্জ ফ্রী স্টেট
ভা র ত
ম হা সা গ র
A. Dutta


দক্ষিণ আফ্রিকা ১৮১৫-১৮৫০
স্বাধীন উপজাতি
চুক্তিবদ্ধ উপজাতি
ভারত মহাসাগর
মাতাবেলে ১৮৩০
সোয়াজি
বিভিন্ন উপজাতি
জুলু অগ্রগতি
জুলু
হাটেনটট ও বুশমেন
ভাল নং
পশ্চিম গ্রীকাল্যাণ্ড
অরেঞ্জ নং
(১৮৩৪ সালের চুক্তি)
বাসুতোল্যাণ্ড (চুক্তি ১৮৩৫)
পিটারমারিৎসবার্গ ১৮৩৮
ডারবান ১৮৩৪
নাটাল
ড্রাকেন্সবের্গ
ব্রিটিশ অধিকার ১৮৪৩
কেপ কর্তৃক শাসন ১৮৪৫-৫৬
প্রিবশ
পোণ্ডো
টেম্বু
স্থানীয় উপজাতিদের সহিত সাক্ষরিত চুক্তিসমূহ ১৮৩৪-১৮৪৫
১৮৩৪ সালের সীমানা
গ্রেটকেই নং
কাফরারিয়া ১৮৪৭ সালে অধিকৃত
ফিশ নং
পোর্ট এলিজাবেথ ১৮২০
অর্ধেন্দু দত্ত


ই উ রো প
অতলান্তিক
মহাসাগর
আফ্রিকার জনগোষ্ঠী
পশ্চিম আফ্রিকান
বান্টু
নাইলো-হ্যামিটিয়
নাইলোটিয়
নিগ্রো জনগোষ্ঠী
বার্বার ও হ্যামিটিয়-ভাষী অন্যান্য জনগোষ্ঠী
আরব ও সেমিটিয়-ভাষী অন্যান্য জনগোষ্ঠী
হটেনটট
বুশমেন
ভারত
মহাসাগর
অর্ধেন্দু দত্ত


উত্তর আমেরিকা
ইউরোপ
চীন
ফরাসী উপনিবেশ
বৃটিশ উপনিবেশ
তামাক, তুলা
চিনি
ত্রিভুজিক বাণিজ্য
কাপড়, লোহা
ফ্রান্স
স্পেন
মরক্কো
মিশর
আরব
ভারত
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
ক্রীতদাস
গিনি
নাইজার
সুদান
সিংহল
সুমাত্রা
সাও তোমে
স্পেনীয় অধিকার
ব্রেজিল (পর্তুগীজ)
দক্ষিণ আমেরিকা
পেরু (স্পেনীয়)
প্রশান্ত মহাসাগর
আতলান্তিক মহাসাগর
আঙ্গোলা
জাঞ্জিবার
চাগোস
কোকো
মাদাগাস্কার
ভারত মহাসাগর
আরব দাস ব্যবসায়।
পর্তুগীজ (ও অংশতঃ ওলন্দাজ) দাস ব্যবসায়।
ফরাসী ও বৃটিশ দাস ব্যবসায়।
অর্দ্ধেন্দু দত্ত

আফ্রিকা ১৯২৪

ই উ রো প

অতলান্তিক

মহাসাগর

টিউনিসিয়া

মরক্কো

রিও দি ওরো

আলজেরিয়া

লি বি য়া

মিশর

ইরিত্রিয়া

সোমালিল্যাণ্ড

ফরাসী

বৃটিশ

ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা

গাম্বিয়া

পর্তুগীজ গিনি

গোল্ড কোস্ট

নাইজেরিয়া

ইঙ্গ-মিশরীয় সুদান

ইথিওপিয়া

সিয়েরা লিওন

লাইবেরিয়া

বৃটিশ ফরাসী

টোগোল্যাণ্ড

বৃটিশ ফরাসী

ক্যামেরুন

স্পেনীয় গিনি

উগাণ্ডা

কেনিয়া

ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড

বেলজিয়ান কঙ্গো

ট্যাঙ্গানিকা

রুয়াণ্ডা উরুণ্ডি

আঙ্গোলা

উঃ রোডেসিয়া

দঃ রোডেসিয়া

মোজাম্বিক

মাদাগাস্কার

দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা

বেচুয়ানাল্যাণ্ড

দঃ আফ্রিকা ইউনিয়ন

সোয়াজিল্যাণ্ড

বাসুতোল্যাণ্ড

ভারত মহাসাগর

বৃটিশ শাসিত উপনিবেশ, ম্যাণ্ডেট ও বৃটিশ প্রভাবিত অঞ্চল এবং আশ্রিত রাজ্য।

পর্তুগীজ উপনিবেশ।

বেলজিয়ান উপনিবেশ ও ম্যাণ্ডেট।

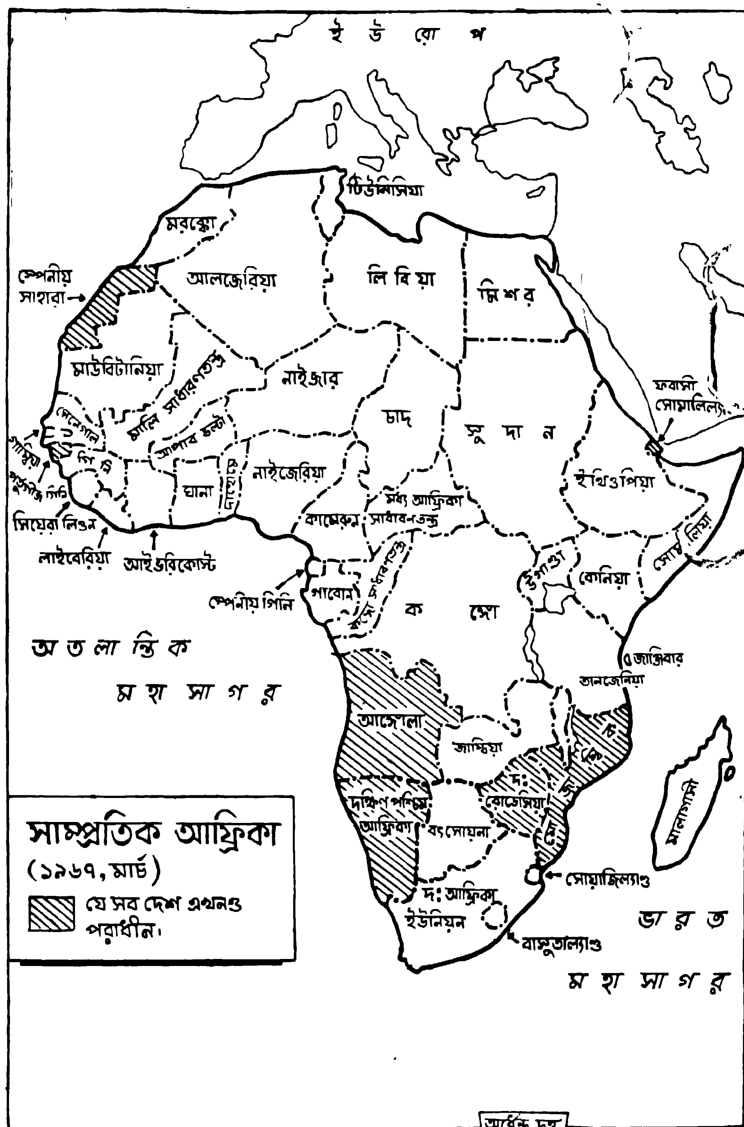
ফরাসী উপনিবেশ, ম্যাণ্ডেট ও প্রভাবিত অঞ্চল এবং আশ্রিত রাজ্য।

ইতালীয় উপনিবেশ।

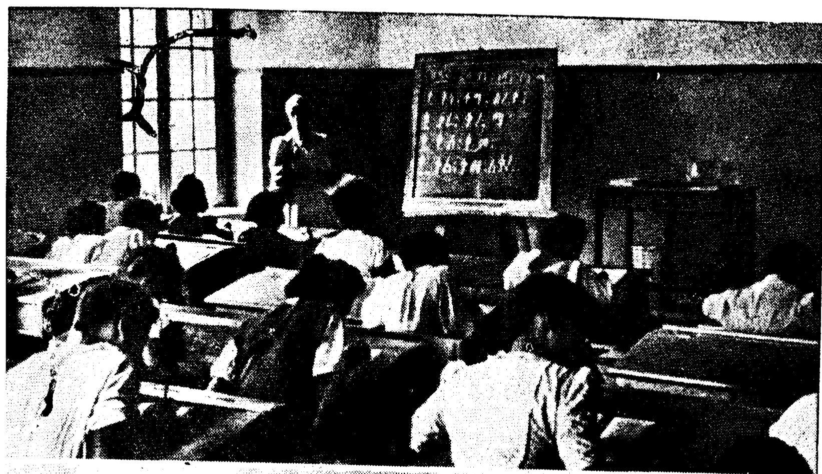
স্পেনীয় উপনিবেশ।

স্বাধীন রাজ্য।

অর্ধেন্দু দত্ত

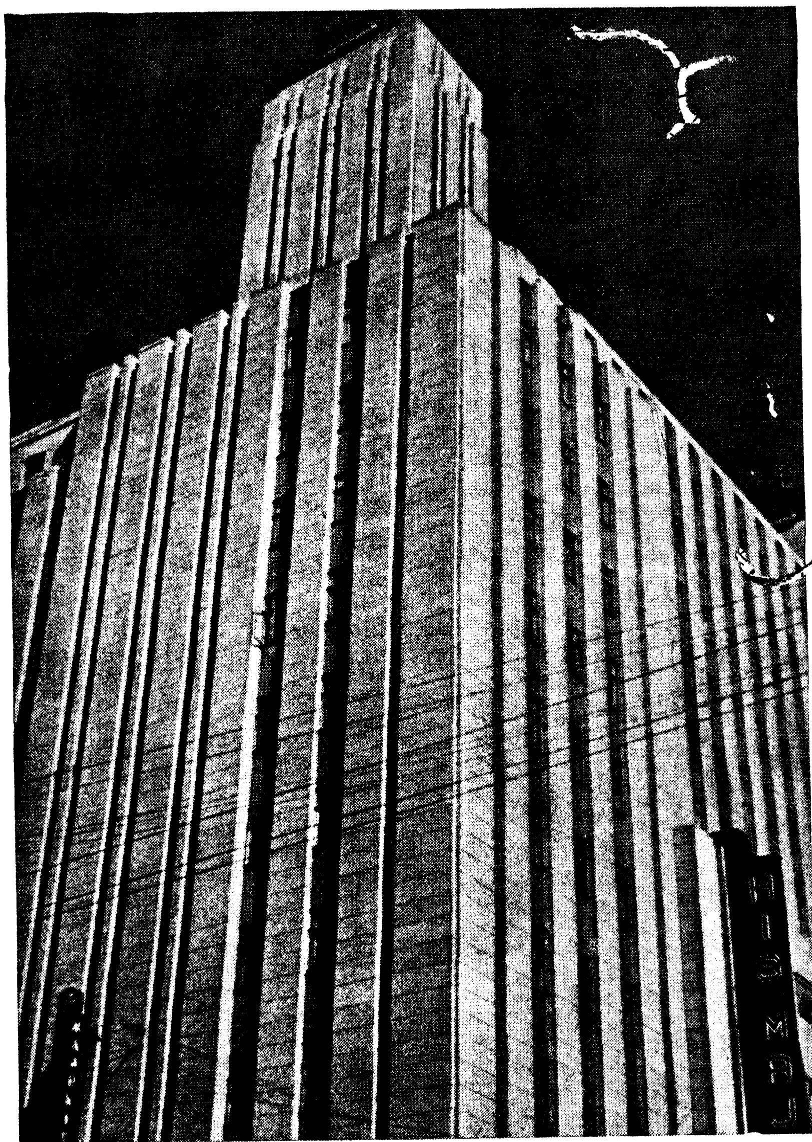


ইউরোপ
টিউনিসিয়া
মরক্কো
স্পেনীয় সাহারা
আলজেরিয়া
লিবিয়া
মিশর
মাউরিটানিয়া
মালি সাধারণতন্ত্র
নাইজার
চাদ্
সুদান
ফরাসী সোমালিল্যা
ইথিওপিয়া
আপার ভল্টা
ঘানা
নাইজেরিয়া
মধ্য আফ্রিকা সাধারণতন্ত্র
কামেরুন
সিয়েরা লিওন
লাইবেরিয়া
আইভরিকোস্ট
স্পেনীয় গিনি
গাবোন
কঙ্গো
কেনিয়া
তানজেনিয়া
জাঞ্জিবার
অতলান্তিক মহাসাগর
আঙ্গোলা
জাম্বিয়া
দ: রোডেসিয়া
দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা
বৎসোয়ানা
দ: আফ্রিকা ইউনিয়ন
সোয়াজিল্যাণ্ড
বাসুতাল্যাণ্ড
মালাগাসী
ভারত মহাসাগর
সাম্প্রতিক আফ্রিকা
(১৯৬৭, মার্চ)
যে সব দেশ এখনও পরাধীন।
অর্ধেন্দু দত্ত

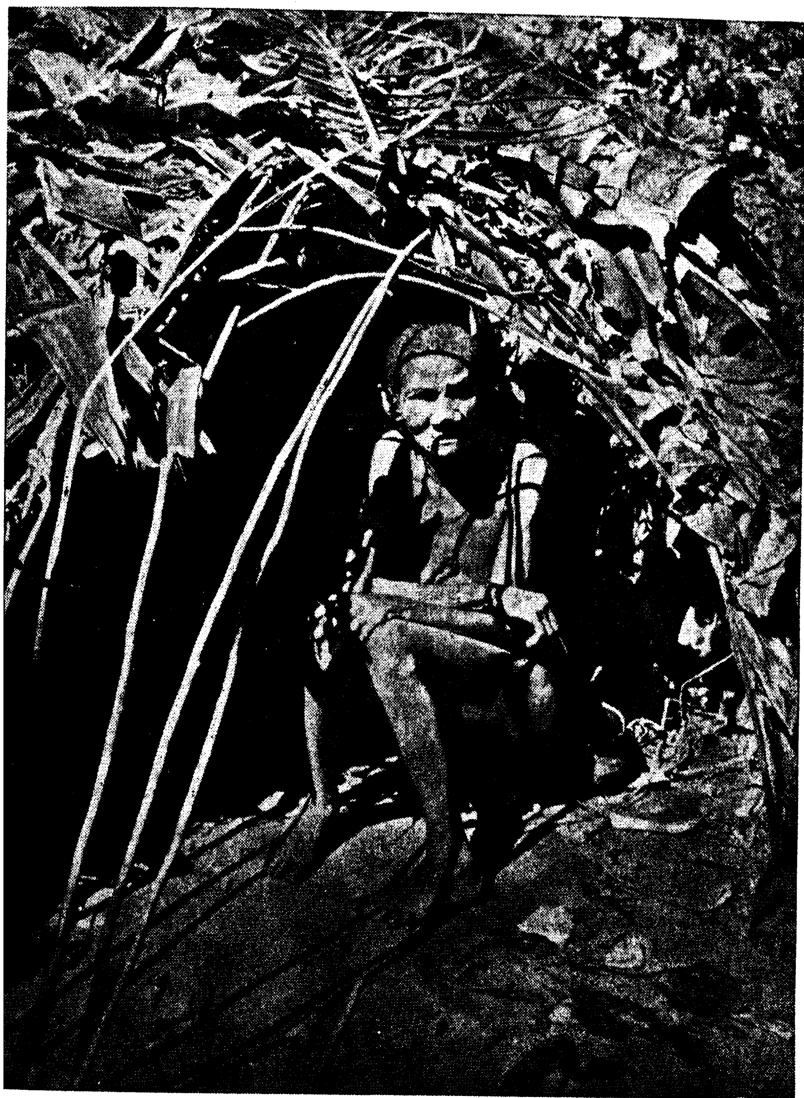




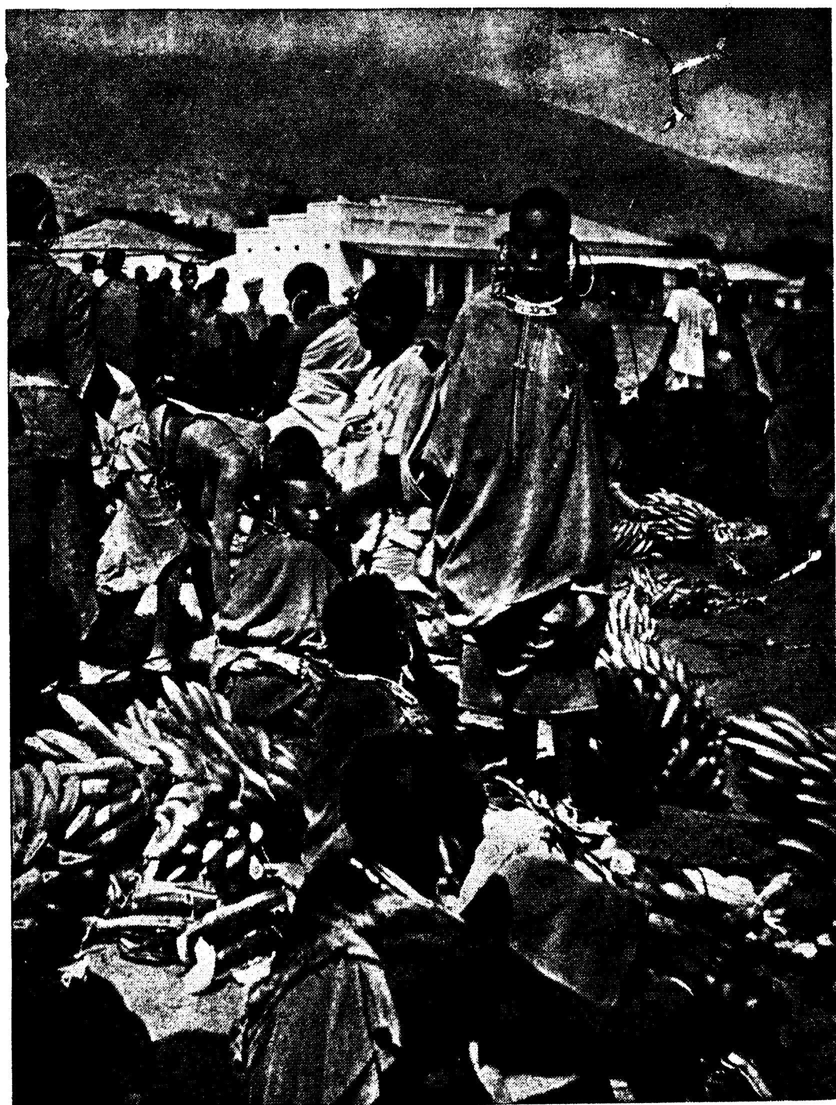
আধুনিক বিদ্যালয়



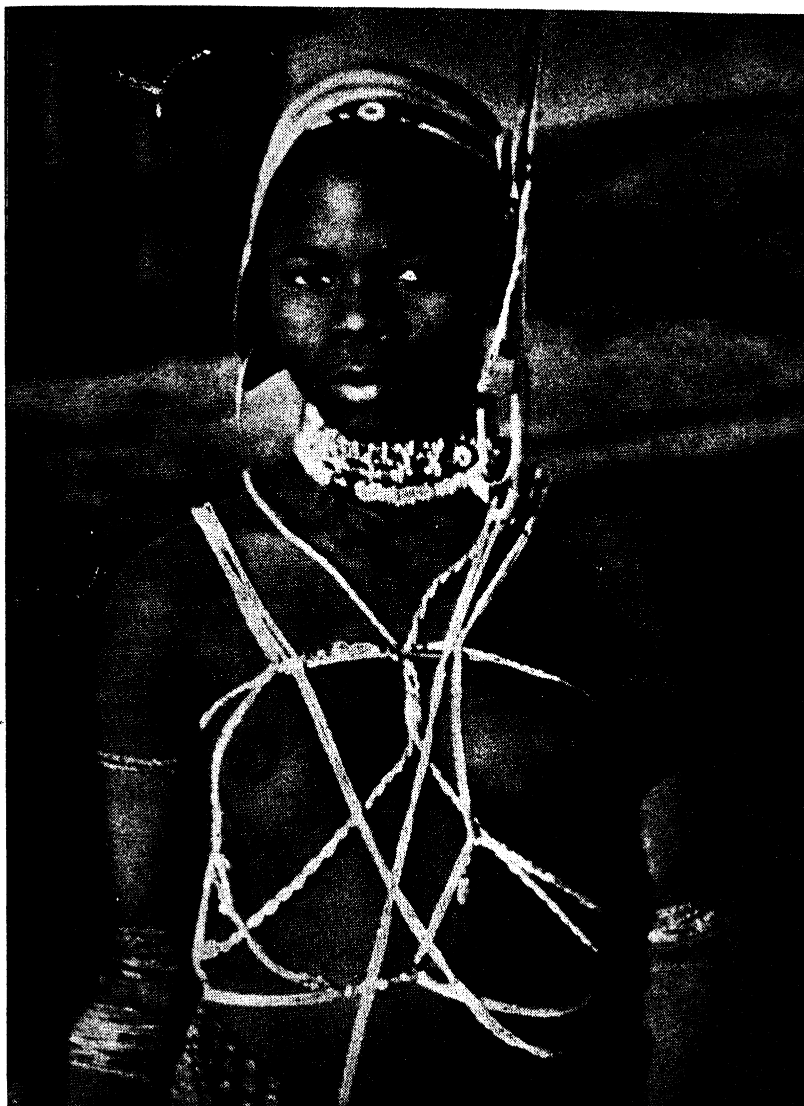
বাড়ি ঃ দক্ষিণ আফ্রিকা



বাড়ি ঃ বেলজিয়ান কঙ্গো



বাজার ঃ কিলিমানঞ্জারের পাদদেশে



নর্তকী





ভবিষ্যতের আশা

প্রথম অধ্যায় : জনগোষ্ঠী, সমাজ ও সংস্কৃতি

এক

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ, আফ্রিকা, ইওরোপের দক্ষিণে ও এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এবং পূর্বে ৫১° পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে পশ্চিমে ১৭½° পশ্চিম দ্রাঘিমা পর্যন্ত আর উত্তরে ৩৭½° উত্তর অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে ৩৪½° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আফ্রিকার আয়তন ১ কোটি ১৭ লক্ষ বর্গমাইলের মত অর্থাৎ ইওরোপের আয়তনের প্রায় তিনগুণ আর ভারতবর্ষের প্রায় নয়গুণ বড়। উত্তর-দক্ষিণে এর বৃহত্তম বিস্তার প্রায় ৫,০০০ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৪,৬০০ মাইল।

আফ্রিকার উপকূলরেখা এশিয়া ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকার তুলনায় সাতিশয় অভগ্ন। অল্প যে ক'টি উপসাগর এ মহাদেশে আছে, তাদের প্রায় কিনারা পর্যন্ত পর্বতশ্রেণী এসে পৌছেছে। ফলে আফ্রিকায় স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ও বন্দর সংখ্যায় কম। সারা আফ্রিকাকে এক সুবিশাল মালভূমি বলা যেতে পারে। নদীগুলি উচ্চভূমি থেকে সবেগে সঙ্কীর্ণ সমতল উপকূলে এসে পড়ার ফলে জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। তাই সাগরপথে আফ্রিকার উপকূলে অবতরণ এবং উপকূলের দিক থেকে নদীপথে মহাদেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ কষ্টসাধ্য। বহির্বিশ্ব থেকে আফ্রিকার বিচ্ছিন্নতার আংশিক ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া যায়।

আফ্রিকার প্রায় মাঝখান দিয়ে বিষুবরেখা অতিক্রম করেছে এবং সমগ্র মহাদেশের আনুমানিক তিন-চতুর্থাংশ উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত। বিষুবরেখার উভয় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নিরক্ষীয় জলবায়ু। সারাবছর প্রচুর বৃষ্টিপাতে এসব জায়গায় গভীর বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের উত্তর ও দক্ষিণে কিছুদূর পর্যন্ত সুদানীয় উষ্ণমণ্ডল। এখানে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত পর্যাপ্ত, কিন্তু শীতকাল বৃষ্টিহীন। তারপর উত্তরে সাহারা ও দক্ষিণ-পশ্চিমে কালাহারি মরুভূমিতে আছে মরুদেশীয় জলবায়ু, যেখানে বৃষ্টিপাত কম ও শীতাতপ চরম।

এছাড়া মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-উপকূলপ্রান্তে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু এবং দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার উচ্চভূমিতে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু রয়েছে।

জলবায়ু সম্পর্কে ওপরের বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি কেন মহাদেশের বিশেষ বিশেষ স্থানে ইওরোপীয় উপনিবেশিকরা বসতি করেছে। যেখানে জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ সেখানে ইওরোপীয় উপনিবেশস্থাপন সম্ভব হয়েছে। উত্তর-পশ্চিমে আলজেরিয়া, পূর্ব আফ্রিকার মালভূমি (কেনিয়া, টানজানিয়া, জাম্বিয়া ও রোডেসিয়া) এবং দক্ষিণ-আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে উল্লিখিত জলবায়ু থাকায়, এই সব দেশে হাজার হাজার ইওরোপীয় এসে স্থায়ীভাবে বাস করছে। আজকের দিনে রোডেসিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে যে বর্ণবিদ্বেষজনিত শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা রয়েছে, তার মূলে প্রকৃতির আংশিক ভূমিকা সুস্পষ্ট।

আয়তনে দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ হলেও, লোকসংখ্যার দিক থেকে আফ্রিকার স্থান চতুর্থ (এশিয়া, ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকার পর)। বিশাল মরুভূমি, গহন অরণ্য, হিংস্র জন্তু ও বিষাক্ত সেৎসি মাছির উপদ্রবে আফ্রিকার জনসংখ্যা বেশী বাড়তে পারে নি। এছাড়া কয়েক শতকব্যাপী দাস ব্যবসায়ের ফলে আফ্রিকা মহাদেশ কয়েক কোটি অধিবাসী হারিয়েছে। আজ আফ্রিকার লোকসংখ্যা ২৪ কোটির মত। এর মধ্যে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলি ও ইথিওপিয়ার জনসংখ্যা ৭ কোটিরও বেশী। অর্থাৎ সাহারার দক্ষিণে অবস্থিত আফ্রিকার লোকসংখ্যা হবে আনুমানিক ১৭ কোটি।

দুই

লোকবসতির ঘনত্ব কম হলেও আফ্রিকার জনসমাজে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে সিয়েরা লিওনের মেণ্ডে আর মালাগাসী প্রজাতন্ত্রের মেরিনা উপজাতির মধ্যে বৈসাদৃশ্য সুস্পষ্ট। তেমনি দক্ষিণ আফ্রিকার হটেনটট ভাষা ও পশ্চিম আফ্রিকার ফুলানি ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য যৎসামান্যই। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোথাও রয়েছে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা, কোথাও আবার দেখতে পাই সমৃদ্ধ কৃষিব্যবস্থা ও কারিগরী উৎকর্ষ। রাজনৈতিক সংগঠনে পূর্বে সুসংগঠিত বুগাণ্ডা রাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণে বুশম্যানদের রাষ্ট্রহীন সমাজের তুলনা কোথায়? অনুরূপভাবে

বিভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়, ইসলাম আর সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার ব্যবহারের সংঘাতেও বিচিত্রতার সন্ধান মেলে।

'রেইস' বা 'জাতি' বলতে আমরা বুঝি কতকগুলি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যূথবদ্ধ একদল লোক। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে আছে মস্তিষ্কের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত, নাসিকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত, ওষ্ঠের আকৃতি, এবং চুল ও চোখের গড়ন। জাতি-অন্তর্গত লোকেরা পুরুষানুক্রমে এগুলি পেয়ে আসছে বলে ধরা হয়। কোন কোন নৃবিজ্ঞানী এই সব সূচক অনুসারে বলে থাকেন যে আফ্রিকার জনগোষ্ঠীসমূহ তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (ক) বুশম্যান, (খ) নিগ্রো, ও (গ) হ্যামিটীয়।

অধ্যাপক সেলিগম্যান তাঁর 'রেইসেজ অফ আফ্রিকা' নামক গ্রন্থে আলোচ্য মহাদেশের জনগোষ্ঠীর যে শ্রেণীবিভাজনের ছক কেটেছেন সেটা পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাজন থেকে অধিকতর ব্যাপক। সেলিগম্যানের মতে আফ্রিকার অধিবাসীদের নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (১) হ্যামিটীয়, (২) সেমিটীয়, (৩) নিগ্রো, (৪) বুশম্যান, (৫) হটেনটট, (৬) নিগ্রিলো ও পিগমী। সেলিগম্যান বলেছেন হ্যামিটীয় ও সেমিটীয়দের উৎপত্তি এক উৎস থেকে এবং বুশম্যান ও হটেনটটদের সাদৃশ্যের জন্য এদের যুক্তভাবে 'খয়সান' শ্রেণী বলা যেতে পারে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, সেলিগম্যানের শ্রেণীবিভাজনের ভিত্তি পুরোপুরি নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নয়, ভাষাবিন্যাসও বটে। বই-এর যে পৃষ্ঠায় তিনি পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাজনের প্রস্তাব করেছেন, তার ঠিক উল্টো পৃষ্ঠায় অধ্যাপক স্ট্রাক-প্রস্তুত আফ্রিকার ভাষাভিত্তিক মানচিত্রের ছবি দেওয়া হয়েছে এবং লেখক স্পষ্ট করে বলেছেন যে তাঁর প্রস্তাবিত শ্রেণীবিভাজনে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ভাষাতত্ত্বেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অন্যত্র তিনি মন্তব্য করেছেন যে ভাষাতত্ত্বের ব্যবহৃত নাম কোন কোন জনগোষ্ঠীকে বোঝাবার জন্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে এবং বুদ্ধিমানের মত প্রয়োগ করলে এতে অসুবিধা কিছু নেই। উদাহরণস্বরূপ বাণ্টুদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক-ভাবে বলতে গেলে 'বাণ্টু' নামটি কতকগুলি ভাষা ও উপভাষাকে বোঝায়। কিন্তু জাতিতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাজনের পরিভাষাতেও বাণ্টু নামটি কখনও কখনও স্থান পেয়েছে।

তাঁর প্রস্তাবিত শ্রেণীবিভাজনে সেলিগম্যান অবশ্য আফ্রিকার এমন

অধিবাসীদের কথা বলেন নি যাদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য মঙ্গোলীয় এবং যারা প্রধানতঃ বাস করে মালাগাসী প্রজাতন্ত্রে। উর্ধ্বোক্ত শ্রেণীগুলির সঙ্গে এদের যোগ করলে, আফ্রিকার ব্যাপক নৃতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাজন নিম্নরূপ হতে পারে :

I. **ককেসীয়** (সেলিগম্যানের সেমিটীয় ও হ্যামিটীয়): এদের গড়ন মাঝামাঝি; গায়ের রং হাল্কা বাদামী; সরু থেকে মাঝামাঝি চ্যাপ্টা নাক; মাথার খুলি নাতিপ্রস্থ; সোজা কিংবা ঢেউ খেলানো চুল; ঠোঁট খুব পাতলা বা মোটা নয়।

II. **মঙ্গোলীয়** : এরা হ্রস্বকায়, এদের গায়ের রং বাদামী-হলুদ; মাথার খুলি চওড়া থেকে মাঝামাঝি রকমের চওড়া; চ্যাপ্টা নাক; ঠোঁট খুব পাতলা বা মোটা নয়।

III. **নিগ্রো** : এরা দীর্ঘকায়, এদের গায়ের রং গভীর বাদামী; মাথার খুলি সরু; চ্যাপ্টা নাক; চুল খুব কোঁকড়ানো; পুরু ওল্টানো ঠোঁট।

IV. **বুশম্যান** : এরা হ্রস্বকায় (দৈর্ঘ্য ৫ ফিটেরও নীচে); এদের গায়ের রং হাল্কা বাদামী-হলুদ; সরু থেকে মাঝামাঝি চওড়া মাথার খুলি; পাতলা কিন্তু ওল্টানো ঠোঁট; উঁচু গালের হাড়।

V. **পিগমী** : এরা খুবই হ্রস্বকায়; এদের গায়ের রং উজ্জ্বল বাদামী-হলুদ; সরু থেকে মাঝামাঝি চওড়া মাথার খুলি; চ্যাপ্টা নাক; খুব কোঁকড়ানো চুল; ঠোঁট খুব মোটা না হলেও ওল্টানো।

তিন

জাতি বা 'রেইস' অনুসারে আফ্রিকানদের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের প্রধান অসুবিধা হল এই যে, এমন আলোচনা থেকে জনসমাজের সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারি না। জ্ঞাতিত্ব, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের সমীক্ষায় হয়তো তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

আফ্রিকার জনসমাজে জ্ঞাতিত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। রক্তসম্বন্ধে শুধুমাত্র উত্তরাধিকারের বিচার হয় না। পদাধিকার পারম্পর্য, বিবাহোত্তর বাসস্থান, নবজাত শিশুর নামকরণ প্রভৃতি নানাবিষয়ে এর প্রাসঙ্গিকতা আছে। এছাড়া আফ্রিকার অধিকাংশ উপজাতির মধ্যে জ্ঞাতিগোষ্ঠীগুলি যৌথভাবে অঙ্গ

অনেক কাজ চালিয়ে থাকে, যার মধ্যে পড়ে যৌথসম্পত্তি পরিচালনা, বিবাহ ও শ্রাদ্ধে পারস্পরিক সহযোগিতা, পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ, ইত্যাদি।

আফ্রিকা মহাদেশে জ্ঞাতিত্বের প্রকারভেদ আছে। পশ্চিম আফ্রিকায় আকান উপজাতিরা মাতৃতান্ত্রিক। আকান শিশু জন্মাধিকারে তার মা'র জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সভ্যপদ লাভ করে। এই গোষ্ঠীর সম্পত্তিতে ভোগদখলের অধিকার সে পায়। যেখানে জ্ঞাতিত্ব ও রক্তসম্বন্ধ পদাধিকার পারম্পর্যের ভিত্তি, সেসব ক্ষেত্রে মাতুলের উত্তরসূরী হয় ভাগ্নে। দক্ষিণ আফ্রিকার জুলুদের মত অন্য উপজাতিরা হল পিতৃতান্ত্রিক। এমন সমাজে পিতার দিক থেকে পুত্রকন্যার পরিচয় হয় এবং উত্তরাধিকার ও পদাধিকারপারম্পর্য পিতা থেকে পুত্রে বর্তায়। তাছাড়া এমন অনেক সমাজ আছে, যাদের উভতান্ত্রিক বলা যায়। এই ব্যবস্থায় যে কোন লোক জন্মাধিকারে মাতা ও পিতার দিক থেকে একই সঙ্গে দুটি পৃথক জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সদস্য হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে সে তার মাতৃজ্ঞাতিগোষ্ঠীর সহযোগিতা পায়। আবার অন্য কয়েকটি বিষয় পিতৃজ্ঞাতিগোষ্ঠীর এক্তিয়ারে পড়ে। 'নাইজেরিয়ার ইয়াকোদের জ্ঞাতিত্বের বনিয়াদ হল উভতান্ত্রিক। সর্বোপরি, জাম্বিয়ার লোজি এবং কিছু কিছু বুশম্যান উপজাতির মত এমন সমাজও আফ্রিকায় আছে, যেখানে সর্ববিষয়ে পিতা ও মাতা উভয়ের দিক থেকে জ্ঞাতিকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়।

জ্ঞাতিত্বের মত আফ্রিকার সনাতন রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। প্রাক্-ইওরোপীয় যুগের পশ্চিম আফ্রিকায় ঘানা, মালি ও সঙ্ঘাই, মধ্য আফ্রিকায় কঙ্গো, দক্ষিণ আফ্রিকায় জুলু, এবং পূর্ব আফ্রিকায় জাঞ্জিবার ও বুগাণ্ডা প্রভৃতি সুসংগঠিত রাজ্য সুপরিচিত। এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা রাজা ও তাঁর উপদেষ্টাদের হাতে থাকে। রাজ্যের বিভিন্ন কর্মচারী নিয়োগ করেন রাজা। তিনিই সর্বপ্রধান কর্মকর্তা ও উচ্চতম বিচারক।

আফ্রিকার সব উপজাতিই কিন্তু অনুরূপ ব্যবস্থায় শাসিত হত না। অনেক সমাজে এমন কোন কর্মকর্তা বা প্রধান ছিল না, যাকে শাসক বা রাজা বলা চলে। দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যান ও বের্গদামারা ছোট ছোট জ্ঞাতিগোষ্ঠীতে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। যদিও প্রতি গোষ্ঠীর একজন করে প্রধান থাকে, তবু তাকে শাসক না বলে নেতা বলাই উচিত। এদের সমাজে ফৌজদারী অপরাধের আনুষ্ঠানিক বিচারের ব্যবস্থা নেই। কেউ বার বার অপরাধ করলে

গোষ্ঠীর সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য মিলে অপরাধী সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ণয় করবে। দরকার হলে গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার জন্য তরুণ যুবকরা এগিয়ে আসবে।

সুদানের ন্যুয়ার ও উত্তর ঘানার তালেনসি উপজাতিদের মধ্যে জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে ছাড়িয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব নেই। অথচ জ্ঞাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান এবং প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগের ফলে কেন্দ্রীয় শাসন বিনাই উপজাতির মধ্যে রাজনৈতিক তারতম্য বজায় থাকে।

সনাতন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মত আফ্রিকার বিভিন্নাংশের অর্থনৈতিক বনিয়াদও বিচিত্রধর্মী: শিকার, বনজঙ্গল থেকে ফলমূল সংগ্রহ, মাছধরা, পশুপালন, কৃষি ও এদের বিভিন্ন সমন্বয়।

কঙ্গো অববাহিকায় পিগমীরা, দক্ষিণ আফ্রিকায় বুশম্যানরা, উত্তর টানজানিয়ায় কিণ্ডিজা ও পশ্চিম কেনিয়ায় দোরোবো উপজাতিরা প্রধানতঃ প্রকৃতির দানের উপর নির্ভরশীল।

গিনি উপকূলের কতকাংশে এবং নাইজার ও কঙ্গো নদীর তীরে স্থানীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড হল মৎস্যশিকার। সাহারা ও কালাহারি মরু অঞ্চলে অনেক উপজাতি প্রধানতঃ পশুপালক। এদের মধ্যে সাহারার তুয়ারেগ, পশ্চিম ও মধ্য সুদানের ফুলানি, পূর্ব সুদান ও ইথিওপিয়ার বেজা, ইথিওপিয়া ও সোমালি উপকূলের আফার ও সোমালি, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার হেরেরো এবং দক্ষিণ আফ্রিকার হটেনটটরা প্রধান। অন্য অনেক সমাজ কৃষি ও পশুপালনের সমন্বয় ঘটিয়ে থাকে। পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার বাণ্টু উপজাতিরা তার অন্যতম উদাহরণ। আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্য বাদ দিলে মহাদেশের অন্যান্য অংশে কৃষিই হচ্ছে জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন।

চার

সমাজ সংগঠনের বিচার থেকে এবার ভাষা ও সংস্কৃতির সমীক্ষায় আসা যেতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ আফ্রিকার অনেক ভাষা ও উপভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে মতৈক্য আছে অনেকখানি। অধ্যাপক স্ট্রাকের মতে আফ্রিকার ভাষাগুলি ছয় ভাগে ভাগ করা যায়: (১) সেমিটীয়, (২), হ্যামিটীয়, (৩) সুদানীয়, (৪) বাণ্টু,

(৫) হটেনটট ও (৬) বুশম্যান। এই শ্রেণীবিভাজনের সঙ্গে ওয়েস্টারম্যান-কৃত শ্রেণীবিভাজনের সাদৃশ্য আছে। ওয়েস্টারম্যানের মতে আফ্রিকান ভাষাগুলি তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত : (ক) হ্যামিটো-সেমিটীয় ভাষাসমূহ, (খ) তথা-কথিত 'কৃষ্ণকায়' আফ্রিকানদের ভাষাসমূহ (যার মধ্যে পড়ে সুদানী, বাণ্টু ও নাইলোটিক ভাষাগুলি), ও (গ) খয়সান ভাষাগোষ্ঠী (তার মানে বুশম্যান ও হটেনটট ভাষাসমূহ)।

এই সব শ্রেণীবিভাজনের তুলনায় অধ্যাপক গ্রীনবার্গকৃত আফ্রিকান ভাষার শ্রেণীবিভাজন আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। গ্রীনবার্গ-প্রস্তাবিত শ্রেণীগুলি নিম্নরূপ : (I) নাইজার-কঙ্গো ভাষাগোষ্ঠী, (II) আফ্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠী, (III) সুদানীয় ভাষাগোষ্ঠী, (IV) মধ্য সাহারান ভাষাগোষ্ঠী, (V) হটেনটট বুশম্যান ভাষাগোষ্ঠী। এই পাঁচটি শ্রেণীর প্রতিটির মধ্যে গ্রীনবার্গ একাধিক উপগোষ্ঠীর কথা বলেছেন এবং তাছাড়া আরও সাতটি বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট ভাষাগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন।

পৃথিবীর সর্বত্র ভাষার উদ্ভব ও সম্প্রসারণের সঙ্গে মানুষের গতিবিধি জড়িত আছে। কিন্তু মানুষ যখন স্থানান্তরে যায়, তখন সে শুধু ভাষাই বহন করে নিয়ে যায় না ; সঙ্গে যায় নানা পণ্য, জীবনযাত্রার হরেকরকমের অঙ্গ, ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতির নানা উপাদান। এই জন্য দেখা যায়, ভাষা ও ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতির সীমারেখা অনেকাংশে এক। ভাষার ওপর ভিত্তি করে গ্রীনবার্গ উল্লিখিত শ্রেণীবিভাজন করে থাকলেও অধ্যাপক হার্সকোভিট্স-এর আফ্রিকা মহাদেশের 'সংস্কৃতি অঞ্চলে' বিভাজনের সঙ্গে তার যথেষ্ট মিল আছে।

সম্প্রতিকালে আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ্ ও সমাজবিজ্ঞানী মহলে বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 'সংস্কৃতি অঞ্চল' সমূহে বিভক্ত করার দিকে ঝোঁক গেছে। এই প্রবণতা উঠেছে জাদুঘর পরিচালনার সুবিধার জন্য। অধ্যাপক ফ্রান্স বোয়াসই সর্বপ্রথম জাদুঘরের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানোর প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। আর তা করতে গেলে বোয়াসের মনে হল সাংস্কৃতিক উপাদানের বণ্টন অনুসারে কোন দেশ বা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভাজন অনেক দিক দিয়ে সুবিধাজনক হবে।

'সংস্কৃতি' বলতে অবশ্য আমেরিকান পণ্ডিতেরা সভ্যতার মননশীল দিক ছাড়াও বুঝেছেন জীবনযাত্রা পদ্ধতি ও উপায় এবং অন্য জাগতিক উপা-দানও। এর ফলে যদিও 'সংস্কৃতি' শব্দটির অস্পষ্টতা কিছুটা ঘুচেছে, কিন্তু

পূর্বোক্ত সব ক'টি উপাদানকে একসঙ্গে বিচার বিবেচনা করা এক দুঃসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধ্যাপক বোয়াস অন্যত্র স্বীকার করেছেন যে, কার্যক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি উপাদান নির্বাচন করে শ্রেণীবিভাজন করতে হয় বলে 'সংস্কৃতি অঞ্চল' দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি বাস্তব হয়ে উঠতে পারে নি। তার ওপর বিভিন্ন অঞ্চলে অনুরূপ সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি সমানভাবে উপস্থিত না থাকতেও পারে। সাধারণভাবে বলা যায়, সংস্কৃতির জাগতিক উপাদান-গুলি সব সময় ধর্ম, সামাজিক সংগঠন ও অন্য জাগতিক উপাদানের সঙ্গে সহাবস্থান না করতেও পারে। তাছাড়া, বিশেষ এক প্রথা বা জাগতিক উপাদান দুই এলাকায় থাকলে তাদের তাৎপর্য ও সামাজিক ভূমিকা বিভিন্ন হওয়া সম্ভব। এবং সেই গূঢ় তাৎপর্য ভালোমত না বুঝে তাদের অভেদীকরণ আমাদের মন্ময় বিচারের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এই সব কারণে কোন দেশ বা মহাদেশকে 'সংস্কৃতি অঞ্চলে' বিভাজনপ্রচেষ্টা খানিকটা অবৈজ্ঞানিক হতে বাধ্য।

পূর্বোক্ত অসুবিধাগুলির কথা মনে রেখে এবার আফ্রিকার 'সংস্কৃতি অঞ্চল' বণ্টনের আলোচনায় আসা যাক। হার্সকোভিট্স তাঁর আফ্রিকার 'সংস্কৃতি-মানচিত্র' প্রকাশের বহু পূর্বে র‍্যাৎজেল আফ্রিকার পশুপালক ও কৃষিজীবী সমাজের পার্থক্যের কথা বলেছিলেন। পরে ১৯৩৭ সালে নৃবিজ্ঞানী হাম্বলে তাঁর "সোর্সবুক ফর্ আফ্রিকান্ অ্যান্থ্রোপলজি" নামক গ্রন্থে আলোচ্য মহাদেশকে আটটি 'সংস্কৃতি অঞ্চলে' বিভক্ত করেন। অবশ্য এক্ষেত্রে আলোচনার ব্যাপকতা ও গভীরতা উভয় দিক থেকেই হার্সকোভিট্স অন্যদের ছাড়িয়ে গেছেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক হার্সকোভিট্স আফ্রিকা মহাদেশের একটি 'সংস্কৃতি মানচিত্র' তৈরি করেন। ১৯৩০ সালে 'আফ্রিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে পূর্বোক্ত মানচিত্রটি সংশোধিত আকারে উপস্থিত করা হয়। ২৫ বছর পরে অল্প পরিবর্তন করে হার্সকোভিট্স মানচিত্রটি তাঁর "কাল্চারাল অ্যান্থ্রোপলজি" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন।

এই 'সংস্কৃতি মানচিত্রে' সমগ্র মহাদেশটি ১১টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে (অবশ্য উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকাকে বাদ দিয়ে)। এই অঞ্চলগুলি হল: (১) হটেনটট, (২) বুশম্যান, (৩) পূর্ব আফ্রিকার গোসম্পদ অঞ্চল, (৪) দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার অনুরূপ অঞ্চল, (৫) কঙ্গো, (৬) গিনি উপকূল, (৭) উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা, (৮) পূর্ব সুদান, (৯) পশ্চিম সুদান, (১০) মরুভূমি, (১১) মিশর।

বুশম্যান ও হটেনটটদের ভাষা ও সংস্কৃতির উপাদানে মিল প্রচুর। হটেনটটরা মূলতঃ পশুপালক। তাই সঙ্গত কারণে তাদের জাগতিক সংস্কৃতিতে গোসম্পদের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। এইখানেই তাদের সঙ্গে বান্টুদের প্রভেদ। বান্টুদের গোসম্পদ আছে, কিন্তু তারা কৃষি-কার্যও করে থাকে। পশুপালন ও চারণে হটেনটট নারীদের অনেক কিছু করণীয় কাজ থাকে। কিন্তু নারীদের এই ভূমিকা বান্টু সমাজে অশ্রুত। হটেনটট সমাজ বুশম্যান সমাজের চেয়ে আরো বেশী জটিল, কিন্তু পূর্ব আফ্রিকার বান্টুসমাজের চেয়ে সরলতর। তাদের বসবাস করার চালাঘর বুশম্যানদের চালাঘরের চেয়ে উন্নত, কিন্তু বান্টুদের চেয়ে নিকৃষ্ট।

বুশম্যানদের জাগতিক ও বাস্তব সংস্কৃতির দৈন্য সকলের চোখে পড়ে। তাদের সমাজসংগঠন সরল। কৃষি ও পশুপালন তারা জানে না। এমনকি কুকুর ছাড়া তাদের অন্য কোন গৃহপালিত পশু নেই। কিন্তু তাদের শিল্প পদ্ধতি সবিশেষ উন্নত।

হার্সকোভিট্সের মতে পূর্ব আফ্রিকার গো-অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল গোরুর গুরুত্ব। পূজা ও অন্য নানা অনুষ্ঠানে গোরুর ব্যবহার এবং কত গোরু আছে তার বিচারে মালিকের সমাজে প্রতিষ্ঠার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। এই সংস্কৃতি অঞ্চলে মধ্যবান্টু ছাড়া অন্যদের সমাজ সংগঠনে পিতৃতন্ত্রের দিকে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বান্টু ও নাইলোটিক ভাষায় কথা বলে। হটেনটট ও বুশম্যানদের চেয়ে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক সংগঠন অনেক বেশী উন্নত।

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কিছু কিছু উপজাতির সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত অঞ্চলের মিল আছে : (১) সমাজ জীবনে গোরুর স্থান উল্লেখযোগ্য ; (২) ক্রালের ('ক্রাল' হল আফ্রিকানদের বসবাসের জন্য চালাঘর) গঠন বৃত্তাকার ; (৩) নারীদের গোরুর সংস্রবে আসা নিষিদ্ধ। কিন্তু পরিচ্ছদ, বাড়িঘর আর ধর্মীয় ও অন্যবিধ আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এরা পূর্ব আফ্রিকার অধিবাসীদের থেকে পৃথক। অন্যদিকে কঙ্গোর অধিবাসী এবং বুশম্যান ও হটেনটটদের সঙ্গেও এদের সাদৃশ্য কম। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার এই অঞ্চলে হেরেরো, এবং তাদের সগোত্র উপজাতিসমূহ বাস করে।

পূর্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার মত কঙ্গোয় গোরু নেই। এখানকার অধিবাসীরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। তারা চার চৌকো বাড়িতে বাস করে ও

গায়ে উল্কি আঁকে। এখানে কাঠের ঢাক ও মুখোসের বাহুল্য লক্ষ্য করা গেছে। কঙ্গো অঞ্চল গুপ্ত সমিতি, উন্নততর রাজনৈতিক সংগঠন, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত গ্রাম্য বাজার, এবং কারিগর ও শিল্পীদের গিল্ড সংগঠনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ।

গিনি উপকূল অঞ্চলের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন কঙ্গো আফ্রিকান-দের অনুরূপ সংগঠনের চেয়ে অনেক বেশী জটিল। সমাজ সংগঠন এখানে নামে মাত্র পিতৃতান্ত্রিক। আসলে মাতাপিতা উভয় দিক থেকে রক্তসম্বন্ধ নির্ণীত হয় এবং উভয়দিকের সম্পর্কে বিবাহ সম্বন্ধ নিষিদ্ধ (হার্সকোভিট্‌সের এই মত সর্বজনগ্রাহ্য নয়)।

পূর্ব-অফ্রিকার গো-অঞ্চল ও কঙ্গোর মধ্যে যত সাদৃশ্য তার থেকে বেশী মিল রয়েছে আফ্রিকার 'শৃঙ্গ' (অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা) ও পূর্ব আফ্রিকার মধ্যে। উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় গাভীর গুরুত্ব ধীরে ধীরে কমে অন্য পশুর গুরুত্ব বাড়ে। পূর্ব আফ্রিকার মাসাই ও নন্দীদের মত এখানেও সমবয়স্কদের গোষ্ঠীবন্ধন প্রথা প্রসিদ্ধ। হটেনটটদের সঙ্গে এ অঞ্চলের কয়েকটি সাদৃশ্য রয়েছে : (ক) নারীদের গাভী-পরিচর্যা করতে দেবার দিকে ঝোঁক ; (খ) ভাষার কয়েকটি দিক ; (গ) পশুচর্ম পরিচ্ছদ হিসাবে ব্যবহার, ইত্যাদি। উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে এখানে কর্মকার শ্রেণী অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হয়।

পূর্ব সুদানীয় জনগোষ্ঠীরা যাযাবর, পশুকে কেন্দ্র করে তাদের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বিবাহের যৌতুক এখানে উট। এই অঞ্চলের জনসমাজে পিতৃতান্ত্রিক প্রবণতা সুস্পষ্ট। ধর্মে এরা মুসলমান।

হার্সকোভিট্‌সের মতে পশ্চিম সুদান হল একটি প্রান্তিক অঞ্চল, যেখানে আফ্রিকার সনাতন ধর্মগুলির সঙ্গে ইসলামের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র কত লোককে ধর্মান্তরিত করা গেল বা কত লোক তাদের স্বধর্ম বিসর্জন না দেওয়া শ্রেয়ঃ বলে বিবেচনা করল, তার অঙ্কে সম্পূর্ণ হবে না। ইসলাম ও সনাতন ধর্ম সমূহের প্রতিযোগিতার এক সাংস্কৃতিক দিকও আছে। ইসলামে দীক্ষা মানে কয়েকটি পুরাতন আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ ও নতুন কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ। ইসলামে দীক্ষা মানে ধর্মীয় ভাষা হিসাবে আরবী ভাষা গ্রহণ, মক্তবে কিছুটা প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ-প্রাপ্তি এবং উপজাতির গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর মুসলিম জগতের শরিক হওয়া। পশ্চিম সুদানে

ইসলাম কয়েকটি শক্তিশালী রাজ্যের জন্ম দিয়েছে যার মধ্যে হাউসা ও ফুলবে'দের বিভিন্ন রাজ্য উল্লেখযোগ্য। এখানকার অর্থনৈতিক জীবন সমৃদ্ধ করেছে পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য, যদিও পশ্চিম সুদানের অধিবাসীদের কাছে পশুপালনের গুরুত্ব অতটা নেই। পশ্চিম সুদানের কাঠখোদাই ও টেরাকোটা জগৎপ্রসিদ্ধ।

সাহারা মরুভূমিতে আছে যাযাবর মুসলিম জনগোষ্ঠী। এদের অর্থনীতি নির্ভর করছে পশুপালন ও বাণিজ্যের ওপর। পালিত পশুদের মধ্যে উট ও ঘোড়া প্রধান। হার্সকোভিট্সের মতে এটিও একটি প্রান্তিক এলাকা।

মিশরীয় সংস্কৃতির পরিচয় আমরা সকলেই কিছু কিছু রাখি। আফ্রিকার অন্য অঞ্চলের সংস্কৃতি পৃথক ও বৈশিষ্ট্যময়, সেকথা নিশ্চয়ই বিস্তৃত আলোচনা করে বোঝাতে হবে না।

হার্সকোভিট্সের চেয়ে আফ্রিকার জনগোষ্ঠীর আরও বিস্তৃতভাবে শ্রেণীবিভাজন করেছেন অধ্যাপক বাওমান। বাওমানের মতে মহাদেশকে ২৭টি 'সির্কল ড সিভিলিজাসির্অঁ-এ (অর্থাৎ "সংস্কৃতি অঞ্চলে') ভাগ করা যায়: (১) বুশম্যান, (২) হটেনটট, (৩) বের্গডামা, (৪) হেরেরো, (৫) দক্ষিণ-পূর্ব বাণ্টু, (৬) দক্ষিণ রোডেসীয়, (৭) জাম্বেসি-আঙ্গোলান, (৮) দক্ষিণ কঙ্গো, (৯) পিগমী, (১০) উত্তর কঙ্গো, (১১) রুকোয়া অর্থাৎ পূর্ব আফ্রিকার অভ্যন্তর, (১২) হ্রদ অঞ্চল, (১৩) পূর্ব উপকূল (১৪) বাণ্টু (উত্তর-পূর্ব বাণ্টু), (১৫) নাইলো-হ্যামিটীয়, (১৬) নাইলোটীয়, (১৭) উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার পশু-পালকগোষ্ঠী, (১৮) ইথিওপীয়, (১৯) পূর্ব সুদানীয়, (২০) মধ্য সুদানীয়, (২১) উপবাণ্টু, (২২) পূর্ব আটলান্টিক, (২৩) পশ্চিম আটলান্টিক, (২৪) উর্ধ্ব নাইজেরীয়, (২৫) জলতীয়, (২৬) সাহারান, ও (২৭) আটলাস।

পুঙ্খানুপুঙ্খতায় বাওমানের শ্রেণীবিভাজন হার মেনেছে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক মার্ডকের তালিকার কাছে। মার্ডকের 'সংস্কৃতি-অঞ্চল' সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি গেছে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বাওমান ও মার্ডকের শ্রেণীবিভাজন এত পৃথক বলে মনে হলেও একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, এদের বৈসাদৃশ্য অনেক কম। অনেক ক্ষেত্রে (যেমন হটেনটট, বুশম্যান, হ্রদ অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ, পূর্ব উপকূলের বাণ্টু প্রভৃতি), এঁদের 'সংস্কৃতি-অঞ্চল' বিভাগ অনুরূপ। কিন্তু মার্ডক কয়েকটি জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন যাদের শুধুমাত্র ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, যথা প্রাচীন মিশরীয়,

পিউসিক ও গ্রোকো-রোমান উত্তর, আফ্রিকান, প্রাচীন আজানিয়ানগণ। বলা বাহুল্য, এইসব জনগোষ্ঠী আফিকার ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করলেও আজ এদের পৃথক সত্তা নেই। এ ছাড়া, মার্ডকের তালিকায় এমন অনেক সম্প্রদায় স্থান পেয়েছে, যাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিশিষ্টতা খানিকটা বিছিন্ন, সরল শ্রেণীবিন্যাসে যাদের স্থান নির্ধারণ দুঃসাধ্য, যেমন: ফুলানি ও বাগারা। স্বভাবতঃ বাওমানের স্বল্পত পরিসরে এদের স্থান মেলে নি। সর্বোপরি, মার্ডকের তালিকায় এক বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্গত উপগোষ্ঠীদেরও পৃথক স্থানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই সব কারণে, মার্ডকের তালিকা বাওমানের তালিকার চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে।

ভাষা, সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া ধর্মের ভিত্তিতেও আফ্রিকার অধিবাসীদের শ্রেণীবিভাজন সম্ভবপর। এই মহাদেশের শত শত সনাতন ধর্মের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বহিরাগত ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম। ইসলামের আধিপত্য সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকার এক বৃহৎ অংশ এবং পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার কিয়দংশ জুড়ে। আফ্রিকায় ইসলাম সম্প্রসারণশীল। কিন্তু আফ্রিকানদের আনুগত্যের জন্য একে প্রতিযোগিতা করতে হয় খৃষ্টধর্মের সঙ্গে। ইওরোপের রাজনৈতিক প্রভুত্বের পাশাপাশি খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকরা আফ্রিকানদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এর ফলে উত্তর আফ্রিকা ছাড়া মহাদেশের সর্বত্র শহরগুলিতে, উপকূল সন্নিহিত এলাকায়, কঙ্গো ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বহু আফ্রিকান খৃষ্টান হয়েছেন।

কিন্তু ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের সোৎসাহ অভিযান সত্ত্বেও সাহারার দক্ষিণে অধিকাংশ আফ্রিকান আজও তাদের সনাতন ধর্মের অনুজ্ঞা মেনে চলেন। এই ধর্মগুলির অধিকাংশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পূর্বপুরুষপূজা ও তৎসংক্রান্ত নানা আচার-অনুষ্ঠান। ধর্ম ও জাদুবিদ্যা অনেক ক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে এবং উপজাতিপ্রধান প্রায়শঃ শাসনপরিচালনা ও ধর্মানুষ্ঠানের অধিকর্তা।

পাঁচ

পূর্বের আলোচনা থেকে এবার মূলসিদ্ধান্তগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত করা যাক।

কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসীরা এখনও উপজাতির জীবন যাপন করে। সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ : সাধারণতঃ এক ভাষা কিংবা উপভাষার প্রচলন। এক পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি বা অন্ততঃ-পক্ষে সে সম্বন্ধে বিশ্বাস, অন্তর্বিবাহ, সারা সমাজের লোকদের সম্মিলিতভাবে পূর্বপুরুষ-পূজা ও অন্যবিধ আচার-অনুষ্ঠান, অনেক ক্ষেত্রে এক শাসনযন্ত্র, আপেক্ষিকভাবে অনুন্নত উৎপাদনপদ্ধতি ও উৎপাদন যন্ত্র, শ্রমবিভাগ ও বিশেষ পারদর্শিতার অভাব, মানুষের মধ্যকার প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক সম্পর্ক।

আফ্রিকায় এমন উপজাতি আছে শত শত। অনেক সময় কয়েকটি উপজাতির মধ্যে জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি, ধনোৎপাদন পদ্ধতি ও সমাজ সংগঠনের পৃথক বা সামগ্রিকভাবে সাদৃশ্য থাকায় তাদের এক গোষ্ঠীতে ফেলা হয়। নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অধিবাসীদের ভাগ করা হয়েছে: I ককেশীয়, II মঙ্গোলীয়, III নিগ্রো, IV বুশম্যান, এবং V পিগমী। শুধুমাত্র ভাষার ভিত্তিতে গ্রীনবার্গ আফ্রিকানদের বিভক্ত করেছেন পাঁচটি প্রধান গোষ্ঠীতে : I নাইজার কঙ্গো, II আফ্রো-এশীয়, III সুদানীয়, IV মধ্য সাহারান ও V হটেনটট-বুশম্যান।

ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় গ্রীনবার্গীয় শ্রেণীবিভাজন হার্সকোভিট্‌স-কৃত আফ্রিকার সংস্কৃতি মানচিত্রের কতকাংশে অনুরূপ হয়েছে। হার্সকোভিট্‌স ছাড়া, আরও অনেক সাংস্কৃতিক উপাদান বণ্টনের ভিত্তিতে আফ্রিকা মহাদেশকে বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রেণীবিভক্ত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এই সব প্রচেষ্টার মধ্যে বাওমান ও সম্প্রতিকালের অধ্যাপক মার্ডকের গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এঁদের শ্রেণীবিভাজনে তাৎপর্যপূর্ণ অনেক আবিষ্কার ও বিচার থাকলেও, বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত কারণে যে কোন দেশ, তথা মহাদেশের সংস্কৃতি-মানচিত্র গঠন অংশতঃ অবৈজ্ঞানিক হতে বাধ্য।

জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতি ছাড়া, ধর্মের মানদণ্ডেও আফ্রিকার অধিবাসীদের শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনটি প্রধান ভাগ সম্ভবপর, যথা, (১) খৃষ্টান আফ্রিকান, (২) মুসলমান আফ্রিকান, আর (৩) যে সব আফ্রিকান এখনও বিভিন্ন সনাতন ধর্মের অনুশাসন মেনে চলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ দাসব্যবসায় ও আফ্রিকাবিভাজনের পটভূমিকা

এক

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে আফ্রিকার এযুগের ইতিহাসের শুরু। এই সময় থেকে পর্তুগীজ নাবিকেরা রাজানুকূল্যে আফ্রিকার উপকূলরেখা আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হয়। জলপথে আফ্রিকা-উপকূল আবিষ্কারে পর্তুগীজদের উৎসাহের সর্বপ্রধান কারণ ছিল, ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের বিকল্প পথ আবিষ্কার যা'তে মুসলিম আরবদেশগুলি ও তুরস্কের মধ্য দিয়ে না গিয়েও পর্তুগীজ বণিকেরা ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বণিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য চালাতে পারে।

এছাড়া সেই খৃষ্টান-মুসলিম ধর্মকলহের যুগে ইওরোপীয়দের মধ্যে 'প্রেস্টার জন'-এর অতিকথা প্রচলিত ছিল। ইওরোপে অনেকে বিশ্বাস করত যে, পূর্বদেশে এক শক্তিশালী খৃষ্টান রাজ্য আছে, যার রাজার নাম হল প্রেস্টার জন। পর্তুগালের মুসলিম-বিরোধী অভিযানে প্রেস্টার জন-এর সাহায্য প্রয়োজনীয় হবে, একথাও অনেকে মনে করলেন। এশিয়ার জলপথ আবিষ্কার মানে প্রেস্টার জনকে খুঁজে বার করার প্রচেষ্টার এক ধাপ অগ্রগতি।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে পর্তুগাল তখন এক নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য। তার প্রাণশক্তি প্রকাশের ক্ষেত্র ইওরোপে ছিল না। কারণ পর্তুগালের তিনদিক ঘিরে ছিল স্পেন আর চতুর্থদিকে আটলান্টিক মহাসাগর। কাজেই পর্তুগালের দৃষ্টি যে আফ্রিকার দিকে পড়বে তাতে আশ্চর্য কী?

বলতে গেলে সারা পঞ্চদশ শতক হচ্ছে আফ্রিকার উপকূল আবিষ্কারের যুগ। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দ (পর্তুগীজ বাহিনী কর্তৃক মরক্কো উপকূলে সেউতা দখল) থেকে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ (ভাস্কো ডা গামার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আরবসাগর পার হয়ে মালাবারের কালিকট বন্দরে আগমন) পর্যন্ত পর্তুগীজ নাবিকেরা ধীরে ধীরে আফ্রিকার উপকূল আবিষ্কার করেছে, সুবিধাজনক স্থানে রসদ

সরবরাহের ঘাঁটি গড়েছে এবং কোন কোন অঞ্চলে স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগও স্থাপন করেছে।

অবশ্য সে সময় মহাদেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের সাধ বা সাধ্য কোনটাই পর্তুগীজদের ছিল না। উনবিংশ শতকে আফ্রিকা বিভাজনের আগে পর্যন্ত কারই বা ছিল? সাধের অভাব এইজন্য যে, সে যুগে আফ্রিকার উপকূল তাদের কাছে গন্তব্য স্থলের যাত্রাপথ মাত্র। বলাবাহুল্য, গন্তব্যস্থল ছিল এশিয়া। সাধ্যের অভাব প্রাকৃতিক কারণে, যেগুলি জয় করার মত শক্তি মানুষ তখনও অর্জন করে নি। তাই উনবিংশ শতকের শেষার্ধের আগে পর্যন্ত আফ্রিকায় ইওরোপীয় প্রভুত্ব কেবল উপকূলের কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে।

অবশ্য গোড়াতে আফ্রিকার প্রতি ইওরোপীয়দের যেমন ঔদাসীন্য দেখা যায়, পরে ততটা ছিল না। কারণ, ততদিনে বোঝা গেছে আফ্রিকার হস্তিদন্ত, স্বর্ণ ও ক্রীতদাসের ব্যবসায় লাভজনক, বিশেষতঃ শেষেরটা। তাই আফ্রিকার পরবর্তী তিন শতাব্দীর (ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ) ইতিহাসকে দাসব্যবসায় ও সেই ব্যবসায় কেন্দ্র করে ইওরোপীয় প্রতিযোগিতার ইতিহাস বলা চলে।

দুই

পঞ্চদশ, শতাব্দীর মাঝামাঝি (সঠিক বছর নিয়ে মতভেদ আছে) ইওরোপীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম পর্তুগীজ বণিক-অ্যাডভেঞ্চারারগণ আফ্রিকা থেকে পর্তুগালে ক্রীতদাস নিয়ে আসে। আফ্রিকায় দাসব্যবসায় অবশ্য ইওরোপীয়রা আসার আগে থেকে চলছিল। এই ব্যবসায় চালাত প্রধানতঃ আরব বণিকেরা। কোরানের অনুশাসন মুসলমান মুসলমানকে ক্রীতদাস করবে না। কাফের আফ্রিকানদের ক্ষেত্রে সে অনুশাসন প্রযোজ্য না হওয়ায়, আফ্রিকার দাসব্যবসায়ে আরবদের অংশ গ্রহণে বাধা থাকে নি।

আরবদের কাছে গোলাম সরবরাহের প্রধান এলাকা ছিল মধ্যপূর্ব বিষুব-রৈখিক আফ্রিকা, যার একদিকে উর্ধ্ব নীল অববাহিকা, অন্য দিকে উর্ধ্ব কঙ্গো অববাহিকা ও হ্রদ অঞ্চল, অর্থাৎ রাজনৈতিক ভাষায় বলতে গেলে দক্ষিণ সুদান, উগাণ্ডা, কেনিয়া, পশ্চিম ইথিওপিয়া, উত্তর-পূর্ব কঙ্গো এবং ট্যাঙ্গানাইকা। নবম শতাব্দী থেকে শুরু করে প্রায় উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এক হাজার বছর

ধরে আরব দাসব্যবসায়ীরা সারা মুসলিম জগতের গোলামের চাহিদা মিটিয়েছে। আরব রাজ্যসমূহ, তুর্কী সাম্রাজ্য, পারস্য ও ভারতবর্ষে তাদের বাজার ছিল। চীনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ৯৭৬ খৃষ্টাব্দে জনৈক আরব রাজদূত তাঁর অনুচরবর্গের মধ্যে একজন নিগ্রো ক্রীতদাসকে নিয়ে চীনের রাজসভায় উপস্থিত হলে, সেখানে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

আরব বণিকেরা অবশ্য আফ্রিকায় দাসত্বপ্রথার প্রবর্তন করে নি। দাস-সংগ্রহকারী কোন বণিক আফ্রিকায় পদার্পণের আগে থেকে সেই মহাদেশে দাসত্ব চালু আছে। নানা উপায়ে গোলামদের সংগ্রহ করা হত। দুই উপজাতির যুদ্ধে বন্দীদের অনেক সময় দাসরূপে বিক্রয় করার নিয়ম ছিল। গুরুতর অপরাধের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীকে দাসত্ব করতে বাধ্য করা হত। কখনও কখনও অরাজকতায় অপরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা কিংবা দুর্ভিক্ষে প্রাণরক্ষার দায়ে কেউ কেউ স্বেচ্ছায় অপরের দাসত্ব গ্রহণ করত। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে গোলামদের গৃহস্থালী কাজকর্মে নিয়োজিত করা হত। বহু গোলামকে একসঙ্গে বৃহদায়তন শিল্প কিংবা বাগিচায় কাজে লাগানো চালু হয়, যখন উন্নততর অর্থনীতিতে যথেষ্ট সংখ্যক শ্রম-সরবরাহের সমস্যা অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দেয়। অর্থাৎ প্রকারান্তরে আমরা এ কথা বলতে চাই যে ইওরোপীয় বণিকেরা আফ্রিকায় আসার আগে সেখানে দাসত্বের প্রচলন থাকলেও গ্যাং স্লেভারীর (অর্থাৎ বৃহদায়তন শিল্প ও বাগিচায় বহুসংখ্যক দাসশ্রমিকের নিয়োগ) শুরু ইওরোপীয় বণিকেরা আসার পর থেকেই।

আমেরিকা আবিষ্কার এবং সেই মহাদেশে বৃহদায়তন বাগিচা স্থাপন করার প্রচেষ্টা আফ্রিকার দাসব্যবসায়কে মুনাফার প্রেরণা যোগায়। নানা কারণে ইওরোপীয় বাগিচা-মালিকেরা আমেরিকার আদি অধিবাসীদের তাদের জন্য কাজ করাতে পারে নি। প্রথম প্রথম কিছুদিন ইওরোপ থেকে লোক এনে বাগিচা ও অন্য বৃহদায়তন উৎপাদন যন্ত্রে লাগানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু পরে দেখা যায় 'শ্বেত' শ্রমিক সরবরাহ ক্রমেই কষ্টকর হয়ে আসছে। তাছাড়া 'শ্বেত' শ্রমিকদের পক্ষে কাজ ছেড়ে পালানো সোজা। তারা মালিকদের কাছ থেকে অনেক বেশী দাবি করে। এবং 'শ্বেত' শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকলে ইওরোপীয় শাসকদেশের সঙ্গে ভবিষ্যতে বিরোধ লাগতে পারে ও উপনিবেশ স্বাধীনতা দাবি করতে পারে।

সবদিক দিয়ে বিচার করে দেখা গেল 'শ্বেত' শ্রমিকের চেয়ে নিগ্রো গোলাম সুলভতর। অতএব আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় দাস আমদানীর ব্যবসায় পুরোদমে শুরু হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে পর্তুগীজরা যদি এ ব্যবসায়ের সূত্রপাত ঘটিয়ে থাকে তবে ওলন্দাজরা একে নিয়ন্ত্রণ করত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের পর দাসব্যবসায় নিয়ে প্রতিযোগিতা বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত নৌবাহন আইন (বা ন্যাভিগেসন অ্যাক্ট) ইওরোপের বৈদেশিক বাণিজ্যের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। নৌবাহন আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশী জাহাজের মারফত উপনিবেশিক বাণিজ্য চালানো (অর্থাৎ ওলন্দাজ জাহাজশিল্পের মূলে কুঠারাঘাত করা)। নৌশিল্প ও উপনিবেশ নিয়ে প্রতিযোগিতা বিশ বছরের মধ্যে (১৬৫২ থেকে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে) তিনটি ইঙ্গ-ওলন্দাজ যুদ্ধ ঘটায়। এইসব যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বৃটেনের নৌবহরের ক্রমবর্ধমান শক্তির পূর্ণ পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমন পাওয়া যায় ওলন্দাজ নৌশক্তির ক্ষীয়মানতার। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ইউট্রেক্ট চুক্তিতে 'আসিয়েণ্টো'র (বা স্পেনীয় উপনিবেশে গোলাম সরবরাহের একচেটিয়া অধিকার) ভার দেওয়া হল বৃটেনকে। ঊর্ধ্ব গিনি উপকূলে হল্যাণ্ডের স্থান দখল করল ফ্রান্স। অন্যদিকে গোল্ডকোস্টে হল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মত ক্ষমতা বৃটেন অর্জন করল। অর্থাৎ ১৬৫০-১৭১৩ এই যুগের ইতিহাস হল ওলন্দাজদের হটিয়ে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড কর্তৃক ইওরোপের বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেওয়ার যুগ। এবং যেহেতু এই বৈদেশিক বাণিজ্যের একটা বড় অংশ ছিল আফ্রিকার দাস-ব্যবসায় সেহেতু আমরা বলতে পারি এই যুগে আফ্রিকা মহাদেশে সাধারণভাবে ফ্রান্স ও বৃটেন হল্যাণ্ডের প্রতিপত্তি নষ্ট করে।

১৭১৩ থেকে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ অবধি যে যুগ, সাগরপথে প্রভুত্বের জন্য ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য। অষ্টাদশ শতকে একাধিক ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের ফল স্বরূপ বৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য ও নৌবহর দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পশ্চিম আফ্রিকার দাসব্যবসায়ের প্রায় অর্ধেক বৃটিশ বণিকদের হাতে এসে গেছে। বাকী অর্ধেক ছিল ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও পর্তুগালের অধীনে।

অবশ্য রাষ্ট্রশক্তি থেকে বণিকদের কার্যক্রম পৃথক করে দেখলে ভুল

হবে। প্রতিটি ইওরোপীয় শক্তি দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত নিজ নিজ দেশের কোম্পানীগুলি প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে সাহায্য করেছে। দাস-ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে গঠিত একটি বৃটিশ কোম্পানী সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারী মহলে বলা হয়, 'আমাদের বণিকেরা যত কোম্পানী গঠন করেছেন তার মধ্যে এইটে-ই হচ্ছে এ দেশের পক্ষে সবচেয়ে হিতকারক।'

স্বদেশের শিল্প, বাণিজ্য, নৌবহর, উপনিবেশের বাগিচা প্রভৃতির জন্য দাসব্যবসায় এত প্রয়োজনীয় বলে ধরা হত যে অনেক সময় দাস-ব্যবসায়ীরা সরকারী সাহায্য পর্যন্ত পেত। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্ট পূর্বোক্ত কোম্পানীকে বাৎসরিক £ ১০,০০০ অর্থসাহায্য করে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত দাস-ব্যবসায়ের স্বর্ণযুগ। উত্তর আমেরিকার ভার্জিনিয়া উপনিবেশে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে যেখানে মাত্র ২০ জন ক্রীতদাস ছিল, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সেখানে ২০০,০০০ ক্রীতদাসের কথা জানা যায়। সে সময় আমেরিকার ১৩টি বৃটিশ উপনিবেশে নিগ্রোদের সংখ্যা ছিল ইওরোপীয় জনসংখ্যার ৩০%। আমেরিকার অন্যত্র ক্রীতদাসের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ৫০০,০০০ এবং অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলিতে আনুমানিক ৮ লক্ষ ও জ্যামেইকায় ৩ লক্ষ ক্রীতদাসের বসবাসের কথা বলা হয়েছে।

কয়েক শ' বছরের মধ্যে কত আফ্রিকানকে দাসরূপে বিক্রি করা হয় তা নিয়ে মতভেদ আছে। অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড হিসাব করেছেন যে, আমেরিকায় মোট ৪ কোটি নিগ্রো গোলাম আমদানী করা হয়। অন্যদিকে জনৈক ফরাসী ঐতিহাসিক বলেছেন যে দাস-ব্যবসায়ের ফলে আফ্রিকা থেকে মোট দশকোটি লোককে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্বর্গতঃ নিগ্রো নেতা ডুবয়েস এই ফরাসী ঐতিহাসিককে সমর্থন করেছেন। আপাত-দৃষ্টিতে এই দুই হিসাবের প্রভেদ অনেক। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, কুপল্যাণ্ড যেখানে বলেছেন ৪ কোটি লোককে আমেরিকায় আমদানী করা হয়, সেখানে পূর্বোক্ত ফরাসী ঐতিহাসিক অনুমান করেছেন মোট ১০ কোটি লোক আফ্রিকা থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। যত লোককে আফ্রিকা থেকে দাস হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয়, তার সব লোককে আমেরিকায় চালান দেওয়া হয় নি, কারণ আমেরিকা ছাড়া অন্যত্রও (যথা

আফ্রিকা মহাদেশেরই কেপ প্রদেশ, ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ, আরব দেশসমূহ, তুরস্ক ও ভারতবর্ষ।) নিগ্রো গোলামের চাহিদা ছিল। একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে আমেরিকা ছিল দাসব্যবসায়ের বৃহত্তম বাজার। তাই সেখানে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় নিগ্রো গোলাম চালান গেছে। কিন্তু যত লোককে দাসরূপে চালান দেওয়া হয়, তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পথের কষ্টে মারা যায় অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড একথা নিজেই বলেছেন। এর সঙ্গে ইওরোপীয় বণিক ছাড়া আরব বণিকেরা যাদের গোলাম করে চালান দিয়েছে তাদের সংখ্যা যোগ দিতে হবে। সুতরাং আফ্রিকা দাসব্যবসায়ের জন্য প্রায় দশ কোটি লোক (পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের অধিবাসীদের এক সঙ্গে করলে যা হয়) হারিয়েছে এটা কোন অত্যুক্তি নয়। সবশেষে মনে রাখা দরকার, আফ্রিকার ক্ষয়ক্ষতি শুধু সংখ্যার বিচারে সম্পূর্ণ নিরূপিত হবে না। কারণ যাদের ক্রীতদাস করে নিয়ে যাওয়া হয় তারা ছিল অল্পবয়স্ক, শক্তসমর্থ যুবক-যুবতী এবং দাসব্যবসায়ীদের হানার পর যারা পড়ে থাকত তারা হল বার্ধক্য-কবলিত, দুর্বল ও বিগতশক্তি।

ক্রীতদাস সংগ্রহ করার ব্যাপারে সমস্ত দাসব্যবসায়ী মোটামুটি একই পদ্ধতি অবলম্বন করত। প্রথম প্রথম জাহাজ থেকে ডাঙায় হঠাৎ সশস্ত্র হানা দিয়ে স্থানীয় লোকদের বন্দী করা হত। কিন্তু এ কায়দা বেশীদিন চলে না। কারণ ক্রমে উপকূল-অধিবাসীরা সতর্ক হয়ে উঠল। তখন নিজেরা সোজাসুজি গোলাম সংগ্রহ না করে দাসব্যবসায়ীরা স্থানীয় দালালদের মাধ্যমে কাজ চালাতে থাকে। এই সব দালালদের অনেকে ছিল ইওরো-আফ্রিকান। কিছু কিছু আফ্রিকানও যে এ কাজ করত না, এমন নয়। যে সব জায়গায় ইওরোপীয় বণিকদের কোন উপজাতি-প্রধান বা রাজার অধীনে বাণিজ্য করতে হত, সেখানে সঙ্গত কারণে দাসব্যবসায়ে এদের অনুমতি লাগত। এমন কি যেখানে এমন কোন বশ্যতা ছিল না সেখানেও ইওরোপীয় বণিকদের স্থানীয় রাজা ও প্রধানদের ভেট দিয়ে খুশী রাখতে হত, তা না হলে তাদের ব্যবসায় বিঘ্নিত হতে পারত। সে যুগে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে (উত্তর আফ্রিকা ছাড়া) কোন সরকারী মুদ্রার প্রচলন ছিল না। অতএব কোথাও বস্ত্র, কোথাও স্বর্ণ, কোথাও বা কড়ির বিনিময়ে দাসসংগ্রহ চলত।

অভ্যন্তরে গোলাম সংগ্রহের পর হত উপকূল অভিমুখে অভিযান। শৃঙ্খলিত ক্রীতদাসেরা খাদ্যদ্রব্য ও মালপত্র কিংবা হস্তিদন্ত ও অন্য স্থানীয়

পণ্য মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেত। উপকূলে পৌছোলে তাদের জাহাজে বোঝাই করে পাঠানো হত দাসব্যবসায়ের বাজারে অর্থাৎ প্রধানতঃ আমেরিকায়। জাহাজে গাদাগাদি করে লোক ঠাসা, অস্বাস্থ্যকর অবস্থা এবং প্রভুদের বর্বরোচিত ব্যবহারের ফলে মহামারী, বিদ্রোহ ও আত্মহত্যা ছিল খুব সাধারণ ঘটনা। দাসব্যবসায়ে লিপ্ত একটি জাহাজের ক্যাপ্টেনের ভাষায় "জীবন্ত মানুষকে কফিনে পোরা হলে তার যেমন আরাম লাগে, ক্রীতদাসদের জাহাজে পোরা হলে তাদের তেমনি আরাম লাগত।" এর ফলে জাহাজে করে চালান দেওয়া ক্রীতদাসদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা অস্বাভাবিক রকমের বেশী হবে তাতে আশ্চর্য কী? ঘানার অধ্যাপক জি. গ্র্যাফ্‌ট জনসন হিসাব দিয়েছেন যে, একবার পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আমেরিকা যাবার পথে ৭,৯০৪ জন ক্রীতদাসের মধ্যে ২,০৫৩ জন পথে মারা যায়।

জাহাজ আমেরিকার বন্দরে পৌছোলে দাসব্যবসায়ীরা গোলামদের নীলাম করে বিক্রয় করত। মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির তারতম্য ছিল। অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড হিসাব করে বলেছেন যে, অষ্টাদশ শতকে একজন স্বাস্থ্যবান লোকের দাম ৬০ পাউণ্ডের মত হতে পারত। দরকচা মাল যেমন বস্তাবন্দী করে বিক্রি করা হয় ঠিক তেমনি করে অসুস্থ, আহত, বৃদ্ধ, দুর্বল, নারী ও শিশুদের একসঙ্গে বিক্রি করা হত।

দু'শ' বছরেরও বেশী সময় ধরে আফ্রিকা থেকে প্রতিবছর হাজারে হাজারে ক্রীতদাস সংগ্রহ করে চালান দেওয়া হয়েছে। সংগ্রহকারীদের হানায় গিনি উপকূল বিধ্বস্ত হয়। তারপর নাইজার ও কঙ্গো নদীর অববাহিকা, বর্তমান অ্যাঙ্গোলা ও আফ্রিকার দক্ষিণাংশ থেকে দাস সংগ্রহ চলে। সংগ্রহের সুবিধার জন্য দালালেরা উপজাতিতে উপজাতিতে বিবাদ বাধায়, উস্কানি দেয় এবং দুর্বল পক্ষকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহস যোগায়। এর ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রায়-স্বয়ংসম্পূর্ণ সনাতন জীবন বিধ্বস্ত হয়। বহু লোক সমাজবন্ধনবিচ্যুত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যে অর্থ ও উদ্যোগ অন্যদিকে প্রযুক্ত হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারত, তা দাসব্যবসায়ে ব্যবহার করার ফলে সমাজজীবনের পক্ষে লাভ না হয়ে ক্ষতিই হয়েছিল। অবশ্য ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পক্ষে দাসব্যবসায় একাধিক কারণে লাভজনক হয়। ব্যবসায় চালানোর জন্য ইওরোপীয় বণিকেরা আফ্রিকার উপকূলের বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে, যেখান থেকে পরে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ জয় করা

সম্ভবপর হয়। দাসব্যবসায় মারফত ইওরোপীয়েরা আফ্রিকানদের কী করে শাসন ও শোষণ করতে হয় তার একটি মোটামুটি অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই অভিজ্ঞতা পরে প্রত্যক্ষভাবে আফ্রিকা শাসনের কাজে বিশেষ সহায়ক হয়। দাসব্যবসায় যেমন আফ্রিকায় ইওরোপীয় প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করে, তেমনি দাসব্যবসায় বন্ধ করার অজুহাতেও ইওরোপীয় শক্তিসমূহ (বিশেষতঃ বৃটেন) বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনক্ষমতা দখল করে। পরবর্তী যুগে বহু চার্টার্ড কোম্পানীর (যারা ব্যবসায় চালানোর সঙ্গে সঙ্গে দেশ দখলও করেছে) সনদে দাসব্যবসায় বন্ধ অন্যতম উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা নাইজার কোম্পানী ও বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকা কোম্পানীর কথা উল্লেখ করতে পারি। 'দাসব্যবসায় বন্ধের উদ্দেশ্যে' জাঞ্জিবারে বৃটেন তার আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে, যার পরিসমাপ্তি হয় জাঞ্জিবারকে 'আশ্রিত' রাজ্যে পরিণত করণে। লুগার্ড বলেন, তাঁর নায়াসাল্যাণ্ড অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সেখানে এমন মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন করতে না দেওয়া, যাতে দাসব্যবসায়ীরা রাজত্বের "সুযোগ পায়"।

দাসব্যবসায়ে আফ্রিকার অনেক ক্ষতি হলেও তার মাধ্যমে সভ্যতার বিস্তার হয়েছে, এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন। একটু তলিয়ে দেখলে এ রকম নির্বোধ যুক্তির অসারতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। দাসব্যবসায়ের মাধ্যমে সভ্যতার বিস্তার হয়েছে: এ কথার তাৎপর্য কী? দাসব্যবসায়ীরা কিংবা তাদের দালালরা তাহলে হল সভ্যতার দূত, অর্থাৎ যাদের নিম্নতম মনুষ্যত্বের মর্যাদা ছিল না। একমুঠো টাকার জন্য যারা হীনতম কার্য করত, তারাই নাকি আফ্রিকায় সভ্যতা প্রচার করেছে!

যাই হোক, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এসে দেখা যায় দাসব্যবসায় আর বেশী দিন চালানো যাবে না। আমেরিকার বিভিন্ন দেশে দাসবিদ্রোহ একদিকে বিচ্ছিন্ন ও সংখ্যাল্প ইওরোপীয় প্রভুদের বিপদের সূচনা করল। হাইতিদ্বীপে দাসবিদ্রোহে ২,০০০ ইওরোপীয় নিহত হয় ও ১,০০০ বাগিচা ধ্বংস হয়। ১৮০৮ সালে বৃটিশ গিয়ানায় বিদ্রোহ দেখা দেয়, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বার্বাডোসে, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গিয়ানায় দ্বিতীয়বার। ইওরোপীয়দের ধনপ্রাণ বিপন্ন করা ছাড়া দাস-অসন্তোষ (বিদ্রোহে ফেটে না পড়লেও কাজে ফাঁকি ও অনুৎসাহ এবং সাবোতাজের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করত) আর একটা জিনিসের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্বাধীন শ্রম বাধ্যতামূলক

প্রবের চেয়ে অধিকতর ফলপ্রদ। ইতিমধ্যে দাসব্যবসায় বিরোধীরা প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করে দেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের সর্বপ্রধান. বিচারক এক বিখ্যাত ঘোষণায় বলেন যে বৃটিশ আইনে দাসপ্রথার সমর্থন নেই, অতএব যে মুহূর্তে কোন ক্রীতদাস ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা দেবে সে মুহূর্তে সে হবে স্বাধীন।" ১৮০৭ সালে বৃটিশ পার্লামেন্ট বৃটিশ প্রজাদের দাসব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া বেআইনী ঘোষণা করে। ১৮৩৩ সালে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস প্রথার অবলোপ করা হয়।

শুধু নেতিবাচক প্রতিরোধ না করে দাসব্যবসায় বিরোধীরা এসময় আফ্রিকা সম্পর্কে এক নয়া নীতি ঘোষণা করলেন। এই নীতির মূল স্তম্ভ ছিল: (ক) আফ্রিকানদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার, (খ) দাসব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণের জন্য বৈধ বাণিজ্যের প্রসার, এবং (গ) মুক্ত ক্রীতদাসদের জন্য উপনিবেশ স্থাপন। খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য যেসব সমিতি গঠিত হয় তাতে বহু দাসব্যবসায়ী বিরোধী সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। বৈধ বাণিজ্যের প্রসারে পশ্চিম আফ্রিকায় উদ্ভিজ্জ তৈল গোলামের স্থান গ্রহণ করে এবং দাস-ব্যবসায়ীদের অনেকের অর্থ খাটানো হয় উদ্ভিজ্জ তৈলের রপ্তানী বাণিজ্যে। আর মুক্ত ক্রীতদাসদের জন্য উপনিবেশ স্থাপন প্রচেষ্টার ফলে পশ্চিম আফ্রিকায় দুটি দেশের পত্তন হয়—সিয়েরা লিওন ও লাইবেরিয়া।

তিন

১৮১৫ সালে, অর্থাৎ নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর, আফ্রিকায় ইওরোপীয় শক্তিবর্গের অনুপ্রবেশ খুব সামান্যই হয়েছিল। তুরস্ক তখনও ছিল টিউনিসিয়া, লিবিয়া ও মিশরের মালিক। মরক্কো অবশ্য তখন নামতঃ স্বাধীন, কিন্তু তার স্বাধীনতা টলমল করছিল। জলদস্যুদের জন্য আলজেরিয়া ছিল ভূমধ্যসাগরীয় বণিকদের ভীতিস্বরূপ। সাহারার অভ্যন্তরে বাইরের কোন শক্তি আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি। মধ্য সুদানে একাধিক শক্তিশালী ও স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল।

নাইজার নদীর অববাহিকায় কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য শাসন চালাচ্ছিল যাদের মধ্যে ইসলাম খুব দ্রুত প্রভাব বিস্তার করছিল। ফ্রান্সের হাতে ছিল পশ্চিম আফ্রিকার ব্লাকো অন্তরীপ থেকে গ্যাম্বিয়া নদীর মোহানা

পর্যন্ত উপকূল। কিন্তু এর অভ্যন্তরে তার প্রভুত্ব তখনও বিস্তৃত হয় নি। ম্যাডাগাস্কারে ফ্রান্স অবশ্য বহুদিন থেকে তৎপর থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে সেখানে একটি ছোট ফরাসী উপনিবেশও স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৮১৫ সালে ম্যাডাগাস্কার কার্যতঃ স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল। পর্তুগালের অধিকারে ছিল কেপ ভেয়ার্দ দ্বীপ এবং কাসামাজার দক্ষিণে সামান্য কিছু অংশ। এ ছাড়া পূর্ব উপকূলে পর্তুগাল জাম্বেসি নদীর মোহানা থেকে জাম্বো পর্যন্ত উপকূলভূমির ওপর সার্বভৌমত্ব দাবি করত। কিন্তু আসলে এ সমস্ত অঞ্চল তার সক্রিয় অধিকারে আসে নি। প্রায় এক শতাব্দী আগে দেলগাদো অন্তরীপের উত্তরের অঞ্চলে পর্তুগাল ওমানের ইমামের অধিকার স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী, ইংল্যাণ্ডের হাতে ছিল গ্যাম্বিয়া নদীর মোহানা, সিয়েরা লিওন এবং গোল্ডকোস্টের কতকগুলি ঘাঁটি। ডেনমার্ক আর হল্যাণ্ডেরও আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে কতকগুলি ছোট ছোট ঘাঁটি ছিল। নাইজার নদীর গতিপথ তখনও অজ্ঞাত। তবে ক্যামেরুন্স ও কঙ্গো অঞ্চলে কিছু কিছু গঞ্জ (প্রধানতঃ বৃটিশ) গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে অধিকাংশ দাসব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। স্বভাবতঃ দাসব্যবসায় বে-আইনী হবার পর (১৮০৭) এদের কর্মতৎপরতা অনেকাংশ কমে যায়। ১৮১৫ সালে কেপ উপনিবেশ বাফেল্স ও গ্রেট কিশ নদীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট, ট্রান্সভাল ও নাটালে তখনও বসতি স্থাপন করা হয় নি। সব মিলিয়ে কেপ উপনিবেশের আয়তন তখন ১২০,০০০ বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা ৬১,০০০, যার মধ্যে প্রায় $\frac{1}{2}$ অংশ ছিল ক্রীতদাস।

উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় সোমালি ও গালাদের আধিপত্য তখন অবিসংবাদিত। ইথিওপিয়ায় স্বাধীন খৃষ্টান রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। নীল অববাহিকার দক্ষিণ-ভাগের (বর্তমান সুদান প্রজাতন্ত্র) অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাইরের পৃথিবী ছিল অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন।

এক কথায়, আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে আফ্রিকায় ইওরোপীয় অধিকার বলতে উপকূলভাগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গুটিকয় সামরিক ঘাঁটি, বাণিজ্যকেন্দ্র ও শহরকে বোঝাত।

পরবর্তী ৬০ বছরে যে ইওরোপীয় শক্তিরা আফ্রিকায় বিশেষ রাজ্য বিস্তার করতে পারে তা বলা যায় না। আগের মত জার্মানী ও ইতালী তখনও

আফ্রিকা অধিকারে ব্যাপৃত হয় নি। পর্তুগাল আঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের অভ্যন্তরে কিছুটা রাজ্যবিস্তার করতে সক্ষম হয়। তবু ১৮৭৫ সালে পর্তুগাল শাসিত রাজ্যের মোট আয়তন ৪০,০০০ বর্গ মাইলের বেশী হয় না। স্পেনের আফ্রিকান সাম্রাজ্য ছিল ক্ষুদ্রতর, মোট ১,০০০ বর্গমাইলের মত। ইংল্যাণ্ড অবশ্য ইতিমধ্যে তার সাম্রাজ্য কিছুটা বাড়িয়েছিল। ১৮০৬ সালে কেপ দ্বিতীয়বার বৃটিশ দখলে আসে। ১৮৪৩ সালে নাটাল অধিকৃত হয়। কেপ উপনিবেশের সীমানা উত্তর দিকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। নাইজার অঞ্চলেও বৃটিশ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৮৭৫ সালে আফ্রিকায় বৃটিশশাসিত এলাকার আয়তন ছিল ২৫০,০০০ বর্গ-মাইল। ফ্রান্স মেনেগ্যাম্বিয়া অঞ্চলের অন্তর্দেশে তার অধিকার সম্প্রসারণ করে। এ ছাড়া ১৮৩০ সালে আলজেরিয়াও ফরাসী দখলে আসে। পূর্ব আফ্রিকায় ওমানের যোগাযোগ শুধুমাত্র জাঞ্জিবারে সীমাবদ্ধ থাকে। এবং কিছুদিনের মধ্যে সে সম্পর্কটুকুও স্থানীয় শাসকেরা ছিন্ন করে। তুরস্ক ট্রিপলি অঞ্চলে তার প্রভুত্ব বজায় রাখে। কিন্তু টিউনিসিয়া এবং মিশর (সুদান সহ) কার্যতঃ প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়।

হিসেব করে দেখা গেছে ১৮৭৫ সালে আফ্রিকা মহাদেশের মাত্র $\frac{১}{১০}$ ছিল ইওরোপীয় অধিকারে, $\frac{২}{৫}$ (সাহারা মরুভূমি সহ) ছিল আরব প্রভাবধীন এলাকা, (হয় অধীনস্থ রাজ্য, নয় স্থানীয় আরব সুলতান দ্বারা শাসিত), বাকী অর্ধেক, প্রধানতঃ বিষুবরৈখিক ও গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় অঞ্চলে ছিল অগুণতি উপজাতির বাস, যাদের মধ্যে প্রায়শঃই যুদ্ধ লেগে থাকত। সুদান অঞ্চলে এবং দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকায় কয়েকটি সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সমগ্র মহাদেশের তুলনায় তাদের শাসিত এলাকা যৎসামান্যই বলতে হবে। এমন অবস্থায় শুরু হয় 'আফ্রিকা বিভাজন'। এত দিনে এশিয়ায় ও অন্যত্র দুর্বল অঞ্চলগুলির ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। অতএব, এবার ইওরোপীয় শক্তিবর্গ আফ্রিকার প্রতি মনোনিবেশ করতে পারল। 'বিভাজনে'র গতি ত্বরান্বিত হয় কারণ ইতিমধ্যে জার্মানী ও ইতালী আসরে নেমেছে। জার্মানী ও ইতালী এতদিন ছিল বিভক্ত: আভ্যন্তরীণ সমস্যায় বিব্রত। তাই আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবিস্তার তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। ১৮৭০-৭১ সালের পর বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানী ঐক্যবদ্ধ শক্তি রূপে ইওরোপের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। এর পনের বছর বাদে আফ্রিকায়

জার্মান পতাকা ওড়ানো হল। ইতালী অবশ্য এর আগে-ই উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় (ইরিত্রিয়া ও সোমালি উপকূলে) সাম্রাজ্যের বনিয়াদ রচনা করেছে।

'আফ্রিকা বিভাজনের' দ্রুতগতি ছাড়া আমাদের বিস্মিত করে আর একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যে আফ্রিকার বুকের ওপর কোন বড় রকমের যুদ্ধ ছাড়া-ই সমগ্র মহাদেশ ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক বিজিত হয়। এর একটা কারণ এই যে, আফ্রিকার সব বিরাট দেশে বিভাজনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের (বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, পর্তুগাল, বেলজিয়াম) সকলেরই স্থান ছিল। এই প্রতিযোগিতা যাতে বিনাযুদ্ধে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে তার জন্য ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে বের্লিন সম্মেলন কতকগুলি নিয়মকানুন বেঁধে দেয় যেগুলো আমরা পরে আলোচনা করেছি। তার ওপর, আফ্রিকা বিভাজন নিয়ে আফ্রিকার বুকের ওপর যুদ্ধ না হলেও অন্যত্র যেসব যুদ্ধ হয়েছে তার মারফত আফ্রিকান উপনিবেশগুলির মালিকানা বদল হয়েছে। যেমন নেপোলিয়নের যুদ্ধোত্তর শান্তি চুক্তিতে কেপপ্রদেশ ডাচদের হাত থেকে বৃটিশ অধিকারে স্থানান্তরিত হয়। অতএব, আফ্রিকার বুকের ওপর বড় রকমের যুদ্ধ না ঘটার ব্যাপারটা বোধাতীত হয়। অবশ্য মহাদেশের উপকূলে ও অভ্যন্তরে ছোটখাটো সংঘর্ষ যে একেবারে হয় নি তা নয়। কঙ্গো অববাহিকা নিয়ে বিভিন্ন ইওরোপীয় শক্তিদের মধ্যে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্ট হয়েছিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ফাশোদায় ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায় প্রকাশ্য বিস্ফোরণের স্তরে এসে পৌছোয়। কিন্তু আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবিস্তার নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ আফ্রিকার বুকে বড় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নি।

আফ্রিকা মহাদেশের বিশালত্বে, বিভাজনকালীন ঘটনাপ্রবাহের দ্রুত আবর্তনে ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংখ্যাবাহুল্যে এ সময়কার ইতিহাস আমাদের খুব জটিল ঠেকবে। তাই আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস পৃথক সূত্রে আমরা অনুসরণ করব। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র মহাদেশকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

(ক) পশ্চিম (খ) মধ্য (গ) দক্ষিণ (ঘ) পূর্ব (ঙ) উত্তর-পূর্ব।

পশ্চিম আফ্রিকায় ফ্রান্স ও বৃটেন ছিল প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। পরে জার্মানীও অন্যতম অংশীদার হিসাবে আবির্ভূত হয়।

মধ্য আফ্রিকার পরিস্থিতি ছিল জটিলতর, যেহেতু ফ্রান্স, বৃটেন, পর্তুগাল

ও বেলজিয়াম (আন্তর্জাতিক কঙ্গো সঙ্ঘের ছদ্মবেশে) মধ্য আফ্রিকা বিভাজনে প্রতিযোগিতা করে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় উনবিংশ শতকে জার্মানী, পর্তুগাল ও বৃটেনের মধ্যে কালাহারি মরুভূমি সংলগ্ন এলাকা, এবং জাম্বেসী নদীর অববাহিকা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে। কিন্তু এই সব অঞ্চলের আরও দক্ষিণে বৃটেন ও বুয়র প্রজাতন্ত্রদ্বয় অর্থাৎ অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট ও ট্রান্সভালের মধ্যে একাধিকবার সশস্ত্র সংগ্রাম ঘটে। বিংশশতাব্দীর প্রথমে দ্বিতীয় ইঙ্গ-বুয়র যুদ্ধে বুয়র প্রজাতন্ত্রদ্বয়ের পরাজয় ও স্বাধীনতালোপের মধ্য দিয়ে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়।

পূর্ব আফ্রিকায় প্রধান প্রতিযোগী ছিল ফ্রান্স, বৃটেন ও জার্মানী। কিন্তু স্বাধীন রাজ্য হিসাবে জাঞ্জিবারেরও সেখানে কিছুটা গুরুত্ব থাকে। ফ্রান্সকে ম্যাডাগাস্কারে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে পূর্ব আফ্রিকার ভূখণ্ডে তার প্রতিযোগিতার হাত থেকে বৃটেন রেহাই পায়, কিন্তু ১৮৮৪ সালের পর থেকে তীব্র জার্মান প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। পরিশেষে, ১৮৮৬ ও ১৮৯০ সালে দু'টি চুক্তির মারফত পূর্ব আফ্রিকায় ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয়।

উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় ফ্রান্স ও বৃটেন ছাড়া ছিল ইতালী। কিন্তু এদের ত্রিভুজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ইথিওপিয়া নিজ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়।

এখন পূর্বোক্ত অঞ্চলগুলির ইতিহাস আর-ও বিস্তৃতভাবে অনুসরণ করা যাক।

তৃতীয় অধ্যায় : পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা বিভাজন

এক

ভৌগোলিক ঐক্য পশ্চিম আফ্রিকার আধুনিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মরিতানিয়া থেকে শুরু করে নাইজেরিয়া পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড হল কয়েকটি নদনদীর সমতল অববাহিকা। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ অংশ উপকূলের নির্গমপথের ওপর নির্ভরশীল। ঐতিহাসিক রবার্টস্ তাঁর 'হিস্ট্রী অফ্ ফ্রেঞ্চ কলোনিয়্যাল পলিসি' নামক গ্রন্থে বলেছেন, উপকূলভূমি অধিকার করে ক্রমশঃ অন্তর্বর্তী অংশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার কাহিনীই হল পশ্চিম আফ্রিকার প্রতিটি দেশের ইতিহাস। রবার্টসের মতে তাঁর এই মন্তব্য পূর্বতন ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ পরে দেখা গেল, ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকায় পশ্চাদভূমির উপকূলনির্ভরতা অন্য অঞ্চলের তুলনায় অধিকতর সুস্পষ্ট।

সেনেগাল নদীর মোহানায় ফরাসীরা ষোড়শ শতাব্দীর শেষে এক স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তোলে। কিন্তু উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত সেখান থেকে রাজ্য বিস্তারের কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয় নি। ১৮৫৪ সালে জেনারেল ফেদহার্বকে সেনেগালের শাসক করে পাঠানো হল। ফেদহার্বের কর্মতৎপরতাই পশ্চিম আফ্রিকায় ফ্রান্সের বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। তাঁর প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তী এলাকার উপজাতি প্রধানদের সঙ্গে নানা চুক্তি সম্পাদন মারফত ফরাসী আধিপত্য বিস্তার ঘটায়। ফরাসীরা সিয়েরা লিওন ও গোল্ডকোস্টের বৃটিশ উপনিবেশকে আভ্যন্তরীণ পশ্চাদভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করল সেনেগাল নদী ধরে অগ্রসর হয়ে।

১৮৭০ সালে যখন ফ্রান্স ইওরোপে প্রুশিয়ার হাতে পরাজয়ের সম্মুখীন, তখন পশ্চিম আফ্রিকায় তার সেনাপতি ও রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়ানো উপনিবেশ, রক্ষিত অঞ্চল এবং 'পোয়্যা দাপ্যুই'গুলি (সাহায্যকেন্দ্র বা ঘাঁটি) সংযুক্ত ও সুসংবদ্ধ করতে ব্যস্ত। গত শতাব্দীর নবম দশকের শেষে

পারীর ফরাসী উপনিবেশ দফতরের অন্যতম কর্তা এতিয়েন পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসী সেনাপতি ও শাসকদের সাম্রাজ্যবিস্তারে সোৎসাহ সমর্থন জানান। এতিয়েনের স্বপ্ন ছিল দাকার থেকে দাহোমে পর্যন্ত এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, যার সঙ্গে সাহারার মধ্য দিয়ে আলজেরিয়া যুক্ত হবে। এতিয়েনের এই সাম্রাজ্য-স্বপ্নে যোগ দিল সত্তপ্রতিষ্ঠিত ফরাসী আফ্রিকা সমিতি (১৮৯১) এবং ফরাসী শিল্পপতিরা। আফ্রিকা সম্বন্ধে শিল্পপতিদের উৎসাহ অহেতুক নয়। এদের দরকার ছিল রবার, উদ্ভিজ্জ তৈল এবং অন্যান্য কাঁচা মাল। ১৮৮০-এর পর থেকে পশ্চিম আফ্রিকায় ফরাসী বাহিনীর অগ্রগতির পরিচয় নীচের তথ্যাদিতে লভ্য :

১৮৮৩ বামাকো (বর্তমান মালি) পৌঁছোয়।

১৮৮৭ সিয়েরা লিওন থেকে পর্তুগীজ গিনির মধ্যবর্তী অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। অর্থাৎ সিয়েরা লিওনের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে এবং পর্তুগীজ গিনির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে সম্প্রসারণের সম্ভাবনা শেষ হয়।

১৮৮৮-৯০ বামাকো থেকে ফরাসী বাহিনী আইভরী কোস্টে পৌঁছোয় এবং এর মারফত বৃটিশ উপনিবেশ গোল্ডকোস্টের পশ্চিমদিকে বিস্তৃতির পথ বন্ধ করা হয়।

১৮৯১ আইভরী কোস্টে ফরাসী বাহিনী লাইবেরিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত থেকে গোল্ডকোস্টের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ গোল্ডকোস্টের পশ্চিমদিকে এবং লাইবেরিয়ার পূর্ব দিকে সম্প্রসারণের পথ বন্ধ হয়।

১৮৯১ সেগু অধিকার।

১৮৯১-৯৭ সেগু থেকে অগ্রবর্তী বাহিনী উর্ধ্ব হবলতার অববাহিকা অঞ্চল দখল করে। তার মানে বৃটিশ গোল্ডকোস্টের উত্তর দিকে সম্ভাবনা বন্ধ হয়।

১৮৯৩-৯৪ সেগু থেকে আর একটি বাহিনী নাইজার নদী ধরে উত্তর-পূর্বে এগিয়ে প্রসিদ্ধ শহর, টিম্বুকটু দখল করে।

১৮০৯ টিম্বুকটু পেরিয়ে ফরাসী বাহিনী বর্তমান নাইজেরিয়ার (তৎকালীন বৃটিশ উপনিবেশ নাইজেরিয়া) উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আসে।

১৮৯৬-১৯০০ সেখান থেকে সোজা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে 'শাদ' হ্রদের পশ্চিম কূলে উপনীত হয় ফরাসী বাহিনী। প্রায় একই সময়ে উত্তর

আফ্রিকা থেকে আর এক বাহিনী সরাসরি সাহারা মরুভূমির মধ্য দিয়ে দক্ষিণে এসে পৌঁছল 'শাদ' হ্রদে।

সেনেগাল থেকে এইরকমভাবে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে গিনি উপসাগরের উপকূলস্থ ফরাসী ঘাঁটি থেকে উত্তর ও উত্তর-পূর্বে অভিযান চলে। এমনিভাবে অন্য ইওরোপীয় শক্তির অধিকৃত অঞ্চল ঘিরে ফেলে এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যাত্রা করেছে যে সব বাহিনী তাদের সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করে, পশ্চিম আফ্রিকায় ফ্রান্স এক সুসংবদ্ধ ও সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলল। ১০ বছরে (১৮৯১-১৯০০) ফরাসী বাহিনী এমন অঞ্চল জয় করেছিল পূর্ব-পশ্চিমে, যার দৈর্ঘ্য হবে ১৫০০ মাইল এবং যার আয়তন (অবশ্য ক্যামেরুন ও টোগোল্যাণ্ড বাদে, কারণ ও দুটি অঞ্চল ম্যাণ্ডেট হিসাবে ফ্রান্সের শাসনাধীনে আসে প্রথম মহাযুদ্ধের পর) ছিল ২০ লক্ষ বর্গমাইলের কিছু কম। এ কথা মনে রাখলেই সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার স্লিৎস্‌ক্রিগের তাৎপর্য অনুধাবন করা যাবে।

দুই

এত দ্রুতগতিতে কাজ সারা হয়েছে বলে পশ্চিম আফ্রিকায় ফ্রান্সের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না এমন কথা ভাবলে ভুল হবে। কার্যতঃ ফ্রান্স ছাড়া আরও তিনটি ইওরোপীয় দেশ পশ্চিম আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবিস্তারে ব্যস্ত ছিল: পর্তুগাল, ইংল্যাণ্ড এবং ১৮৮৪ সালের পর থেকে জার্মানী।

ফ্রান্সের যেমন সেনেগাল, তেমন গিনি (পর্তুগীজ) বহুদিন ধরে পর্তুগালের উপনিবেশ। কিন্তু সেনেগালের মত পর্তুগীজ গিনি কোন বড় নদীর মোহনায় অবস্থিত নয়। অর্থাৎ অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করার মত উপযুক্ত প্রবেশ পথ পর্তুগালের হাতে ছিল না। অবশ্য সেরকম কোন সুবিধা থাকলেই যে পর্তুগাল ফ্রান্সের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হত সেকথা বলছি না; কারণ পর্তুগালের তুলনায় ফ্রান্সের লোকবল তথা অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা অনেক বেশী ছিল। তার ওপর আফ্রিকার দক্ষিণাংশে আঙ্গোলা ও মোজাম্বিকে পর্তুগাল তার উপকূলস্থিত উপনিবেশগুলি সম্প্রসারণের কাজে ব্যস্ত থাকায় পশ্চিম আফ্রিকা বিভাজনে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় তার পক্ষে সহজ ছিল না। তবু সাধ্য না থাকলেও, সাধ

থাকতে আপত্তি নেই। ১৮৮৫ সালে পর্তুগাল অন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের জানিয়ে দিল যে দাহোমে'র রাজার সঙ্গে এক চুক্তি বলে দাহোমে পর্তুগীজ রক্ষিত রাজ্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সের সুসংবদ্ধ পশ্চিম আফ্রিকান সাম্রাজ্যের একটা বড় অবলম্বন ছিল দাহোমে। তাই পর্তুগালের দাবিতে কর্ণপাত না করে ফ্রান্স বলপ্রয়োগে তার কর্তৃত্ব দাহোমের অভ্যন্তরেও বিস্তৃত করল (দাহোমের উপকূলবর্তী অঞ্চল এর আগেই ফ্রান্সের অধিকারে এসেছে।) এমনি করে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' কথাটির সার্থকতা ফরাসী বীরেরা আরেকবার প্রমাণ করলেন।

তিন

তবে পশ্চিম আফ্রিকায় ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ছিল বৃটেন। এবং বৃটেনের সঙ্গে ফ্রান্সের সবচেয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নাইজার নদীর মোহানা এবং অববাহিকা নিয়ে। নীলনদ ও কঙ্গো নদীর মত, নাইজার নদীও আফ্রিকার অন্যতম প্রধান নদী। মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পক্ষে এরকম এক নদীর সামরিক ও ভৌগোলিক গুরুত্ব অপরিসীম। তার ওপর নাইজার অববাহিকায় ও ব-দ্বীপে উৎপন্ন উদ্ভিজ্জ তৈল ইওরোপীয় শিল্পের পক্ষে এক বিশেষ প্রয়োজনীয় পণ্য। এ হেন নাইজার মোহানা, ব-দ্বীপ এবং অববাহিকার জন্যে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিযোগিতা যে তীব্রতম হবে তা সহজেই অনুমেয়। প্রথম প্রথম অবশ্য প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ বেসরকারী সওদাগরী কোম্পানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। জর্জ গোল্ডি ট্রাওরম্যান নামে একজন ভূতপূর্ব বৃটিশ অফিসার ইউনাইটেড আফ্রিকা কোম্পানী বলে এক প্রতিষ্ঠান খাড়া করলেন নাইজার ব-দ্বীপে বাণিজ্যই ছিল যার লক্ষ্য।

অন্যদিকে একই উদ্দেশ্যে ফরাসী বণিকদের আনুকূল্যে 'কঁপাঞি ফ্রাঁসেজ দ্য ল্যাফ্রিক একাডোরিয়াল' বলে অন্য এক সওদাগরী কোম্পানী স্থাপিত হল। বলাবাহুল্য, ফরাসী ও বৃটিশ কোম্পানীর তীব্র প্রতিযোগিতা হতে বাধ্য কারণ দু'পক্ষই শুধুমাত্র বাণিজ্যেরই বিস্তার চায় নি—সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক প্রভুত্বও তাদের কাম্য ছিল। বৃটিশ কোম্পানীর অর্থবল ছিল বেশী এবং যে সমস্ত জায়গায় ফরাসী সওদাগরেরা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল, সেখানে

তারা নিজেদের পণ্যের দাম ২৫% কমিয়ে দিল। ফলে ফরাসী বাণিজ্য ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ায় ফরাসী কোম্পানী সরকারের কাছ থেকে সাহায্য চায়। নানা কারণে ফরাসী সরকার আর্থিক সাহায্য দিতে অপারগ হলে, ১৮৮৪ সালে ফরাসী কোম্পানী দুটি গোল্ডির কাছে বিক্রয় করা হয়।

১৮৮৪-৮৫ সালে অনুষ্ঠিত বের্লিন সম্মেলনে তাই গোল্ডি সদর্পে বলতে পেরেছিলেন, নিম্ন নাইজারের অববাহিকায় বৃটেনের প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে আর কেউ নেই। বের্লিন সম্মেলন থেকে নাইজার নদীর মোহানা ও ব-দ্বীপে বৃটিশ আধিপত্য স্বীকৃত হলে গোল্ডি প্রায় ৪০০ চুক্তির খসড়া তৈরি করেছিলেন বলে প্রকাশ। সে সব চুক্তি স্থানীয় রাজা ও উপজাতীয় প্রধানদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা হয়। ১৮৮৫ সালে নাইজেরিয়ার উপকূল বৃটিশ আশ্রিত রাজ্য ঘোষিত হল। পরের বছর গোল্ডির কোম্পানী এক রাজকীয় সনদ পায়, যার মারফত কোম্পানীর হাতে (নতুন নাম হল : রয়্যাল নাইজার কোম্পানী) ব্যবসায় চালানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য-জয় ও শাসন করার ক্ষমতাও আসে। রয়্যাল নাইজার কোম্পানীকে অবশ্য বেশীদিন রাজ্য শাসন করতে হয় নি। ১৯০০ সালে বৃটিশ সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে তার হাত থেকে রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে নেয়।

পশ্চিম আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবিস্তারে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে স্বার্থবিরোধের মীমাংসা প্রধানতঃ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে (অর্থাৎ বড় গোছের যুদ্ধ না করে) সম্পন্ন হয়েছিল। যে সব চুক্তি বিবাদ নিষ্পত্তির সহায়তা করে, তার মধ্যে নীচেরগুলি উল্লেখযোগ্য :

(ক) বের্লিন সম্মেলন ১৮৮৪-৮৫ : স্থির হল যে, বৃটেন নাইজার নদীর মোহানা এবং অববাহিকার দক্ষিণাংশ পাবে, আর ফ্রান্স পাবে অববাহিকার উত্তরাংশ।

(খ) ১৮৯০ সালের সাময়িক চুক্তি—যার সিদ্ধান্ত ছিল, নাইজার নদী ও 'শাদ' হ্রদের মধ্যবর্তী এলাকা বৃটিশ প্রভাবাধীন বলে গণ্য হবে, পক্ষান্তরে ম্যাডাগাস্কার ফরাসী আশ্রিত রাজ্য এবং সাহারা ফরাসী প্রভাবাধীন এলাকা বলে স্বীকৃত হবে।

(গ) ১৮৯৮ সালের চুক্তি (খ) উল্লিখিত অঞ্চলের সীমারেখা নির্ণয় করল। নিম্ন নাইজার অববাহিকা থেকে ফ্রান্সকে চিরতরে বিদায় নিতে হয় এবং বর্গু ও সোকোটোর ওপর বৃটিশ কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া হল।

(ঘ) ১৮৯৯ সালে ফাশোদা সংকটের পর যে চুক্তি হয়, তার মারফত ফ্রান্স স্বীকার করে যে উর্ধ্ব নীল উপত্যকা বৃটিশ 'প্রভাবিত' এলাকার মধ্যে পড়ে। এর বদলে বৃটেন শাদ হ্রদকে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব সীমানা এবং নীল ও কঙ্গো নদীর জলবিভাজিকা রেখাকে ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকার পূর্ব সীমানা বলে মেনে নিল।

চার

এইখানে আফ্রিকা বিভাজনে জার্মানীর ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। আমাদের মনে রাখা দরকার, আফ্রিকায় প্রভুত্ব বিস্তারে জার্মানী হঠাৎ উৎসাহী হয়ে ওঠে নি। আফ্রিকা বিভাজনের দু'শতকেরও বেশী আগে প্রুসীয় জাহাজ দাসব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করেছে। এমন কি প্রুসিয়ার শাসক সেনেগালের মোহানার কাছে একটি দ্বীপ পর্যন্ত ক্রয় করেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে ব্রাণ্ডেনবুর্গ আফ্রিকান কোম্পানী নামে একটি জার্মান কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও বছর চল্লিশ বাদে এর কারবার গুটিয়ে ফেলা হয়। তবু এসব ঘটনাসত্ত্বেও একথা সত্য যে, জার্মানদের সামনে সাগর পেরিয়ে আফ্রিকায় (বা অন্য কোথাও) গিয়ে রাজ্যবিস্তারের চেয়ে জার্মানভাষীদের একরাষ্ট্রভুক্ত করাই ছিল অনেক জরুরী কাজ। ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গঠন ১৮৭০ সাল পর্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল। অতএব খুব স্বাভাবিকভাবে তার আগে পর্যন্ত আফ্রিকায় ক্ষমতা বিস্তারে বৃটেন ও ফ্রান্সের তুলনায় জার্মানী পেছিয়ে ছিল। ১৮৭০ সালের পরেও কয়েক বছর পর্যন্ত বিসমার্ক আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত: দেশকে সুসংবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত করার সমস্যা, ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে 'কুলটুরকাম্পফ' নীতি নিয়ে সুতীব্র সংঘাত, জাতীয় উদারনৈতিক দলের সঙ্গে কর্মসূচীর সামঞ্জস্য রক্ষার সমস্যা। এবং এখানে বলা দরকার, জাতীয় উদার-নৈতিক দল রাষ্ট্রানুকূল্যে সাম্রাজ্যবিস্তারের বিপক্ষে ছিল। তা ছাড়া জার্মানীর তৎকালীন বৈদেশিক নীতির সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য বৃটেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখা। স্বভাবতঃ বিসমার্ক এমন কোন কাজ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, যা ইংলণ্ডকে শত্রুভাবাপন্ন করে তুলবে। তার ওপর নিজ নৌবহরের দুর্বলতার জন্যও জার্মানী ইংল্যাণ্ডের শত্রুতা সযত্নে এড়াতে চেয়েছিল।

১৮৭৬ সাল থেকে এ নীতির পরিবর্তন শুরু হল। প্রথমতঃ সারা ইওরোপে সে সময় নতুন করে সাম্রাজ্যবিস্তারে আগ্রহ দেখা দিয়েছে। ১৮৭৮ সালে বল্কান সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য আহুত বের্লিন কংগ্রেস জার্মানদের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। প্রায় এক সময়ে অন্যত্র সমর্থন পাওয়ার ফলে বিসমার্ক জাতীয় উদারনৈতিকদের সঙ্গে মৈত্রীভঙ্গ করতে সক্ষম হলেন। এরপর অবাধ বাণিজ্যের বদলে সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তনের পথে বিশেষ বাধা রহিল না। ১৮৮০ সালের পর থেকে মুখে সাম্রাজ্যবিস্তারের বিপক্ষে বললেও, বিসমার্ক গোপনে বিদেশস্থিত জার্মান বণিক ও সওদাগরদের সক্রিয় সমর্থন দিচ্ছিলেন। ১৮৮৩ সালে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় জার্মানবণিক ল্যুডেরিভজকে রক্ষার আশ্বাস দেওয়া হয়। একই বছরে বিসমার্ক হানসা (জার্মানীর উত্তর অঞ্চলের বাণিজ্যপ্রধান শহরগুলির নাম) বণিকদের কীভাবে আফ্রিকায় তাদের সওদাগরী স্বার্থ রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে প্রস্তাব পাঠাতে বলেন।

এই সঙ্গে একাধিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও কাজে নামে। এতদিন পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে যেসব কাজ হচ্ছিল সেগুলির সমন্বয় বিধানের জন্য ১৮৮২ সালে স্থাপিত হল "কোলোনিআল-ফেরাইন"। তার দু'বছর বাদে পূর্ব আফ্রিকায় জার্মান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রধান নেতা কার্ল পেটার্স-এর উদ্যোগে স্থাপিত হল "ডি গেজেলশাফ্‌ট ফ্যুর ডয়চে কোলোনিজাৎসিওন", পূর্ব আফ্রিকায় জার্মান সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাই ছিল যার উদ্দেশ্য। ১৮৮৭ সালে এই দুই সংগঠন "ডি ডয়চে কোলোনিআল গেজেলশফ্‌ট" নামে ঐক্যবদ্ধ হন। এই ঐকীভূত সংগঠন জার্মান সাম্রাজ্যবিস্তারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

ইতিমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জার্মানীর সাম্রাজ্যবিস্তারের অনুকূল হয়েছে। অভ্যন্তরে ক্যাথলিকচার্চের সঙ্গে সংঘাত শেষ হয়েছে ও জাতীয় উদারনৈতিকদের ওপর বিসমার্ক আর তেমন নির্ভরশীল নন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃটেনের সঙ্গে মৈত্রীর প্রয়োজন আর বিশেষ ছিল না। কারণ, ততদিনে জার্মানীর সামরিক শক্তি অনেক বেড়েছে এবং জার্মান সরকার অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারী, ইতালী ও রাশিয়ার বন্ধুত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এখন প্রয়োজন শুধু এক সুবিধাজনক মুহূর্তের, যখন জার্মান সরকার প্রকাশ্যে সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে নেমে পড়বে। সে সুযোগের অপেক্ষায় জার্মান সরকার চুপ করে বসে থাকে নি।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ল্যুদেরিভজ্ নামে ব্রেমেনের এক সওদাগর জার্মান সরকারকে এই মর্মে অনুরোধ জানান যে যদি তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় কোন অঞ্চল দখল করেন, তবে যেন জার্মান সরকার তাঁর সম্পত্তি ও অন্যান্য স্বার্থ সংরক্ষণ করে। বিসমার্ক উত্তর দেন যে তিনি এমন প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত, অবশ্য যদি না অন্য কোন দেশ সে অঞ্চল তার নিজের অধিকারে বলে দাবি করে। এরপর জার্মান সরকার বৃটেনের কাছে জানতে চায় যে 'আঙ্গরা-পেকেনা' অঞ্চলে তারা সার্বভৌমত্ব দাবি করে কি না। বৃটিশ সরকার উত্তরে জানায় যে ঠিক কোন্ জায়গায় ল্যুদেরিভজের সম্পত্তি তা না জানলে তারা কিছু বলতে পারবে না। এরপর ল্যুদেরিভজ বর্তমান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলবর্তী কিছু জমি দখল করেন। তখন বৃটিশ সরকার জানায় যে পর্তুগীজ আঙ্গোলার দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত (আঙ্গরা-পেকেনা তার মধ্যে পড়ে) বৃটেন সার্বভৌমিত্ব দাবি করে। বিসমার্ক তখন প্রশ্ন করেন— এ দাবির ভিত্তি কী? (১৮৮৪-৮৫ সালের বের্লিন কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন অঞ্চল দখল করার আগে সংশ্লিষ্ট অন্য দেশকে নোটিশ দিতে হত এবং কোন জায়গায় কারো দাবি আইন সম্মত বলে মানার কথা হয় যদি সে জায়গা তার সক্রিয় অধিকারে থাকে)। এর উত্তর আসতে অনেক দেরি হয়। আসলে তখন বৃটিশ সরকার ও কেপ উপনিবেশের স্থানীয় সরকারের মধ্যে আঙ্গরা-পেকেনা অঞ্চল অধিকার সম্পর্কে কথাবার্তা চলছিল। দখল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ১৮৮৪ সালের জুলাই মাসে। কিন্তু তার আগেই বিসমার্ক দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত জার্মান কনসাল জেনারেলকে এক টেলিগ্রাম মারফত জানিয়ে দিয়েছেন যে জার্মানী হের ল্যুদেরিভজের স্বার্থ সংরক্ষণ করার ভার নিয়েছে। এই ভাবে ১৮৮৪ সালের ৭ই আগস্ট আঙ্গরা-পেকেনায় জার্মান পতাকা উত্তোলিত হল।

অবশ্য আফ্রিকার অন্য অংশে জার্মান নিশান আরো আগে উড়েছে। ১৮৮৪ সালের গোড়ার দিকে বিসমার্ক বিখ্যাত পর্যটক ডক্টর গুস্টাফ্ নাখ্টিগালকে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে এক 'রহস্যজনক' কাজে পাঠান। অন্যদের বলা হয় যে নাখ্টিগাল জার্মান ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন। নাখ্টিগালকে অবশ্য গোপনে নির্দেশ দেওয়া হল, আঙ্গরা-পেকেনা ও অন্যান্য জায়গায় সুবিধা বুঝে জার্মান সার্বভৌমত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। জুলাই মাসের গোড়ায় নাখ্টিগাল, বর্তমান

টোগোল্যাণ্ডের উপকূলে এসে পৌছে সোজাসুজি স্থানীয় রাজার সঙ্গে এক চুক্তি করলেন। ৫ই জুলাই আফ্রিকায় সর্বপ্রথম কাইজারের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা তোলা হয় টোগোল্যাণ্ডে। এরপর নাখ্‌টিগাল পূর্বদিকে যাত্রা করলেন। ক্যামেরুন্স অঞ্চলে জার্মান বণিকেরা ইতিমধ্যেই স্থানীয় উপজাতীয় প্রধানদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। কিন্তু নাখ্‌টিগাল আসার ঠিক আগেই এক বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজের উপস্থিতিতে মনে হল, ক্যামেরুন্সে বৃটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু জার্মানীর সৌভাগ্যবশতঃ বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ স্থানীয় অধিবাসীদের ভয় দেখানো ছাড়া আর বেশী কিছু করতে পারে নি। কারণ যাঁর কাছে চুক্তির খসড়া ছিল এবং যিনি বৃটিশ সরকারের হয়ে স্থানীয় রাজা বা প্রধানদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারতেন সেই বৃটিশ কনসাল, হিউয়েট, তখনও এসে পৌছোন নি। এমনি সময় নাখ্‌টিগাল ১১ই জুলাই তাঁর যুদ্ধজাহাজসহ উপস্থিত হলেন এবং বিনা কালক্ষেপে স্থানীয় উপজাতি প্রধানের সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলেন। তারপর সেখানে জার্মান পতাকা উত্তোলিত হল। নাখ্‌টিগাল বৃটিশ সরকারকে এতদিন ধরে জার্মান বণিকদের রক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ পাঠালেন। অবশ্য তার সঙ্গে এটুকু জানাতে ভুললেন না যে ভবিষ্যতে এ দায়িত্বটা জার্মান সরকার পালন করবে।

এর কিছুদিনের মধ্যেই ডক্টর কার্ল পেটার্স ছলে-বলে-কৌশলে পূর্ব আফ্রিকার প্রধানদের সঙ্গে বহু সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এবং এর ভিত্তিতে বর্তমান ট্যাঙ্গানাইকা জার্মানীর আশ্রিত অঞ্চল বলে দাবি করা হয়। জাঞ্জিবারের সুলতান যখন প্রতিবাদ জানালেন, তখন বের্লিন সরকার (১৮৮৫ সালের আগস্ট মাসে) যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে নিজ দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

এমনি করে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানী আফ্রিকায় চারটি উপনীবেশের মালিকানা পায়, টোগোল্যাণ্ড, ক্যামেরুন্স, জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ও জার্মান পূর্ব আফ্রিকা (বর্তমান ট্যাঙ্গানাইকা ও রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি)।

তারপর শুরু হয় সাম্রাজ্য সুসংহত করার পালা: অভ্যন্তরে প্রভুত্ব বিস্তার পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও মুদ্রা অর্থনীতির সম্প্রসারণ। ঐতিহাসিক কারণে অবশ্য জার্মান আফ্রিকান সাম্রাজ্য বেশীদিন টেঁকে নি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পরাজিত জার্মানীর উপনিবেশগুলি ম্যাণ্ডেট অঞ্চল হিসাবে মিত্র শক্তিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

পাঁচ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে একের পর এক পর্যটক আফ্রিকায় আসেন। মাঙ্গো পার্ক (১৭৯৫-৯৭ এবং ১৮০৫-১৮০৬) থেকে শুরু করে মাশা (১৮৯৮) পর্যন্ত বহু পর্যটক ও আবিষ্কারক আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ ভূগোল সম্বন্ধে বহির্বিশ্বের জ্ঞান বাড়িয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আফ্রিকা বিভাজন অসম্ভব হত যদি না এই সব পর্যটক প্রাকৃতিক বাধা না মেনে, নিজের জীবন বিপন্ন করে, এমনকি কখনও কখনও প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশের অজ্ঞাত অঞ্চল সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করতেন।

এইসব পর্যটক ও আবিষ্কারকদের মধ্যে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী তিনি হলেন ডেভিড লিভিংস্টোন। লিভিংস্টোন তিনবার আফ্রিকা অভিযানে গেছেন এবং সবসুদ্ধ ২৮ বছর আফ্রিকায় কাটিয়েছেন। এই পর্যটকের তৃতীয় অভিযানের সময় যখন বহুদিন তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি তখন আমেরিকার 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' পত্রিকা স্ট্যানলে নামধেয় এক পর্যটককে লিভিংস্টোনকে খুঁজে বার করতে এবং সাহায্য করতে পাঠায়। এরপর অবশ্য স্ট্যানলে নিজেও কঙ্গো নদীর অববাহিকায় অভিযান চালিয়ে কঙ্গোর গতিপথ সম্বন্ধে নতুন তথ্য সংগ্রহ করেন। স্ট্যানলে ও আরো দু'একজন পর্যটকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বেলজিয়ান-রাজ লেওপোল্ডের মনে ঔৎসুক্য সঞ্চার করে। ১৮৭৬ সালের ব্রাসেল্‌স্ সম্মেলন তার ফল। এই সম্মেলন অন্যত্র বিশদভাবে আলোচিত হওয়ায়, সে-প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপনের আর প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু এইটুকু বলা দরকার যে সম্মেলনোত্তরকালে লেওপোল্ড কঙ্গো অঞ্চল সম্বন্ধে অধিকতর মনোযোগী হয়ে উঠলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে স্ট্যানলে বেলজিয়ান-রাজের পক্ষে তাঁর অভিযান শুরু করেন। দু'বছর দীর্ঘ, দুর্গম পথ অতিক্রমের পর স্ট্যানলে এসে পৌছোলেন যেখানে তার নাম আজ স্ট্যানলে পুল। এইখানে তিনি দ্য ব্রাজা বলে অন্য এক পর্যটকের সাক্ষাৎ পেলেন। দ্য ব্রাজাকে ফরাসী সরকার প্রতিনিধি করে মধ্য আফ্রিকায় পাঠায়। এবং দ্য ব্রাজা কঙ্গো নদীর মোহনার উত্তরে ফরাসী বাণিজ্য কেন্দ্র গাবোঁ থেকে মধ্য আফ্রিকায় অনুপ্রবেশ করেন। যাই হোক, কঙ্গোর দক্ষিণ তীরে স্ট্যানলে লিওপোল্ডভিল বলে এক নগরের পত্তন করলেন, উত্তরে ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলে স্থাপিত হল ব্রাজাভিল।

এরপর স্ট্যানলে কঙ্গো নদী ধরে উত্তর পূর্বে এগিয়ে যান। তাঁর লোকজন বন কেটে রাস্তা তৈরি করল। এবং কিছু দূর অন্তর অন্তর তিনি মোট ২০টির বেশী ঘাঁটি স্থাপন করলেন। এ ছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে স্থানীয় রাজা ও সর্দারদের সঙ্গে সবসুদ্ধ ৪০০ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ঐতিহাসিক মুনের ভাষায়, "নিরক্ষর অধিবাসীদের দিয়ে এই ধরনের চুক্তিতে স্বাক্ষর করানো হল ভয় দেখিয়ে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে এবং কখনও কখনও ভেট পাঠিয়ে। অন্য ইওরোপীয় শক্তির কাছে কঙ্গো অঞ্চলে সার্বভৌমত্ব দাবি করার পক্ষে এই সব চুক্তি ছিল যথেষ্ট।" অবশ্য সার্বভৌমত্বের দাবি তোলা হয় প্রথমে আসোসিয়াসিওঁ অ্যাতারনাসিওনাল দ্যু কঁগো এবং ১৮৮২ সালের পরে কমিতে দেত্যুদ্ দ্যু হোৎ কঁগো নামক প্রতিষ্ঠানের নামে। কিন্তু সকলেই জানত এদের পেছনে আছেন বেলজিয়ামের রাজা লেওপোল্ড।

স্ট্যানলে ছ ব্রাজার প্রতিযোগিতা দু'টি দেশে ভীতিসঞ্চার করল: পর্তুগাল ও ইংল্যাণ্ড। ইউরোপীয় দেশের মধ্যে পর্তুগাল সর্বপ্রথম কঙ্গো নদীর মোহানা আবিষ্কার করে। এবং বহুদিন পর্যন্ত কঙ্গো রাজ্যের সঙ্গে পর্তুগালের কূটনৈতিক ও অন্যবিধ সম্পর্ক বজায় ছিল। উনবিংশ শতকের শেষে এসে পর্তুগীজ সরকার সোদ্বেগে দেখে যে অন্য ইওরোপীয় দেশের সাম্রাজ্যবিস্তারে কঙ্গো অঞ্চলের ওপর তার দাবি অগ্রাহ্য হবার উপক্রম হয়েছে।

ওদিকে ছ ব্রাজার কল্যাণে যে ফ্রান্স কঙ্গো অঞ্চলে স্বকীয় প্রাধান্য বিস্তার করছে এ-ঘটনা বৃটেনের দৃষ্টি এড়ায় নি। এবং বৃটিশ রাজনৈতিক নেতারা মনে করতেন, ফ্রান্সের অধিকার যে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে বৃটেনের বাণিজ্যিক অধিকার সঙ্কুচিত হতে বাধ্য।

অতএব, বৃটেন ও পর্তুগাল ১৮৮৪ সালে এক চুক্তি স্বাক্ষর করল। এ চুক্তির চারটি প্রধান সর্ত ছিল: (ক) উপকূল এবং অভ্যন্তরে পণ্যদ্রব্য পাঠানোর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। (খ) পর্তুগাল হ্রদ অঞ্চলে (ভিক্টোরিয়া, অ্যালবার্ট ইত্যাদি) বৃটিশ স্বার্থ মেনে নেবে। (গ) কঙ্গো নদীর মোহানায় পর্তুগীজ সার্বভৌমত্ব বৃটেন স্বীকার করবে। (ঘ) এক ইঙ্গ-পর্তুগীজ কমিশন কঙ্গো নদীর নৌচালন ইত্যাদি তত্ত্বাবধানের ভার পাবে।

ইঙ্গ-পর্তুগীজ চুক্তিতে আপত্তি ওঠে বহু দেশে: ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জার্মানী এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত। প্রায় সকলেরই অনুযোগ

ছিল, ঐ চুক্তির মাধ্যমে বৃটেন কঙ্গোদেশে প্রকারান্তরে নিজের আধিপত্য স্থাপন করেছে। এদের মধ্যে জার্মানীর পক্ষে বৃটিশ বিরোধী মনোভাবের কতকগুলি প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সামোয়া ও ফিজি দ্বীপকে কেন্দ্র করে জার্মানী ও বৃটেনের মধ্যে ইতিমধ্যেই মনোমালিন্য শুরু হয়েছে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার আঙ্গরা-পেকেনা নিয়ে দ্বন্দ্ব তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে।

এই ইঙ্গ-জার্মান বিচ্ছেদ প্রকারান্তরে ফ্রাঙ্কো-জার্মান আঁতাতের জন্ম দিল। এবং ফ্রান্স ও জার্মানীর যৌথ উদ্যোগে ইঙ্গ-পর্তুগীজ চুক্তিকে বাতিল করার জন্য বের্লিনে এক সম্মেলন আহূত হয়। এ সম্মেলনে যোগ দেয় মোট ১৫টি রাষ্ট্র। ইউরোপের বাইরে থেকে কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অংশীদার ছিল (তুরস্ককে আমরা অন্যতম ইউরোপীয় শক্তি বলে ধরে নিচ্ছি)। আসোসিয়াসিঁও অ্যাঁতারনাসিওনাল দ্যু কঁগো থেকে দুজন প্রতিনিধি বেসরকারীভাবে সম্মেলনে যোগ দিলেন। এছাড়া আমেরিকান ও বেলজিয়াম প্রতিনিধিরা ও এই সংস্থার স্বার্থ সংরক্ষণে মন দিলেন। এ কথা সত্য যে আসোসিয়াসিকেঁওঁকে রাষ্ট্রের পদমর্যাদা দেওয়া হয় নি। তবু সম্মেলনের আগেই লেওপোল্ডের কূটনৈতিক চাতুর্যে তিনটি বৃহৎ শক্তি, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং জার্মানী, এই সংস্থাকে একটি সার্বভৌম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নিয়েছিল।

আমেরিকান সরকার ভেবেছিল স্বাধীন কঙ্গো রাজ্য লাইবেরিয়া প্রজাতন্ত্রের আদর্শে শাসিত হবে (লাইবেরিয়া হল কয়েকটি আমেরিকান সেবাপ্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি)। এছাড়া দাস ব্যবসায় বন্ধ করা ও অবাধ বাণিজ্যের অধিকার সংরক্ষণ সম্বন্ধে লেওপোল্ডের ফাঁকা প্রতিশ্রুতিতে আমেরিকা বিশ্বাস করেছিল। এইসব কারণে লেওপোল্ড চালিত আসোসিয়াসিঁও অ্যাঁতারনা-সিওনালকে প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান ভেবে মার্কিন সরকার তাকে স্বীকৃতি দেয়।

তার কিছুদিনের মধ্যে ফ্রান্সও এই সংস্থাকে স্বীকার করে নিল। তবে এই স্বীকৃতির পেছনে একটি সর্ত থাকে: যদি কখনও এর সম্পত্তি বিক্রীত হয়, তবে ফ্রান্স 'অগ্রক্রয়াধিকার' বা 'প্রিএম্প্‌শন' পাবে। ফরাসী সরকার ভেবেছিল, ভবিষ্যতে 'আসোসিয়াসিঁও অ্যাঁতারনাসিওনাল' তার সম্পত্তি ও অধিকার বিক্রি করতে বাধ্য হবে। এবং তখন ফ্রান্স হবে কঙ্গোদেশের মালিক।

ফ্রান্সের সঙ্গে এই চুক্তিতে জার্মানী সন্ত্রস্ত হল। যদি ভবিষ্যতে কঙ্গো দেশ

ফ্রান্সের কবলে গিয়ে পড়ে তবে অবাধ বাণিজ্যের নিশ্চয়তা কোথায় থাকবে? অতএব বিসমার্ক এক যুক্তি মারফত লেওপোল্ডের সংগঠনকে স্বীকৃতি দিলেন দুই মাত্র সর্তের বিনিময়ে : (১) কঙ্গো অববাহিকায় সকলের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার থাকবে এবং (২) এক গ্যারান্টি যে যদি কখনও অন্য দেশের কাছে আসোসিয়াসিওঁ তার সম্পত্তি বিক্রি করে তবে কঙ্গোর নতুন মালিকও অন্য সকলের অবাধ বাণিজ্য অধিকার বজায় রাখতে বাধ্য থাকবে।

আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানীর এই নেতৃত্ব অন্য সকলেও মেনে নেয়। এবং বের্লিন সম্মেলন শেষ হবার আগেই তুরস্ক বাদে অন্য সব অংশগ্রহণকারী-দেশ আসোসিয়াসিওঁ'র নিশান এক স্বাধীন, সাধভৌম রাষ্ট্রের পতাকা বলে স্বীকার করে। বাকী সব প্রতিনিধির সঙ্গে আসোসিয়াসিওঁ আনুষ্ঠানিকভাবে বের্লিন সম্মেলনের সিদ্ধান্তাবলীর প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করল।

আসোসিয়াসিওঁকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়ে প্রকারান্তরে কঙ্গো অববাহিকায় বেলজিয়ান অধিপত্য মেনে নেওয়া ছাড়া বের্লিন সম্মেলন আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নিষ্পত্তি করে।

ঠিক হল যে অতঃপর কোন এলাকায় অধিকার স্থাপনের আগে, দখলকারী শক্তি অন্য যেসব দেশ, বের্লিন সম্মেলনের সিদ্ধান্তাবলী মেনে নিয়েছে তাদের পূর্ব বিজ্ঞপ্তি দেবে, যাতে তারা এ-সম্পর্কে নিজেদের দাবি-দাওয়া জানাতে পারে। কোন অঞ্চলে কারো অধিকার আছে তখন-ই মানা হবে, যখন সেখানে তার দস্তুরমত সক্রিয় দখল বজায় থাকবে, অর্থাৎ কখন দাবিকারী শক্তি তার নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য সেখানে উপযুক্ত সংগঠন স্থাপন করতে পারে।

সম্মেলন কঙ্গোর মোহানা ও অববাহিকায় সার্বজনীন অবাধ বাণিজ্যের অধিকার সম্বন্ধে একমত হয়। স্থির হয়, এই অঞ্চলে একচেটিয়া অধিকার, অন্য রকমের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বা ভাষান্তরে যে কোন রকমের বিভেদমূলক ব্যবহার হবে।

এর সঙ্গে কঙ্গো, তার সমস্ত শাখা ও উপনদীতে এবং সবরকমের রেলপথ ও রাজপথে যাতায়াত করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সকল দেশকে দেওয়া হল। স্বাক্ষরকারী সব দেশ প্রতিশ্রুতি দেয় যে কঙ্গোকে যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ রাখা হবে। এছাড়া কঙ্গো নদীতে অবাধ নৌচালনের প্রতিরক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতক কমিশন গঠন করা হল।

অন্যদিকে কিন্তু নাইজার নদী সম্বন্ধে সম্মেলন সব দেশের অবাধ বাণিজ্য ও

নৌচালনের স্বাধীনতা স্বীকার করেই ক্ষান্ত হল। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোন আন্তর্জাতিক কমিশনের কথা বলা হয় নি। শুধু এই আশা প্রকাশ করা হল যে বৃটেন নাইজার নদীর মোহানা ও অববাহিকার দক্ষিণাংশে এবং ফ্রান্স উত্তরাংশে উল্লিখিত নীতি বাস্তবে রূপায়িত করবে। এছাড়া বের্লিন সম্মেলন থেকে আঞ্চলিক বিবাদেরও নিষ্পত্তি হল। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলনের সিদ্ধান্তাবলীর মধ্যে স্থান না দিয়ে একাধিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে এই মীমাংসাকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা হল।

এর ফলে আসোসিআসিওঁ প্রকারান্তরে সমগ্র কঙ্গো অববাহিকার ওপর অধিকার বিস্তার করতে পারল। তা ছাড়া কঙ্গোনদীর মোহানার উত্তরভাগও তার দখলে আসে।

ফ্রান্স অবশ্য কঙ্গোনদীর মোহানা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হল; কিন্তু তার পরিবর্তে সমুদ্র উপকূলের খানিকটা দূর থেকে শুরু করে কঙ্গো নদীর তীরে বরাবর রাজ্য বিস্তার করার অধিকার পেল।

পর্তুগালের অধিকারে আইন নদীর মোহানার উত্তরে কাবিন্দা এবং নদীর মোহানার দক্ষিণ কূল অবধি সমগ্র কঙ্গো অঞ্চল (বর্তমান আঙ্গোলা)।

সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত থেকে বৃটেন নাইজার নদীর ব-দ্বীপ ও মোহানায় তার দাবির স্বীকৃতি পেল। আর যদিও সে নিজে কঙ্গোর কোন এলাকার অধিকার পায় নি, তবু ফ্রান্সকে কঙ্গো থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়। আর কঙ্গোয় ফ্রান্সের অনুপ্রবেশে বাধাদান: এইটেই বোধহয় বৃটেনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

বের্লিন কংগ্রেস থেকে এমনি করে স্বাধীন কঙ্গো রাষ্ট্রের জন্ম হল যার প্রধান ছিলেন রাজা লেওপোল্ড। পরবর্তী দশ বছরে ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদের সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে বেলজিয়ান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা কোম্পানীর অগ্রগতিতে সমস্ত লেওপোল্ড কাতাঁগা (কঙ্গোর দক্ষিণ-পূর্ব অংশ) দখল করলেন। ১৮৯৮ সালে মাতাদি থেকে স্ট্যানলে পুল পর্যন্ত ২৫০ মাইল দীর্ঘ এক রেলপথ নির্মাণে কঙ্গোয় দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা নিকটতর হয়।

কিন্তু উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রগতি সত্ত্বেও লেওপোল্ডের শাসন কঙ্গোর অধিবাসীদের জীবনে চরম দুঃখকষ্ট ও অত্যাচার বয়ে এনেছে। বস্তুতঃ, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অমানুষিক শোষণের তুলনা পাওয়া ভার।

দাসব্যবসায় বন্ধ করার বহুঘোষিত প্রতিশ্রুতি কাজে পরিণত করায় লেওপোল্ডের খুব উৎসাহ দেখা যায় নি। আর যে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার নিয়ে এত আন্দোলন, এত আলোচনা চলে আসলে তা এক প্রহসনে পরিণত হয়। একথা অবশ্য স্বীকার্য যেসব বিদেশী কোম্পানী ইতিমধ্যে কঙ্গো-অববাহিকায় বাণিজ্য চালাচ্ছিল তাদের পক্ষে কোন অসুবিধা সৃষ্টি করা হয় নি। কিন্তু তথাকথিত "মুক্ত এলাকার" এক্তিয়ার কঙ্গো নদীর উভয় তীরে মাত্র কুড়ি কিলোমিটার অবধি বিস্তৃত হয় এবং অন্যত্র ব্যবসায়ীদের পণ্যাদি ক্রয় কিংবা একসঙ্গে একদিনের বেশী অবস্থান নিষিদ্ধ হল। এর ওপর কঙ্গো কর্তৃপক্ষ অনেক এলাকায় বণিক ও পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করে, এই যুক্তিতে যে এসব জায়গায় বিদ্রোহী কিংবা শত্রুভাবাপন্ন উপজাতির সক্রিয় আছে।

উল্লিখিত বিধিনিষেধ শুধু যে বণিক ও ব্যবসায়ীদের প্রতি প্রযোজ্য হল তা নয়। সরকারী আদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারকদেরও গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হল এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে তাদের প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের কোন অধিকার রইল না।

বের্লিন কংগ্রেস একচেটিয়া অধিকারদান নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু রাজা লেওপোল্ড স্বয়ং একচেটিয়া কর্তৃত্ব দাবি করলেন। এবং 'প্রখ্যাত' আইন-জীবীরা সমর্থন জানালেন: রাজার কোন একচেটিয়া অধিকার 'বিতরণে'র ক্ষমতা নেই কিন্তু তাঁর নিজের পক্ষে এ ধরনের অধিকার ভোগে কোন বাধা থাকার কথা নয়। অনুরূপভাবে যুক্তি দেওয়া হল: বাণিজ্যের সমান অধিকার যে কঙ্গো রাষ্ট্রের কিংবা রাজা লেওপোল্ডের সম্পত্তির ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হবে, এমন কথা স্পষ্ট করে বের্লিন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় নি।

এইভাবে স্বাধীন কঙ্গো রাষ্ট্রের শাসন চলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এর পর বেলজিয়ান আইনপরিষদ কঙ্গোর শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা বিভাজন

এক

অন্য অনেক অঞ্চলের মত দক্ষিণ আফ্রিকা আবিষ্কারও পর্তুগীজ নাবিকদের কৃতিত্ব। পঞ্চদশ শতকের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা ও উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভাস্কো ডা গামা জলপথে ভারতবর্ষে পৌছান। আশ্চর্যের বিষয়, পর্তুগীজ নাবিকেরা উত্তমাশা অন্তরীপের ভৌগোলিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে নি। তাই, এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পর্তুগাল কোন ঘাঁটি স্থাপন করে নি। পর্তুগীজ নাবিকদের পর ইওরোপের অন্য দেশের নাবিকেরাও জলপথে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলের সঙ্গে বাণিজ্যে নামে। ১৬৫২ সালে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এশিয়াগামী জাহাজে পানীয় জল এবং অন্যান্য রসদপত্র সরবরাহের জন্য উত্তমাশা অন্তরীপে একটি ছোট ঘাঁটি স্থাপন করল। এই উপনিবেশে কিছু কিছু ওলন্দাজ বসতি স্থাপন করে। কেউ কেউ বৃহদায়তন কৃষিক্ষেত্রের পত্তন করল, কেউ বা অনেক জমি নিয়ে পশুপালনে মন দিল। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ফরাসী প্রটেস্ট্যাণ্ট আশ্রয়প্রার্থীরা (য়ুগেনো) আসতে শুরু করে। লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেপ উপনিবেশের আয়তনও বাড়তে থাকে। স্থানীয় হটেনটট উপজাতির অনেকে ডাচ-অধিকৃত অঞ্চলে বসবাস করতে লাগল। বুশম্যানরা অবশ্য ডাচ অগ্রগতি প্রতিরোধের নিষ্ফল প্রচেষ্টা করে। এইভাবে প্রায় দেড় শ বছর ধরে ডাচ ও য়ুগেনো উপনিবেশিকরা পার্শ্ববর্তী আফ্রিকান এলাকায় অনুপ্রবেশ করে কেপ উপনিবেশের আয়তন বাড়িয়ে যায়।

তারপর আসে ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ান-বিরোধী যুদ্ধ। হল্যাণ্ড ফ্রান্সের দখলে গেল বলে বৃটেনের পক্ষে ডাচ উপনিবেশ হল আক্রমণের লক্ষ্য। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী উপনিবেশ দখল করল। ১৮০২ সালে আমিয়েন্সের চুক্তি অনুযায়ী অবশ্য কেপ উপনিবেশ প্রত্যাপৃত হল। কিন্তু আবার যুদ্ধ শুরু হবার পর ১৮০৬ সালে বৃটেন দ্বিতীয়বার কেপ উপনিবেশ দখল করল এবং নেপোলিয়ানের পতনের পর সেখানকার বৃটিশ অধিকার সার্বজনীন স্বীকৃতি পায়।

বুয়র (ডাচ ঔপনিবেশিক) ও বৃটনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার, যার রেশ এখনও চলছে, এই হল আরম্ভ। ঐতিহাসিক উডওয়ার্ডের মতে কেপ উপনিবেশের বিভিন্ন ইওরোপীয় জাতির সমন্বয় ও সংমিশ্রণের সম্ভাবনা কেপ দখল হওয়ার পর প্রথম বিশ বছরে যতটা ছিল ততটা আর কখনও দেখা যায় নি। এই সময়ে যদিও কেপ সমরকালীন সরকারের শাসনে থাকে। তবু ডাচদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অব্যাহত রাখা হয়: তাদের ভাষা, তাদের আইনকানুন তাদের সীমান্তরক্ষার সংগঠন ইত্যাদি। তাই এ সময় পর্যন্ত কেপ টাউন থেকে ১০০-২০০ মাইল দূরে ডাচ কৃষকের কাছে শাসক পরিবর্তনের তাৎপর্য খুব বেশী ছিল না।

কিন্তু ১৮২৫-২৮ সালের মধ্যে বুয়রদের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা অবসিত হয়। এর সঙ্গে ডাচ ভাষার বদলে ইংরেজীকে আদালতের ভাষা করা হল। কিন্তু আফ্রিকানদের প্রতি কী নীতি গ্রহণ করা হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতভেদ এই বিষয়েই দেখা দিল। বুয়র আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের জমি ছিনিয়ে নিয়েছে। পরিচিত পরিবেশ থেকে অনেক দূরে এক অর্ধজ্ঞাত মহাদেশের অভ্যন্তরে তারা নিজেদের হটেন্‌টট্‌-বুশম্যান প্রভৃতি উপজাতিদ্বারা পরিবৃত দেখেছে। সুতরাং ইওরোপীয় ও আফ্রিকানদের মধ্যে . মমতা তাদের কাছে অচিন্তনীয় ছিল।

কেপ উপনিবেশের ইংরেজ গভর্নর ১৮২৮ সালের ৫০তম অর্ডিন্যান্স জারী করে বুয়রদের স্বার্থে আঘাত হানলেন। এই অর্ডিন্যান্সের বলে: (১) আফ্রিকানরা ইওরোপীয়দের সঙ্গে আইনগত সমান অধিকার পেল। (২) বলপ্রয়োগে তাদের পরিশ্রম করানো বন্ধ হল। (৩) নতুন ব্যবস্থায় স্থির হয় যে অতঃপর দুর্ব্যবহারের অভিযোগে ইওরোপীয় মনিবের বিরুদ্ধে আফ্রিকান ভৃত্যের সাক্ষ্য আদালতে গৃহীত হবে। (৪) বুয়রদের আফ্রিকান ভৃত্যদের দৈহিক শাস্তিদান বেআইনী ঘোষিত হল।

এই অর্ডিন্যান্সের ন্যায্যতায় কোন সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করবে না। কিন্তু বুয়রদের অনেকে ভাবল যে ইংরেজ শাসক আফ্রিকানদের শুভ কামনায় উদ্‌বুদ্ধ না হয়ে বুয়রদের ধ্বংস• কামনায় এমন অর্ডিন্যান্স জারী করে।

ইংরেজরা যে বুয়রদের চেয়ে বেশী মানবপ্রেমিক ছিল, সে কথা ভাবা ভুল। কারণ আফ্রিকার অন্য অঞ্চলে যেখানে ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা বসতি

করেছিল এবং যেখানে তাদের আফ্রিকান শ্রমের ওপর নির্ভর করতে হয়, সেখানে নানাভাবে ইওরোপীয় মনিবদের জন্য আফ্রিকানদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ শাসকদের মনোভাব বোধহয় খানিকটা এই রকম ছিল: পরোপকার করা মন্দ কি, যদি সেটা অন্যের ওপর দিয়ে যায়?

সে যাই হোক, সরকারের আগেই ইংরেজ মিশনারীরা বুয়র বিরোধী অভিযানে নেমেছিলেন। আফ্রিকানদের প্রতি বুয়রদের দুর্ব্যবহারের কথা এঁরা ইংল্যাণ্ডে জনসমক্ষে তুলে ধরেন। মিশনারীদের আদর্শবাদ (প্রতিপক্ষের ভাষায় বুয়রদের প্রয়োজন উপলব্ধি করার ব্যর্থতা) বুয়রদের আরো বেশী উত্যক্ত করল।

এরপর এল ১৮৩৩ সালের আইন যার মারফত সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যে দাসপ্রথা (দাসব্যবসায় আগেই ১৮০৭ সালে বে-আইনী করা হয়েছে) রহিত করা হল। এর ফলে বুয়রদের শ্রমিক সংগ্রহের সমস্যা তীব্রতর হয়ে ওঠে। তার ওপর, মালিকদের যে পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তাতে অনেকেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

এতক্ষণ যেসব কথা বলা হল সেগুলি দক্ষিণ আফ্রিকায় ইওরোপীয় উপনিবেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কিন্তু পূর্বোক্ত বিষয় ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় ইওরোপীয় বসতির অস্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করেছে ইওরোপীয়দের সামরিক প্রভুত্বের ওপর। বুয়র ঔপনিবেশিকরা এক একটা যুদ্ধে জয়ী হয়েছে এবং বুয়র উপনিবেশের সীমান্ত একটু একটু করে এগিয়ে গেছে। বুয়রদের অভিজ্ঞতা বলে শত্রুকে বাইরে না রেখে নিজ রাজ্যের অধীনে রাখা ভাল, কারণ সে ক্ষেত্রে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ সহজতর হয়। ১৮৩৪ সালে গ্রেট ফিশ নদী ছিল কেপ উপনিবেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত। সেই বছরে কাফির উপজাতির সঙ্গে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। পরের বছর কাফিররা পারস্ত হল এবং কাফির উপজাতি বৃটিশ প্রজা হিসাবে কেপ উপনিবেশে বসবাস করবে এবং তৎফলে তাদের ওপর নজর রাখা সহজ হবে, ইওরোপীয় উপনিবেশের সীমানা আরো ৭০ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে কাই নদী পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় বুয়র ও ইংরেজ উভয় সম্প্রদায়ের সমর্থন ছিল, এমন কি কেপ গভর্নর ড্যুরবাঁরও। কিন্তু বৃটিশ সরকার এতে আপত্তি জানাল এবং কেপ উপনিবেশের সীমানা আবার গ্রেট ফিশ নদীতে সরিয়ে আনা হল।

এইসব কারণে বিরক্ত হয়ে হাজার হাজার বুয়র তাদের জমিজমা ছেড়ে স্ত্রী পুত্র পরিবার এবং অস্থাবর সম্পত্তিসহ মহাদেশের অভ্যন্তরে নতুন বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। ইতিহাসে এই দেশান্তরযাত্রা 'দি গ্রেট ট্রেক' বা মহাভিনিষ্ক্রমণ নামে আখ্যাত হয়েছে।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে শুরু হয়ে মহাভিনিষ্ক্রমণ কয়েক বছর ধরে চলে। প্রথম দিকের অভিযাত্রীদল কেপ উপনিবেশ থেকে যাত্রা করে অরেঞ্জ নদীর পরপারে নতুন বসতি স্থাপন করল। পরে এই এলাকা অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট নামে পরিচিত হল। অন্য একদল ভাল নদী পেরিয়ে মাতাবেলে উপজাতিকে পরাস্ত ও ছত্রভঙ্গ করে ট্রান্সভাল উপনিবেশের পতন করল। ১৮৩৭ সালে পী. রেতীফ নামধেয় এক বুয়রের নেতৃত্বে অন্য এক অভিযাত্রীদল নাটালে পৌছোয়। নাটাল তখন জুলুদের অধিকারে। ১৮৩৮ সালের গোড়ার দিকে রেতীফ এবং এবং তাঁর সহকর্মী জুলুরাজ দিনগানের নির্দেশে নৃশংসভাবে নিহত হন। অবশ্য সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে ব্লাড নদীর যুদ্ধে বুয়রেরা জুলুদের চূড়ান্তরূপে পরাস্ত এবং পীতারমারিৎজবুর্গকে রাজধানী করে এক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করল।

মহাভিনিষ্ক্রমণ থেকে এইভাবে তিন নতুন রাষ্ট্রের স্থাপনা হল নাটাল, অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট এবং ট্রান্সভাল। অর্থাৎ আফ্রিকার অভ্যন্তরে ইউরোপীয় অধিকার আরও বিস্তৃত হয়। এর ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকান উপজাতিদের পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব বলে আর কিছু রইল না। এই প্রক্রিয়ায় বহু আফ্রিকান তাদের জমি হারিয়ে ইউরোপীয় অর্থনীতিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। সংখ্যায় অনেকগুণ বেশী এই সব আফ্রিকানদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে বুয়ররা বর্ণ-বৈষম্য নীতি গ্রহণ করে। যার এক চরম প্রকাশ আজকের 'আপার্থাইড' নীতি। অন্যদিকে মহাভিনিষ্ক্রমণ দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপীয় ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করল। একদিকে রইল বৃটিশ শাসিত কেপ উপনিবেশ ও নাটাল (১৮৪৩ সালে বৃটেন নাটাল অধিকার করে), অন্যদিকে বুয়র প্রজাতন্ত্রদ্বয়, অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট ও ট্রান্সভাল। ১৮০৬ সালের পর থেকে কেপ উপনিবেশের শাসন বৃটেনের দায়িত্ব হলেও সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল বুয়র। কিন্তু মহাভিনিষ্ক্রমণের ফলে মোট বুয়র অধিবাসীর প্রায় এক চতুর্থাংশ কেপ পরিত্যাগ করল। তার ফলে কেপ উপনিবেশে বৃটিশ আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানের জয়যাত্রার বাধা অনেক কমে

যায়। পরে যখন সেখানে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের প্রবর্তন হল (১৮৫৩) তখন সব জাতির মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করার অধিকার পায়। অন্যদিকে ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও ইউরোপীয় ছাড়া অন্য বাসিন্দারা সেখানকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের মধ্যে দু'টি বিপরীতমুখী স্রোতের জন্ম হয়: একটি রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এবং অনেক কম পরিমাণে বর্ণবিভেদে বিশ্বাসী; আর অন্যটি প্রজাতান্ত্রিক এবং বর্ণবৈষম্যের সমর্থক। আজকের দক্ষিণ আফ্রিকায় ন্যাশনালিস্ট দল দ্বিতীয় ধারার বাহক এবং প্রথম ধারার প্রতিভূ হিসাবে নাম করা যায় ইউনাইটেড পার্টি, লেবার পার্টি এবং ফেডারেল পার্টির।

বলা বাহুল্য ওপরে যে দ্বিতীয় ধারার উল্লেখ করা হয়েছে সেটি মোটামুটি বুয়রদেরই প্রতিনিধিত্ব করত। মহাভিনিষ্ক্রমণের ফলে তাদের যে দুটি প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয় সেগুলো ভৌগোলিকভাবে বাইরের জগৎ থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় উদারনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাব 'জনতা থেকে দূরে' বুয়রদের ওপর পড়ে নি। তাই এই ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা বুয়রদের জাত্যভিমান প্রকটতর করে।

দুই

আগেই বলা হয়েছে নাটালে বুয়র অভিযাত্রীদল ১৮৩৮ সালে এক প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেছিল। কিন্তু এই প্রজাতন্ত্র মাত্র পাঁচ বছর স্থায়ী হয়। সে সব বৃটিশ ঔপনিবেশিক মহাভিনিষ্ক্রমণের আগেই ডারবানে (পোর্ট নাটাল) বসতি করেছিল তাদের সঙ্গে বুয়রদের সংঘাত শুরু হতে বিলম্ব হয় নি। বৃটিশ ঔপনিবেশিকরা তখন বৃটেনের সাহায্য চেয়ে পাঠায়। ১৮৪৩ সালে কেপ উপনিবেশ থেকে বৃটিশ সেনাদল এসে নাটাল দখল করে। বৃটেন চেয়েছিল নাটাল বুয়রদের নাটালেই রাখতে। কিন্তু ১৮৪৮ সালে অধিকাংশ বুয়র নাটাল ত্যাগ করে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট ও ট্রান্সভালে চলে যায়। তখন স্যর হ্যারী স্মিথ অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট অধিকার করলেন। নাটাল-বুয়রেরা অরেঞ্জে বৃটিশ অগ্রগতি রোধ করতে না পেরে ট্রান্সভালে প্রস্থান করল।

এই সময় বৃটিশ নীতির পরিবর্তন বুয়বদের রাজ্য দখল করার প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে। বৃটেন হয় ১৮৫২ সালের স্যাণ্ড নদী চুক্তির মারফত ট্রান্স-

ভালের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয় এই সর্তে যে সেখানে দাসপ্রথা উচ্ছেদ করা হবে। এর দু'বছর বাদে ব্লুমফনটেইন চুক্তিতে (১৮৫৪) অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটেরও স্বাধীনতা স্বীকার করা হল।

কিন্তু বুয়রদের এই স্বাধীনতা পঞ্চাশ বছরও টেঁকে নি। ১৮৬৭ সালে অরেঞ্জ ও ভাল নদীর সংযোগের কাছাকাছি হীরার খনি আবিষ্কৃত হয়। তার পনের বছর বাদে ট্রান্সভালে সোনার আবিষ্কার। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে এই আবিষ্কারের তাৎপর্য সুগভীর।

প্রথমতঃ সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনৈতিক প্রগতির পক্ষে হীরক ও স্বর্ণ হল মস্ত বড় সহায়ক। এর ফলে সরকারের রাজস্ব, আমদানী-রপ্তানী, এবং নতুন রেলপথ নির্মাণে কেপ টাউন ও ডারবান বন্দরের কর্মতৎপরতাও বহু গুণে বৃদ্ধি পেল।

সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে বিদায় নিল পুরোনো দিনের শান্ত সমাহিত জীবন। মহাভিনিষ্ক্রমণের ফলে কৃষি ও পশুপালন নির্ভর অর্থনীতি দক্ষিণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করেছিল স্বর্ণ ও হীরক আবিষ্কারে এল শিল্পবিপ্লব।

বুয়রদের দুর্ভাগ্যগশতঃ ট্রান্সভালের বেশীর ভাগ হীরক খনির মালিক ছিল বৃটিশ প্রজা। তার একটা তাৎপর্য এই যে, ট্রান্সভাল কেপ উপনিবেশের সঙ্গে অন্ততঃ অর্থ নৈতিক বন্ধনে আবার যুক্ত হল। ট্রান্সভালের রাজনৈতিক দুর্যোগ তার অন্য পরিণাম। ১৮৭৬-৭৭ সালে ট্রান্সভালের বুয়ররা স্থানীয় আফ্রিকানদের সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার জন্যে করের বোঝা বাড়ানো হল। এবং এর অর্থ নৈতিক ফল এত সাংঘাতিক হয় যে সারা দেশ বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলেই মনে হয়েছিল। আফ্রিকানদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিবাদের জুলু উপজাতি ট্রান্সভাল আক্রমণের ভয় দেখাল। এমন সময় শেপস্টোন বলে নাটাল সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে ট্রান্সভালে পাঠানো হয়। শেপস্টোন একরকম বিনাবাধায় ট্রান্সভালে বৃটেনের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করলেন।

ট্রান্সভাল দখল করার সময় যথাশীঘ্র সম্ভব তাকে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হল না। ১৮৭৭ সালে বুয়ররা জুলুদের আক্রমণের আশঙ্কায় বৃটিশ আক্রমণে বাধা দেয় নি। কিন্তু ১৮৭৯ সালে বৃটিশ সৈন্য জুলুদের সামরিক শক্তি ধ্বংস করে। পরের বছর ডিসেম্বর মাসে বুয়ররা স্বাধীনতা ঘোষণা করল। সামান্য যুদ্ধের পর ১৮৮১ সালের

প্রিটোরিয়া চুক্তি বলে ট্রান্সভালের স্বাধীনতা স্বীকৃত হল, যদিও তাদের বৈদেশিক ও আফ্রিকান নীতি বৃটেন নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে এবং একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট প্রিটোরিয়ায় থাকবে, এই শর্ত বুয়ররা মেনে নিল।

তিন বছর বাদে লণ্ডন চুক্তি (১৮৮৪) মারফত বৃটেন ট্রান্সভালের আফ্রিকান নীতি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার ত্যাগ করে। ট্রান্সভাল সরকার অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের সঙ্গে চুক্তি করার অধিকারও পায়। কিন্তু ট্রান্সভালের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যান্য দিকে বৃটেনের কর্তৃত্ব বজায় রইল। ততদিনে জার্মানী আফ্রিকার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে। ট্রান্সভালের সঙ্গে জার্মানীর আঁতাতের সম্ভাবনা ছিল বৃটেনের অনভিপ্রেত।

ইতিমধ্যে ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটে সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তার ফল স্বরূপ দলে দলে ভিনদেশী ইওরোপীয় বণিক এই দুই রাজ্যে ভিড় করেছে। এদের মধ্যে অবশ্য বেশীর ভাগই ছিল ইংরেজ। কিছুদিন বাদে দেখা গেল এইসব বিদেশীরা (বুয়রদের ভাষায় 'আউইৎলান্দার') সংখ্যায় ট্রান্সভালের 'বিশুদ্ধ' বুয়রদের ছাড়িয়ে গেছে। এদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা অথচ রাজনৈতিক ক্ষমতা বুয়রদের একচেটিয়া অধিকারে। এরকম অবস্থা বেশীদিন চলা অসম্ভব অতঃপর এই 'আউইৎলান্দার' বুয়র বিরোধ প্রকাশ্যে ফেটে পড়ল কয়েকটি প্রশ্নে।

প্রথম বিবাদটি রেলপথ সম্পর্কিত। এতদিন পর্যন্ত ট্রান্সভালের বহির্গমনের পথ ছিল কেপটাউন ও ডারবান বন্দর। এই নির্ভরশীলতা থেকে অব্যাহতিই ট্রান্সভালের রাষ্ট্রপতি ক্রুগার চাইছিলেন। সোনার খনি আবিষ্কারের পর এই আশা কার্যকরী করার উপায় মেলে। ক্রুগারের আনুকূল্যে হল্যাণ্ডে নতুন এক কোম্পানী জন্ম নিল: দি নেদারল্যাণ্ড্স সাউথ আফ্রিকান রেলওয়ে কোম্পানী। এর শেয়ার কিনল হল্যাণ্ড, ট্রান্সগুলি ও জার্মানী। ট্রান্সভালের সঙ্গে অন্য দেশের রেলপথে যোগাযোগ স্থাপন করার একচেটিয়া অধিকার এই কোম্পানীকে। দেওয়া হল। ইংরেজ বণিকেরা দেখলেন ক্রুগার কেপ ও নাটাল রেলওয়েকে কোণঠাসা করার জন্য এই নয়া কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। আর ইংরেজ রাজনৈতিক নেতারা সোদ্বেগে লক্ষ্য করলেন যে দি নেদারল্যাণ্ড্স সাউথ আফ্রিকান রেলওয়ে কোম্পানীতে ট্রান্সভালের চেয়ে জার্মানীর শেয়ার বেশী।

অন্য ক্ষেত্রেও ক্রুগার ওলন্দাজ ও জার্মানদের একচেটিয়া অধিকার দিতে

থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ ডায়নামাইট ব্যবসায়ের উল্লেখ করা যায় ডায়নামাইট হল খনির কাজে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ক্রুগার ডায়নামাইট সরবরাহের একচেটিয়া অধিকার একটি প্রতিষ্ঠানকে দিলেন। ফলে ডায়নামাইটের দাম তিনগুণ বেড়ে যায়। খনিগুলোর ডায়নামাইট খাতে খরচ বেড়ে গেল প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার মতো।

সরকারী করনীতিও খুব স্পষ্টভাবে বিদেশী বণিকদের আঘাত করে। এমনভাবে কর বসানো হল যে তার আসল বোঝা গিয়ে পড়ল 'আউইৎ-লান্দার'দের ওপর। এদের হিসাব মত সরকারী রাজস্বের শতকরা ৯০ ভাগ এরাই দিত।

এতখানি রাজস্ব দেবার পর 'আউইৎলান্দার'রা স্বভাবতঃই আশা করত খনি অঞ্চলে রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতাল, জলের ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ ক্রুগার সরকার ভালভাবে করবে। কিন্তু ক্রুগার এবং ট্রান্সভালের আইন পরিষদ 'ফোল্কসরাদ'-এর অভিমত ছিল, খনি অঞ্চলে লোকবসতি হবে অস্থায়ী। কারণ একবার সোনা ফুরিয়ে গেলে বিদেশীরাও বিদায় নেবেন। অতএব ওসব জায়গায় সরকারী অর্থ উল্লিখিত উদ্দেশ্যে ব্যয় করা অনুচিত।

সবচেয়ে গুরুতর মতভেদ ঘটল নাগরিকত্ব অর্জন বিষয়ে। আগে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের মত ট্রান্সভালেও নাগরিকত্ব অর্জন সহজ ছিল। অধিক সংখ্যায় বিদেশীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকারের আইন পরিবর্তিত হয়। নতুন ব্যবস্থায় একজন বিদেশী ১৪ বছর ট্রান্সভালে থাকার পর এবং তার পূর্ব নাগরিকত্ব বর্জনের ১২ বছর বাদে নাগরিকত্ব দাবি করতে পারে। এবং সেক্ষেত্রেও সে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। 'আউইৎলান্দার'দের আশা ছিল রাজনৈতিক অধিকার পেলে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের চেষ্টা করবে। কিন্তু নতুন আইনের ফলে তাদের সে আশা ব্যাহত হল।

অ-বুয়রদের অভিযোগ মোচনের চেষ্টা ক্রুগার সরকার করে নি। তাদের বক্তব্য ছিল, বুয়ররা তাদের রক্ত দিয়ে ট্রান্সভালের পত্তন করেছে। অতএব, এমন কিছু করা হবে না (অবশ্যই 'আউইৎলান্দার'দের ভোটাধিকার দান তার মধ্যে পড়ে) যাতে ট্রান্সভালে বুয়র আধিপত্য নষ্ট হয়। বিদেশী বণিকেরা রাজস্বের ৮ ভাগ দিচ্ছে এ কথায় ক্রুগার বললেন, যদি তাদের এ ব্যবস্থা পছন্দ না হয়, তবে তারা ট্রান্সভাল ত্যাগ করতে পারে।

যেহেতু বড় বড় মাইনিং কোম্পানী করের গুরুভার সত্ত্বেও ট্রান্সভাল ছেড়ে চলে যায় নি, সেহেতু আমরা ধরে নিতে পারি যে তাদের সমস্ত মুনাফায় হাত পড়ে নি। কিন্তু ধনী বিদেশীদের বাদ দিলেও ট্রান্সভালে হাজার হাজার সাধারণ বিত্ত ভিনদেশী ছিল যাদের অভাব-অভিযোগের সত্যতা ছিল অনেকখানি। এরাই ট্রান্সভাল ন্যাশনাল ইউনিয়ন গঠন করে এবং দাবিদাওয়া না মিটলে বিদ্রোহের আয়োজন শুরু হয়। এ আয়োজনে কেপ উপনিবেশের ইংরেজ নেতা রোড্‌সের হাত ছিল। ঐতিহাসিক কেপেল-জোনসের ভাষায়, "উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এমন একটা যুগ নয় যখন কোন দেশের $\frac{১}{২}$ অধিবাসী (এ হিসাব থেকে আফ্রিকানরা বাদ পড়ে, কারণ তাদের কথা কেউ ধরত না) যারা দেশের $\frac{৯}{১০}$ ভাগ কর দেয় এবং যাদের হাতে $\frac{১}{২}$ জমি, অনির্দিষ্ট কালের জন্য পরাধীন হয়ে থাকবে।"

এইখানে রোডস্‌ ও তাঁর মতাদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ, আফ্রিকার দক্ষিণাংশে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যক্তি হিসাবে রোড্‌সের অবদান বোধ হয় সবচেয়ে বেশী। ১৮৭০ সালে রোড্‌স দক্ষিণ আফ্রিকায় আসেন। তার কিছু আগে কিম্বার্লেতে হীরক খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্য অনেকের মত রোড্‌সও খনির ব্যবসায়ে নেমে পড়লেন এবং প্রচুর অর্থ লাভ করলেন। কিন্তু রোড্‌সের কাছে রাজনীতি ও অর্থনীতি একই জিনিসের এপিঠ আর ওপিঠ মাত্র। স্বভাবত রাজনীতিতে তিনি মনোযোগ না দিয়ে পারেন নি। ইংল্যাণ্ডের বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক মহলকে তিনি হাতে রাখতেন। নিজের মত প্রচারের জন্য তিনি খবরের কাগজ পর্যন্ত কিনে ফেলেন। তাঁর মত আর কিছু না: আফ্রিকায় তথা অন্যত্র ইংরেজের উচিত আক্রমণাত্মক কর্মসূচীর ভিত্তিতে যত দ্রুত ও ব্যাপক হারে সম্ভব সাম্রাজ্য বিস্তার। রোড্‌স বলতেন তাঁর পরিকল্পনা "দেশ" নয় "মহাদেশ" জয়ের। আফ্রিকায় এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপ হল কেপ থেকে কায়রো পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন বৃটিশ অধিকার। এবং এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্যই রোড্‌স বেচুয়ানাল্যাণ্ড ও আরো উত্তরে পরবর্তীকালে তাঁরই নামাভিষিক্ত রোডেসিয়া অধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। রোড্‌স ও তাঁর বন্ধুদের উদ্যোগে এ সব দেশে বৃটেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হল।

এহেন রোডস্‌ ট্রান্সভালস্থ 'আউইৎলান্দার'দের সঙ্গে মিলে চক্রান্ত করেন, জোহানেসবার্গে বিদ্রোহ শুরু হবে এবং জেম্‌সন নামধেয় এক ইংরেজ

সেনাপতি রোডেসিয়া ও বেচুয়ানাল্যাণ্ড (এ দুটিই তখন বৃটিশ অধীনস্থ দেশ) থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ট্রান্সভাল আক্রমণ করবেন। ক্রুগার সরকারের উচ্ছেদে ষড়যন্ত্রকারী সকলেরই মতৈক্য ছিল। কিন্তু অতঃ কিম? ট্রান্সভাল সরকারের সংস্কার সাধন এবং এর স্বাধীনতাও অক্ষুণ্ণ রাখা, এটাই 'আউইৎ-লান্দার'-নেতাদের কাম্য ছিল। পক্ষান্তরে রোড্স ও জেম্সন চাইলেন ট্রান্সভালকে বৃটেনের কুক্ষিগত করতে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, ষড়যন্ত্রের কথা গোপন থাকেনি। রাষ্ট্রপতি ক্রুগার জেনারেল ক্রোনজেকে জেম্সনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পাঠালেন। অন্যদিকে ট্রান্সভালের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় জোহানেসবার্গের নেতারা রোড্সকে বলে পাঠালেন, বিদ্রোহ আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। অভিযান বন্ধ করার জন্য রোড্স জেম্সনকে খবর দিলেন। কিন্তু সে খবর জেম্সনের কাছে পৌঁছোয় নি। ১৮৯৫ সালের ২৯শে ডিসেম্বর জেম্সন ট্রান্সভাল অভিযান শুরু করলেন। বলা বাহুল্য, বুয়র সৈন্য জেম্সনের জন্য প্রস্তুত ছিল: সামান্য যুদ্ধের পর জেম্সন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন।

জেম্সন-আক্রমণে ক্রুগারের বৃটেন সম্বন্ধে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। এবং এই জানার সুযোগ নিয়ে আবার নতুন করে 'আউইৎভলান্দার'দের সব দাবি-দাওয়া অগ্রাহ্য করলেন। সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র অধিবাসীরা (অর্থাৎ কেপ, নাটাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট সহ) ট্রান্সভাল ও ক্রুগারের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল। ইউরোপেও, বিশেষ করে জার্মানীতে ক্রুগারএর পক্ষে সহানুভূতি ও সমর্থনের অভাব হল না। এর ফলে একদিকে যেমন ইঙ্গ-জার্মান সম্পর্ক বিষিয়ে উঠল, অন্যদিকে রাষ্ট্রপতিপদে ক্রুগারের পুনর্নির্বাচন একরকম নিশ্চিত হয়। কেপ প্রদেশের ইংরেজ মহল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত রাজ্য নিয়ে যে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা চলছিল (এবং যাতে বুয়রদের কিছু অংশের সমর্থন ছিল) শান্তিপূর্ণ উপায়ে তার সফলতার আশা চিরতরে দূরীভূত হল। রোড্স কেপ প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। আর যার জন্যে এত কোলাহল সেই 'আউইৎলান্দার'দের অবস্থা মন্দ বই ভাল হল না। সব মিলিয়ে জেম্সন অভিযান দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র-বৃটেন অন্তিম সংঘর্ষ দ্রুততর করল।

১৮৯৫ সালের জেম্সনকৃত আক্রমণের পর ৪ বছরও যায় নি: ১৮৯৯ সালে ইঙ্গ-বুয়র যুদ্ধ শুরু হল, ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়। জেম্সন অভিযানের

মূলে যে কারণ ছিল সেটা (অর্থাৎ অবুয়রদের অভিযোগ) তখনও পুরোমাত্রায় বজায় ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয় ট্রান্সভাল ও বৃটেনের পারস্পরিক সন্দেহ। এবং একথা বোধহয় বলে রাখা ভাল যে এক্ষেত্রে বৃটেন তথা কেপ প্রদেশের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা অনেক বেশী মারমুখী ছিল। জেম্‌সন ও তাঁর সহ-যোগীদের (যারা বুয়রদের হাতে বন্দী হয়েছিল) ক্রুগার মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতেন। তার বদলে তাদের বৃটেনের কাছে সমর্পণ করা হল। জেম্‌সনকে যেটুকু লঘু শাস্তি দেওয়া হয় তাও তিনি পুরোপুরি ভোগ করেন নি। বৃটেনে তখন জঙ্গী সমরবাদের হাওয়া বইছে। জেম্‌সন ও রোড্‌স যখন ইংল্যাণ্ডে ফেরেন, তখন বৃটিশ জনসাধারণ তাঁদের সোৎসাহ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। এ সবই বুয়রদের বৃটেনের মতিগতি সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত করল। পরের বছর অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট বিপদের আশঙ্কায় ট্রান্সভালের সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকে। এবং ক্রুগার স্বর্ণশিল্পের রাজস্ব দিয়ে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রসজ্জা আরম্ভ করলেন। দুই পক্ষই রোমে, যুদ্ধ অনিবার্য। এমন অবস্থায় জনৈক 'আউইৎলান্দারে'র হত্যাকে উপলক্ষ করে ট্রান্সভালের ইংরেজ প্রজারা রাণীর কাছে এক গণদরখাস্ত পাঠায়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে অবুয়রদের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হল, কিন্তু দুই পক্ষ কোন মীমাংসায় পৌছোয় না। বৃটেন দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য পাঠাবার আদেশ দেয়। ক্রুগার ঘোষণা করলেন এ আদেশ প্রত্যাহৃত না হলে যুদ্ধ শুরু হবে। আদেশ বলবৎ রইল, সুতরাং যুদ্ধও বাধলো।

বৃটিশ সামরিক বলের সঙ্গে বুয়রদের কোন তুলনা হয় না। সুতরাং ৮ মাসের মধ্যে ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের সব কটি উল্লেখযোগ্য শহর বৃটিশ বাহিনী দখল করল ও ভগ্নমনোরথ ক্রুগার ইওরোপ যাত্রা করলেন। যুদ্ধ কিন্তু তখনও থামে নি। প্রায় দু'বছর ধরে বুয়ররা গেরিলা যুদ্ধ চালায়। বৃটিশ সেনাপতি লর্ড কিচেনার বুয়র যোদ্ধাদের সরবরাহ বন্ধ করার জন্য চাষীদের কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য কেড়ে নিলেন এবং বুয়র অধিবাসীদের বন্দী শিবিরে পোরা হল। ১৯০২ সালে বুয়র সেনাপতিরা আত্মসমর্পণ করলেন। যত শীঘ্র সম্ভব দায়িত্বশীল সরকার স্থাপন এবং বুয়রদের বেসামরিক জীবনের পুন-গঠনের জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রতিশ্রুতি বৃটিশ সরকার দেয়।

১৯০৭ সালে ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটকে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর ফল এই দু'টি দেশ নাটাল ও কেপ প্রদেশের

সমপর্যায়ে আসে। ১৯০৮ সালে এই চার প্রদেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে একটি ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত নিলে, পরের বছর বৃটিশ পার্লামেন্টের এক আইন দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের ভিত্তি রচনা করে। ১৯১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের জন্ম হয়।

তিন

পূর্ব আফ্রিকা বিভাজনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: এখানে শুধুমাত্র ইউরোপীয় শক্তিরা সক্রিয় ছিল না, এদের সঙ্গে ওমান আরবেরা, স্বাধীন হবার পরে জাঞ্জিবার এবং তুরস্ক পূর্ব আফ্রিকার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছে। আফ্রিকার অন্য অঞ্চলের মত এখানে ও ইওরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগীজরা সর্বপ্রথম পদার্পণ করে। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে পর্তুগাল স্বর্ণরপ্তানিকারী বন্দর সোফালা দখল করে এবং পরের পাঁচ বছরের মধ্যে সমগ্র পূর্ব আফ্রিকান উপকূলের ভাগ্যবিধাতা হয়। প্রায় দু' শতাব্দী ধরে পর্তুগাল পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে তার আধিপত্য বজায় রাখে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে ওমান আরবেরা পর্তুগীজ প্রভূত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে ও ১৬৯৮ সালে দেলগাজো অন্তরীপের উত্তরস্থ উপকূলাংশ থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়নে সক্ষম হয়। পর্তুগাল অবশ্য হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। কিন্তু ১৭৩০ সালে যখন আরবেরা মোম্বাসা দখল করল, তখন বোঝা গেল পর্তুগালের আর কোন আশা নেই। ১৭৫২ সালে পর্তুগাল মস্কটের ইমামকে জাঞ্জিবার অন্তরীপ তাদের পূর্ব আফ্রিকান উপনিবেশের উত্তর সীমান্ত বলে মেনে নেয়।

ওমানের সুলতান সঈদ সেদ (১৮০৪-১৮৫৬) পূর্ব আফ্রিকান উপকূলে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে এনে জাঞ্জিবারে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সেদের মৃত্যুর পর জাঞ্জিবার ওমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। সেদের পুত্র মজিদের মৃত্যু হয় ১৮৭০ সালে। তখন সেদের আর এক পুত্র বারঘাস (১৮৭০-১৮৮৮) জাঞ্জিবারের সুলতান হলেন। বারঘাসের রাজত্বকালেই পূর্ব আফ্রিকা বিভাজন পুরোমাত্রায় আরম্ভ হল।

১৮৭৫ সালে পূর্ব আফ্রিকার উপকূল ছিল জাঞ্জিবারের সুলতানের হাতে। সুলতান অবশ্য উপকূলের অভ্যন্তরেও (এমন কি হ্রদ অঞ্চল পর্যন্ত) নিজের অধিকার দাবি করতেন এবং একথা সত্য যে আরব দাসব্যবসায়ীরা (যাদের

অনেকে সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করত) হ্রদ অঞ্চল পর্যন্ত যাতায়াত করত। জাঞ্জিবারের রাজসভায় ইওরোপীয় দূত ও প্রতিনিধিদের আনাগোনা ছিলে। ১৮৭৬ সালে সুলতান বারঘাস জাঞ্জিবারস্থ বৃটিশ কনসাল স্যর জন কার্কের প্রভাবে পড়ে তাঁর রাজ্যে দাসব্যবসায় রহিত করেন। সাধারণভাবে রাজ্যশাসনে ও কার্ক সুলতানকে পরামর্শ দিতেন। এবং মোটামুটি বলা যায়, সুলতান ক্রমশঃ বৃটিশ প্রভাবের অধীন হয়ে পড়ছিলেন।

এসময়ই ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে জার্মানীর আবির্ভাব। ডক্টর কার্ল পেটার্স ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের কথা আগে বলা হয়েছে। ১৮৮৪ সালে পেটার্স ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু বৃটিশ বণিকের ছদ্মবেশে জাঞ্জিবারে এসে উপস্থিত হন। সেখান থেকে পেটার্স সদলবলে পূর্ব আফ্রিকার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করেন এবং খুব অল্প কালের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের আফ্রিকান সর্দারদের সঙ্গে প্রায় এক ডজন চুক্তি স্বাক্ষর করে ফিরে আসেন। বলা বাহুল্য এই সব চুক্তির ভিত্তিতে উপজাতীয় প্রধানেরা নিজেদের এলাকা পেটার্সের সংগঠনের রক্ষণাধীনে স্থাপন করেছেন এমন দাবি করা হয়। বের্লিনে ফিরে কার্ল পেটার্স বিসমার্কের সমর্থন প্রার্থনা করলেন। প্রাথমিক কিছুটা অনিচ্ছা দেখিয়ে জার্মান সরকার ১৮৮৫ সালে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল "আশ্রিত" এলাকা বলে ঘোষণা করে।

জাঞ্জিবারের সুলতান স্বভাবতঃ জার্মানীর কাছে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, যেসব উপজাতি প্রধান জার্মানীর 'আশ্রয়' চেয়েছে তাদের এমন কোন অধিকার নেই, কারণ তারা তাঁর অধীন। সুলতান এবং স্যর জন কার্ক আশা করেছিলেন, বৃটেন জাঞ্জিবারের এই বিপদে তার পাশে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু বৃটেন নিজেই তখন নানা বিপদের সম্মুখীন। সুদানে জেনারেল গর্ডন মাহদী পন্থীদের হাতে নিহত হয়েছেন, মিসরে ফ্রান্সের সঙ্গে সম্বন্ধ এত বিষিয়ে উঠেছে যে যুদ্ধ লাগার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং ভারতসীমান্তে রুশ সেনাদল আফগানিস্থানে হানা দেওয়ার উপক্রম করছে। অতএব পূর্ব আফ্রিকার গুরুত্বহীন ছোট্ট এক এলাকার জন্য বৃটেন জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায় নি।

ফল হল এই বিসমার্ক কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ এবং একটি চরমপত্র জাঞ্জিবারে পাঠালেন। আর জার্মানীর দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া হতভাগ্য সুলতানের কোন উপায় রইল না।

জার্মানীর দাবি এবং সুলতানের আপত্তি থেকে একটা প্রশ্ন সবার সামনে আসে মূল আফ্রিকা ভূখণ্ডে সুলতানের রাজ্যসীমা কতদূর। এই বিষয়ে এক কমিশন বসাতে বৃটিশ সরকার বিসমার্ককে রাজী করায়। কমিশনটি গঠিত হল বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর প্রতিনিধি নিয়ে (অর্থাৎ জাঞ্জিবারকে এ কমিশন থেকে সযত্নে বাদ দেওয়া হল)। এ-কমিশনের আলোচনায় জার্মান প্রতিনিধি সুলতানের এলাকা যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করে দেখাবার প্রয়াস পেলেন। এমন কি তাঁর মতে উপকূলের কোন কোন অঞ্চলে সুলতানের কোন দাবিই থাকতে পারে না। বৃটিশ ও ফরাসী প্রতিনিধিরা বললেন যে সুলতানের আইন উপকূলের চল্লিশ মাইল অভ্যন্তরে পর্যন্ত বলবৎ হয়। ১৮৮৬ সালের মাঝামাঝি কমিশনের কাজ গুটিয়ে ফেলা হয়। এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল শুধু এইমাত্র যে জাঞ্জিবার ও পেম্বা দ্বীপে এবং উপকূলস্থ প্রধান প্রধান বন্দরে সুলতানের শাসন সুনিশ্চিতভাবে কার্যকরী।

বৃটিশ সরকার দেখে যে তার সামনে দু'টি পথ খোলা আছে: (১) জার্মানীকে সমস্ত এলাকা গ্রাস করতে দেওয়া; অথবা (২) পূর্ব আফ্রিকা বিভাজন। নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় পথ প্রথমটির চেয়ে অধিকতর বাঞ্ছনীয়, শুধুমাত্র সাম্রাজ্য প্রসারের জন্যই নয়, ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যও বটে। লর্ড কিচেনার জোর দিয়ে বললেন, যদি জার্মানী দার-এস-সালাম দখল করে তবে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগের নিরাপত্তার জন্য পূর্ব আফ্রিকার উপকূলের উত্তরাংশে বৃটিশ অধিকার বজায় রাখতে হবে।

অতএব ১৮৮৬ সালের অক্টোবর মাসে এক ইঙ্গ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তির প্রধান প্রধান ধারা ছিল:

(ক) জাঞ্জিবার সুলতানের এক্তিয়ারে পড়ে জাঞ্জিবার, পেম্বা, মাফিয়া ও লামু দ্বীপ এবং দক্ষিণে 'রোভুমা' নদী থেকে উত্তরে কিপিনি পর্যন্ত দশমাইল প্রস্থ উপকূল রেখা। কিপিনির উত্তরে কিসমায়ু, বারাওয়া, মেরকা, মোগাদিশু এবং ওয়ারশেক শহরগুলিও সুলতানের অধিকারের মধ্যে পড়ে।

(খ) এই দশমাইল প্রস্থ উপকূলের পশ্চিমের এলাকা (যেখানে সুলতানের অধিকার নেই) দু' ভাগে ভাগ করা হল। উম্বা নদী থেকে শুরু করে টানা নদী পর্যন্ত উত্তরাংশ বৃটিশ 'প্রভাবিত অঞ্চল' (স্ফীয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স) এবং রোভুমা নদী থেকে উম্বা নদী পর্যন্ত দক্ষিণাংশ জার্মান 'প্রভাবিত অঞ্চল' বলে নির্দিষ্ট হল।

(গ) জার্মানী যে দার-এস-সালামে এক শুল্ক আদায়ের অফিস বসাবার দাবি করছিল বৃটেন সে দাবি সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিল।

১৮৮৬ সালের চুক্তি পূর্ব আফ্রিকায় ইঙ্গ-জার্মান প্রতিযোগিতা পুরোপুরি বন্ধ করতে পারে নি। তার কারণ, ইংলণ্ড ও জার্মানীর 'প্রভাবিত' এলাকা দু'টির পশ্চিম সীমান্ত তখনও অনির্দিষ্ট ছিল। অর্থাৎ পশ্চিম সীমানায় অন্যের ওপর টেক্কা দিয়ে নিজের অধিকৃত অঞ্চল সম্প্রসারণের সুযোগ তখনও নেওয়া যেত। তার ওপর, বৃটিশ ও জার্মান প্রভাবিত এলাকা উন্নত করার ভার পড়ল বেসরকারী কোম্পানীর ওপর। ১৮৮৮ সালে ইম্পিরিয়্যাল বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকা কোম্পানী রাজকীয় সনদ পায়। কিন্তু সভ্যদের জন্য মুনাফালাভ এই কোম্পানীর মূল উদ্দেশ্য ছিল না। এর লক্ষ্য ছিল পূর্ব আফ্রিকায় জার্মানীর প্রভাব বিস্তারে বাধা দেওয়া। বৃটিশ কোম্পানীর মত জার্মান ইস্ট আফ্রিকা কোম্পানীও ১৮৮৮ সালে কাজ আরম্ভ করে। জাঞ্জিবারের সুলতান এই দুই কোম্পানীকে তাদের নিজেদের এলাকার সংলগ্ন উপকূলাংশ শাসন করার অধিকারে দিলেন।

ইম্পিরিয়্যাল বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকা কোম্পানী প্রায় গোড়া থেকে কতকগুলি গুরুতর সমাস্যার সম্মুখীন হয়। প্রথমতঃ বারঘাসের মৃত্যুর পর (১৮৭৭) যিনি সুলতান হলেন সেই খলিফার সঙ্গে কোম্পানীর মনোমালিন্য। তার ওপর জাঞ্জিবারের ইতালীয় কনসাল কিসমায়ু প্রদেশ দাবি করে বসলেন। তৃতীয়তঃ পলাতক গোলাম নিয়ে আবার ব্যবসায়ী ও খৃষ্টান চার্চের মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ। সবচেয়ে গুরুতর বিপদ আসে জার্মান কোম্পানীর কাছ থেকে।

জার্মান কোম্পানীর শাসন আরম্ভ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উপকূলের আরবদের এক ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হল। প্রধানতঃ এই বিদ্রোহের ফলে ১৮৯১ সালের গোড়া থেকে জার্মান সরকার জার্মান 'প্রভাবিত অঞ্চল' 'আশ্রিত রাজ্য বা প্রোটেক্‌টোরেট' বলে, ঘোষণা করল এবং তার পর থেকে প্রত্যক্ষভাবে শাসন করতে লাগল।

কিন্তু জার্মানী এলাকায় আরব বিদ্রোহের ফলে সমগ্র পূর্ব আফ্রিকায় ইওরোপীয় বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে ওঠে। স্বভাবতঃ বৃটিশ কোম্পানীর কাজ তাতে কিছুটা ব্যাহত হল। এর ওপর জার্মানরা পূর্ব আফ্রিকার নানা অংশে এমন কি লামু ও অন্যান্য দ্বীপ পর্যন্ত দাবি করতে থাকে।

বিরোধ চরমে ওঠে উগাণ্ডা নিয়ে। পূর্ব আফ্রিকার বৃটিশ প্রভাবিত

অঞ্চলের উত্তর-পূর্বে উইতু বলে জার্মানীর একটি ছোট উপনিবেশ ছিল। ১৮৮৯-৯০ সালে কার্ল পেটার্স সেখান থেকে বৃটিশ অঞ্চলের পশ্চিম দিয়ে (অর্থাৎ বর্তমান উগাণ্ডার মধ্য দিয়ে) দক্ষিণের জার্মান প্রভাবিত অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করলেন। ১৮৮৯ সালের জুনমাসে পেটার্স উইতু পৌছান, পরে সেখান থেকে টানা নদী ধরে কেনিয়া মালভূমির মধ্য দিয়ে উগাণ্ডায় আসেন। তারপর বাগাণ্ডার (বাগাণ্ডা হল উগাণ্ডার বৃহত্তম উপজাতি) কাবাকার (রাজা) সঙ্গে তিনি এক চুক্তি করলেন, যার ফলে বুগাণ্ডা জার্মানীর 'আশ্রিত রাজ্যে' পরিণত হল। কিন্তু পেটার্সের এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি। কারণ রাশিয়া ও ফ্রান্সের বিপক্ষতায় ভীত জার্মান সরকার ইতিপূর্বেই বৃটেনকে জানিয়ে দেয় যে উগাণ্ডার বৃটিশ প্রভাবিত অঞ্চল বলে মেনে নেওয়া হবে।

পূর্ব আফ্রিকার ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতার শান্তিপূর্ণ সামাধানের জন্য অতঃপর নতুন এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল (১৮৯০)। এই চুক্তির শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ :

(ক) জার্মানী ট্যাঙ্গানাইকা-কেনিয়ার বর্তমান সীমান্তের উত্তরে সমস্ত আঞ্চলিক দাবি ত্যাগ করল।

(খ) জার্মান ও বৃটিশ প্রভাবিত অঞ্চলদ্বয়ের পশ্চিম সীমানা স্বাধীন কঙ্গো রাষ্ট্রের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হল।

(গ) ক-এর বদলে জার্মানী পেল জার্মানীর উত্তর সীমান্তের কাছে উত্তর সাগরস্থ দ্বীপ হেলিগোল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব সীমান্তের জাম্বেসি নদী পর্যন্ত সম্প্রসারণ। বিশ মাইল প্রস্থ এই সম্প্রসারিত এলাকা মানচিত্রে আঙুলের মতো দেখতে হওয়ায় জার্মানীর রাষ্ট্রনেতা কাপ্রিভির নামানুসারে এর নামকরণ হল 'কাপ্রিভিৎসিপফেল' বা 'কাপ্রিভির আঙুল'।

(ঘ) জার্মানীর এ আশাও ছিল যে দশ মাইল প্রস্থ যে উপকূলভূমি জাঞ্জিবারের সুলতান ২৮৮৬ সালের চুক্তির পর জার্মানীকে ইজারা দিয়েছিলেন সেই ভূখণ্ডটি পুরোপুরি জার্মানীর হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বৃটেন সুলতানের ওপর চাপ দেবে। সুলতানের অবশ্য নিজ রাজ্যে পরহস্তে সমর্পণে বিশেষ উৎসাহ থাকার কথা নয়। কিন্তু তাঁর পক্ষে বোধকরি উপায়ান্তরও কিছু ছিল না। অবশেষে ২৫ লক্ষ টাকার কিছু বেশী ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে তিনি উল্লিখিত এলাকাটি জার্মানীর হাতে তুলে দিলেন।

ইঙ্গ-জার্মান চুক্তির (১৮৯০) ভিত্তিতে বৃটেন নায়াসাল্যাণ্ড (বর্তমান মালাবি), উগাণ্ডা এবং জাঞ্জিবার ও পেম্বা 'আশ্রিত রাজ্য' বলে ঘোষণা করে। এমনি করে জার্মান পূর্ব আফ্রিকা ও মোজাম্বিক বাদে মূল আফ্রিকা ভূখণ্ডের সমগ্র পূর্বাংশ বৃটেনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে আসে। আর ত্রিশবছর বাদে জার্মানীর পূর্ব আফ্রিকার উপনিবেশটিও বণ্টিত হল বৃটেন ও বেলজিয়ামের মধ্যে লীগ অফ নেশনসের তত্ত্বাবধানে শাসিত ম্যাণ্ডেট-এলাকা হিসাবে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা বিভাজন

এক

উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা বিভাজনে দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ এখানকার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আমরা এমন এক ইওরোপীয় শক্তির আবির্ভাব দেখতে পাই, যে আফ্রিকার অন্যত্র সক্রিয় ছিল না। সে শক্তি হল ইতালী। দ্বিতীয়তঃ এখানে মোটামুটি এক সুসংগঠিত ও সুপ্রাচীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, যার ফলে এখানকার আঞ্চলিক ইতিহাসে আফ্রিকানরা অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার এই রাজ্যটির নাম ইথিওপিয়া, আফ্রিকার প্রাচীনতম রাষ্ট্র, যার আমহারিক ভাষা খৃষ্টধর্ম ও সুসংগঠিত শাসন এক বৈশিষ্ট্যময় সংস্কৃতির উৎস।

ইথিওপিয়া ও ইতালী ছাড়া উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় আর দু'টি শক্তি সক্রিয় ছিল। তারা হল ফ্রান্স ও বৃটেন। ফ্রান্সের স্বপ্ন ছিল পশ্চিমে সেনেগাল থেকে পুবে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার। কেপ থেকে কায়রো পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে সারা আফ্রিকা জুড়ে অধিকার বিস্তারের উচ্চাশা বৃটেনের ছিল। ক্রসওয়ার্ড পাজলের মতো দু'পক্ষের কাছে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা হল এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজক অংশ। ঐতিহাসিক মূন যথার্থ বলেছেন, "অ্যাবিসিনিয়া ও পূর্ব সুদানে ফ্রান্স, বৃটেন ও ইতালীর সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার অতিনাটকীয় সংঘাত আফ্রিকা মহাদেশের অন্য অঞ্চলের ঘটনাবলীর স্বাভাবিক ফল, এমন কি তার পরিণতিও বলা যায়।"

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বৃটেন মিসর দখল করে। কিন্তু ফ্রান্স বৃটিশ অধিকার চরম বলে মেনে নেয় নি। এবং গ্ল্যাডস্টোন যখন বললেন যে বৃটেন মিসর স্থায়ীভাবে অধিকার কায়েম করতে আসে নি তখন ফরাসী রাজনৈতিক মহল কিছুটা স্বস্তি বোধ করে। এ ছাড়া তখন পর্যন্ত ইথিওপিয়া এবং উর্ধ্বনীল উপত্যকার (বর্তমান সুদান) দুর্ধর্ষ উপজাতিরা কোন ইওরোপীয় শক্তির বশ্যতা স্বীকার করে নি। সুদানের পশ্চিমে ফরাসী এলাকা (বর্তমান শাদ)

সুদানের পূর্বে ইথিওপিয়া পেরিয়ে এডেন উপসাগরের কূলে ফ্রান্স ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় সুলতানের কাছ থেকে সোমালি এলাকার খানিকটা ক্রয় করে (বর্তমান ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড)। সুতরাং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা সুদান ও ইথিও-পিয়ার মধ্য দিয়ে পশ্চিমে সেনেগাল থেকে পূর্বে সোমালি উপকূল পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে সুদানের গুরুত্ব ইথিওপিয়ার চেয়ে বেশী ছিল। প্রথমত নীলনদের প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য সুদান অধিকার প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত, কেপ থেকে কায়রো পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন বৃটিশ সাম্রাজ্য গঠনের জন্য সুদান একটি সংযোজক অংশ। সুদান ও মিসর ফারাওদের আমল থেকে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে আবদ্ধ ছিল। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীতেও একাধিক মিসরীয় বাহিনী সুদান অভিযানে প্রেরিত হয়।

এমন অবস্থায় ১৮৮১ সালে সুদানে প্রসিদ্ধ মাহদি বিদ্রোহের শুরু। মোহাম্মদ আহমেদ নামে জনৈক সুদানী নিজকে ঈশ্বর প্রেরিত নেতা বলে দাবি করেন এবং বেশ কিছু শিষ্য সংগ্রহ করেন (এইসব শিষ্যদের 'দরবেশ' বলা হত)। মাহদি বলেন, ইসলামের পুনরভ্যুদয় ঘটাতে এবং মিসরী ও ইউরোপীয়দের সুদান থেকে বিতাড়িত করার জন্য তিনি ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট। কিছুদিনের মধ্যে মাহদি আন্দোলন সবিশেষ শক্তি সংগ্রহ করে এবং এক মিসরী বাহিনী এর কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। ততদিনে (১৮৮২ সালের পরে) যেহেতু বৃটেন মিসরে শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, সেহেতু বৃটিশ সরকার জেনারেল গর্ডনকে খার্তুম থেকে ইওরোপীয় ও মিসরীয়দের অপসারণের উদ্দেশ্যে সুদানে পাঠায়। ১৮৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে মাহদী-বিদ্রোহীরা খার্তুম দখল করে। গর্ডন নিহত হন। এরপর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে মাহদি-সংগঠন। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ সুদানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হয় না।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে বৃটেন ও ফ্রান্স সুদান সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে পড়েছিল। সুদান থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর স্বভাবত ইথিওপিয়ার দিকে তাদের দৃষ্টি গেল। ইথিওপিয়া দখল করার মতলব ফ্রান্সের ইতি-পূর্বেই ছিল। বৃটেনের উদ্দেশ্য প্রধানত নঞর্থক থাকে অর্থাৎ ইথিওপিয়ার দখলে ফ্রান্সকে বাধা দেওয়া। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বৃটেন ইথিওপিয়া ও সোমালিল্যাণ্ড অঞ্চলে ইতালীকে উৎসাহিত করতে থাকে।

উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় ইতালীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একেবারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এসে পড়তে হবে। সুতরাং সে প্রসঙ্গ উত্থাপনের আগে দেখা যাক, যে সুদান নিয়ে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের এত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সে সুদানের ভাগ্যে কী ঘটল।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্যর হার্বার্ট কিচেনার মাহদি-বিদ্রোহীদের হাতে পর্যুদস্ত মিসরীয় বাহিনী পুনঃসংগঠিত করে সুদান আক্রমণ করেন। প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয় ইঙ্গ-মিসরীয় যৌথ দায়িত্ব ও উদ্যোগে এই আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে। আসলে সেনাচালনার ভার ছিল বৃটিশ অফিসারদের হাতে। তাছাড়া খোদ মিসর বৃটেনের অধিকারে থাকায় যৌথ-উদ্যোগের কথা অর্থহীন। যাই হোক্ কিচেনার সুশৃঙ্খলভাবে রেলপথ নির্মাণ করতে করতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে খার্তুম শহরের নিকট মাহদি-বিদ্রোহীরা পরাস্ত হল। মাহদি-নেতা তাঁর সেনাদলের একাংশ নিয়ে পালাতে সক্ষম হলেও পরের বছর তিনি অন্য এক যুদ্ধে নিহত হন। সুদানে আইনত ইঙ্গ-মিসরীয় যৌথ শাসনের বা কনডোমিনিয়াম প্রতিষ্ঠিত হল।

কিচেনার যখন সসৈন্যে উত্তর থেকে দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন মারশাঁ নামে এক ফরাসী মেজর পশ্চিম থেকে পূর্বে এগোচ্ছেলেন। মারশাঁ ও তাঁর ১৫০ জন সেনেগালী সৈন্য কিচেনারের খার্তুম পৌছোনোর কিছু আগে শ্বেতনীল নদীর তীরে ফাশোদায় এসে উপস্থিত হলেন। কিচেনার ও মারশাঁ বুদ্ধিমানের মতো সংঘর্ষ এড়িয়ে নিজ নিজ সরকারকে ব্যাপারটা জানালেন। স্বভাবত দু'পক্ষই সুদান সম্পর্কে উৎসাহী ছিল। দু'পক্ষের সেনাদল সুদান পৌছোতে অনেক সময় ও শক্তি ব্যয় করেছে। কাজেই মনান্তরের তীব্রতা যুদ্ধে পরিণত হবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু বৃটেনের সৌভাগ্যক্রমে ফ্রান্স সুদানে বৃটিশ অধিকার স্বীকার করে নেয়। অবশ্য এর সঙ্গে পশ্চিম থেকে নীল নদে আগত বাহর-এল-ঘাজল ও শাখা-প্রশাখার ওপর নিজ দখল বজায় রাখতে ফ্রান্স ক্ষীণ প্রচেষ্টা করে। কিন্তু এখানেও বৃটেন যুক্তি দেয়: যে নীল নদীর জলের ওপর মিসরের জীবন নির্ভরশীল তার জল সরবরাহের অন্যের কর্তৃত্ব সে সহ্য করবে না। ফাশোদার মতো বাহর-এল-ঘাজলের প্রশ্নেও ফ্রান্স পেছিয়ে গেল।

সুদানে ফ্রান্সের এই ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে সেনেগাল থেকে সোমালিল্যাণ্ড পর্যন্ত বিশালায়তন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়। স্বভাবত ফ্রান্সী

সাম্রাজ্যবাদী মহল এতে কম উত্তেজিত হয় নি এবং এর ফলে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করার সম্ভাবনা ছিল, যদি না ইতিমধ্যে জার্মানীর ক্রমবর্ধমান শক্তি ফ্রান্সের রাষ্ট্রনায়কদের মনে ভীতির সঞ্চার করত। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষে শিল্পপ্রসার, সাম্রাজ্য উদ্যোগ ও নৌবহরের শক্তিবৃদ্ধি ফ্রান্স ও বৃটেনকে ঘনিষ্ঠ বন্ধনের দিকে নিয়ে যায়। তার বহিঃপ্রকাশ হল অধুনা-প্রসিদ্ধ আঁতাত কর্দিয়াল। দুই দেশের নেতারা নিজ নিজ জনগণকে অতীত বিরোধের কথা ভুলে যেতে আহ্বান জানান। এবং ১৮৯৮ সালের তিক্ত স্মৃতিকে ভুলে যাবার জন্য ফাশোদার নাম পর্যন্ত বদলানো হয়।

দুই

আফ্রিকার আধুনিক রঙ্গমঞ্চে ইতালী আবির্ভূত হয় অনেক পরে। জার্মানীর মতো ইতালীর রাজনৈতিক অনৈক্য এর একটা কারণ। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত ইতালী অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেগুলি একত্রিত করে ঐক্যবদ্ধ ইতালী রাষ্ট্রের জন্ম হল। বিলম্বিত জাতীয় ঐক্য ও শিল্পায়নের অভাবে আফ্রিকা বিভাজন ইতালী অন্য ইউরোপীয় শক্তির অনেক পেছনে পড়েছিল।

১৮৭০ সালে রুবাত্তিন নামে এক ইতালীয় ব্যবসায়ী স্থানীয় সুলতানের কাছ থেকে লোহিত সাগরের কূলে আসার নামে ছোট্ট এক শহর কিনলেন। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে বাধা পাওয়ার আশঙ্কায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তাঁর এলাকার দখল করতে এগোয় নি। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইতালী সরকার। রুবাত্তিনকে প্রয়োজন বোধে যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিলে আসাব দখল করা হয়। তারপর বৃটেনের সোৎসাহ সমর্থনে ইতালী উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার কয়েক শ' মাইল উষ্ণ মরুভূমি অঞ্চল অধিকার করে বসে।

এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইতালীয় প্রধান মন্ত্রী ক্রিসপি ১২০০ মাইল লম্বা সোমালী উপকূলের (বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত থেকে গার্দাফুই অন্তরীপ পর্যন্ত) ওপর অধিকার দাবি করেন। এ দাবির ভিত্তিস্বরূপ জাঞ্জিবারের ইতালীয় কনসাল সিনর ফিলোনার্দি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন

যে সোমালি উপকূলের উপজাতি প্রধানেরা ইতালীয় 'আশ্রয়' চাইছেন। এই উপকূলের অন্তত একটি অংশ যে জাঞ্জিবারের সুলতানের, সেকথা ১৮৯২ সালে জাঞ্জিবারের 'রক্ষক' বৃটেনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে সহজেই একপাশে সরিয়ে রাখা হল এবং মাত্র ১৬০,০০০ টাকা বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে তথা-কথিত বেজাদির উপকূল ইতালী ইজারা নিল।

ফিলোনার্দির "দেশপ্রেমের" পুরস্কার মিলল। তাঁর স্থাপিত নতুন এক কোম্পানী নবাহৃত অঞ্চল শাসন করার ভার পেল। অন্যদিকে ইতালীয় সরকার জাঞ্জিবারকে বার্ষিক খাজনার ও ফিলোনার্দি কোম্পানীকে প্রতি বছর সরকারী সাহায্য দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু অনেক সাহায্যের পরও যখন ফিলোনার্দির কোম্পানী নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারল না তখন ১৯০৫ সালে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড উপনিবেশের এই হল সূত্রপাত।

ইথিওপিয়ায় অবশ্য ইতালীর অভিজ্ঞতা ভিন্ন ধরনের। ইথিওপিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারে বৃটেন ইতালীকে উৎসাহিত করছিল তার কারণ ফ্রান্স ইথিওপিয়া অধিকার করুক বৃটেন তা চায় নি, একথা আমরা আগেই বলেছি। এই উৎসাহদানের ফলে ইতালী ১৮৮৫ সালের প্রথম ভাগে মাসাওয়ায় সৈন্য বাহিনী পাঠায়। ইতালীয় সেনারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা, সামরিক ঘাঁটি প্রভৃতি নির্মাণ করে। ইথিওপিয়ার উত্তর সীমান্তের কাছে ইথিওপীয় ও ইতালীয় বাহিনীর কয়েক দফা সংঘর্ষও হয়। ১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে এমন একটি যুদ্ধে ছোট এক ইতালীয় বাহিনী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস পায়।

কিন্তু ইতালীর সৌভাগ্যক্রমে এই সময় ইথিওপিয়ায় সিংহাসন নিয়ে গৃহযুদ্ধের সূচনা হল। ইতালীয় সমর্থনে মেনেলিক ১৮৮৯ সালে ইথিওপিয়ায় সিংহাসনে বসেন। সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ মেনেলিক ইতালীর সঙ্গে উচ্চিয়ালির চুক্তি স্বাক্ষর করেন (১৮৮৯)। এই চুক্তির ফলে প্রথমত ইরিত্রিয়ায় ইতালীর অধিকার ইথিওপীয় মালভূমি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে দেওয়া হল। দ্বিতীয়ত চুক্তির ১৭ ধারায় বলা হল, "ইথিওপিয়ার রাজা বৈদেশিক বিষয় পরিচালনা করার জন্য ইতালীয় সরকারের সাহায্য গ্রহণ করতে পারবেন।" ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রভাষা আমহারিক-এ, এই ছিল ১৭ ধারার ভাষা। চুক্তির ইতালীয় মূলপাঠে কিন্তু বলা হয় যে, ইথিওপিয়ার রাজা বৈদেশিক নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে ইতালীয় সরকারের সাহায্য

গ্রহণ করতে রাজী হচ্ছেন। অতএব, ইতালীয় পাঠ অনুযায়ী ইথিওপিয়া ইতালীর 'আশ্রিত' রাজ্যে পরিণত হল। এবং ইতালীর প্রধান মন্ত্রী সিনর ক্রিসপি অন্য ইওরোপীয় দেশকে নোটিশ দিলেন যে অতঃপর ইথিওপিয়ার সঙ্গে সরকারের বোঝাপড়া ও চুক্তি ইতালীর মাধ্যমে করতে হবে।

১৮৯০ সালে মেনেলিক ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা আরম্ভ করলে ইতালী আপত্তি জানায় এই চুক্তিতে যে উচ্চিয়ালি চুক্তির সর্ত ভঙ্গ করা হচ্ছে। মেনেলিক স্বভাবত এ আপত্তিতে কর্ণপাত করলেন না।

কিন্তু ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইথিওপীয় সরকারের কাছে একথা পরিষ্কার হল যে ইথিওপীয় প্রদেশ 'তিগ্রে'র ওপর ইতালীর নজর আছে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৯৬ সালের মার্চমাসে ইতালীয় সেনাপতি বারাতিয়েরী 'তিগ্রে'র রাজধানী আদোয়া'র ওপর এক অতর্কিত আক্রমণ চালালেন। কিন্তু আদোয়া'র রণক্ষেত্র হল ইতালীর ওয়াটারলু। এ যুদ্ধে ৮,০০০ ইতালীয় সৈনিক সরাসরি নিহত, বহু হত এবং আরো অনেকে বন্দী হল। সেই বছরই আদ্দিস-আবাবায় শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে ইতালী ইথিওপিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়।

আদোয়া'র যুদ্ধ অন্তত কিছুদিনের জন্য ইথিওপিয়া তথা মেনেলিকের মর্যাদা বাড়ায়। আশেপাশের বহু উপজাতিকে পর্যুদস্ত করে মেনেলিক ইথিওপিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দৃঢ়তর করেন। সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক সংগঠন ও অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টাও চলে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মেনেলিক উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় স্বার্থশালী ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সঙ্গে একাধিক চুক্তি করে নিজ রাজ্য সীমানা সুসংহত করলেন। এই সব চুক্তির মধ্যে ১৯০২ সালের ইঙ্গ-ইথিওপীয় চুক্তি উল্লেখযোগ্য। এই চুক্তির মারফত ইথিওপীয় সরকার: (ক) প্রতিশ্রুতি দেয় যে এমন কোন বাঁধ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হবে না যার ফলে ব্ল্যুনীল নদী, সোবাৎ বা টানা হ্রদের জলের নীল নদীর দিকে স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ ব্যাহত হবে। (খ) ইথিওপিয়ায় বৃটেনকে বাণিজ্য চালানোর জন্যে কিছু জমি ইজারা দিতে স্বীকৃত হল। (গ) ইথিওপিয়ার মধ্য দিয়ে সুদান ও উগাণ্ডাকে যোগ করে এক রেলপথ নির্মাণ করার অধিকার বৃটেনকে অর্পণের প্রতিশ্রুতি দিল।

কিন্তু ইথিওপিয়া যখন বৃটেন, ফ্রান্স ও ইতালীর সঙ্গে চুক্তি করে নিজের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করছে, তখনও উল্লিখিত শক্তিবর্গ ইথিওপিয়ায় তাদের স্বার্থের কথা ভুলে যায় নি। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় ১৯০৬

সালের ত্রিশক্তি চুক্তির কথা। এ চুক্তির স্বাক্ষরকারী ছিল বৃটেন, ফ্রান্স ও ইতালী। চুক্তিতে অবশ্য ইথিওপিয়ায় কায়েমী অবস্থা (রাজ্যের সীমানা ইত্যাদি) বজায় রাখার সংকল্প ঘোষণার সঙ্গে বলা হল যে এখানকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন স্বাক্ষরকারী শক্তি হস্তক্ষেপ করবে না, এমন কি যদি আভ্যন্তরীণ কোন পরিবর্তন হয় তবুও। কিন্তু যদি স্থিতাবস্থা বজায় না থাকে তবে প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী ইথিওপিয়ার অখণ্ডতা রক্ষার চেষ্টা করবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত স্বার্থরক্ষারও প্রয়াস পাবে:

(অ) নীল-অববাহিকায় জল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মিসর ও বৃটেনের স্বার্থ।

(আ) ইরিত্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ড সম্পর্কিত স্বার্থ।

(ই) ফ্রান্সের ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড সম্পর্কিত স্বার্থ।

এই চুক্তি (যার সর্তাবলী কখনও বাস্তবে প্রয়োগ করা হয় নি) স্বাক্ষর কারীদের মতলব যে কী সে সম্পর্কে আর কোন মোহের অবকাশ রাখল না। মেনেলিক এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। উত্তরে ফ্রান্স, ইতালী ও বৃটেনের সরকারী মহল ব্যাখ্যা করে যে চুক্তির ফলে ইথিওপিয়ার সার্বভৌমত্ব কোন রকমে ক্ষুন্ন করা হয় নি।

১৯০৬ সালের পর ইওরোপীয় রাজনীতির জটিলতা এবং ইথিওপিয়ার সতর্কতা তার স্বাধীনতা রক্ষা করে। প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন ইতালী ট্রিপ্‌ল অ্যালায়েন্সের অংশীদার হিসাবে জার্মানীর বন্ধু। মিত্রপক্ষ ইতালীকে দলে টানার জন্য ১৯১৫ সালে লণ্ডনে এক অপ্রকাশিত চুক্তি করে। এ চুক্তির ত্রয়োদশ ধারা (১৩) আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বলে আমরা সেটি উদ্ধৃত করছি:

নীতিগতভাবে ফ্রান্স ও বৃটেন স্বীকার করছে যে জার্মান উপনিবেশ অন্তর্ভুক্তির ফলে যদি এরা তাদের আফ্রিকার সাম্রাজ্যের আরও সম্প্রসারণ করে, তবে ইতালী সমাজ ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে। বিশেষ করে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড, ইরিত্রিয়া ও লিবিয়া এবং পার্শ্ববর্তী ফরাসী ও বৃটিশ উপনিবেশের মধ্যেকার সীমান্ত প্রশ্ন ইতালীর অনুকূলে সমাধান করার মধ্য দিয়েই এই ক্ষতিপূরণ দেয়।

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর আফ্রিকায় জার্মানীর উপনিবেশ মিত্রপক্ষের মধ্যে বাঁটোয়ারা হয়ে গেল। বৃটেন পেল টোগোল্যাণ্ডের

পশ্চিমাংশ, ক্যামেরুন্সের পশ্চিমাংশ এবং জার্মান পূর্ব আফ্রিকার বৃহত্তর অংশ (ট্যাঙ্গানাইকা), ফ্রান্স টোগোল্যাণ্ডের পূর্বাংশ ও ক্যামেরুন্সের পূর্বাংশ বেলজিয়াম জার্মান পূর্ব আফ্রিকার ক্ষুদ্রতর অংশ (রুয়াণ্ডা উরুণ্ডি) এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের ভাগ্যে জুটল দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা। অবশ্য এই সমস্ত দেশ লীগ অফনেশন্‌সএর তত্ত্বাবধানে ম্যাণ্ডেট হিসাবে শাসিত হতে লাগল। যাই হোক এ ব্যবস্থা ইতালীর উপনিবেশিক সম্প্রসারণের কামনা চরিতার্থ হয় নি। এবং ভার্সাই চুক্তিতে ইতালীর পাওনা বিশেষ কিছু হয় নি বলে ইতালীর রাষ্ট্রনেতারা বিক্ষুব্ধ হলেন।

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে বোঝাপড়া করে অবশ্য ইতালী তার উপনিবেশের সীমান্তে সামান্য কিছু এলাকা লাভ করে। এর মধ্যে কেনিয়ার উত্তর-পূর্বে স্থিত জুবাল্যাণ্ডই হচ্ছে সব থেকে উল্লেখযোগ্য অঞ্চল। বৃটেনের সম্মতিতে জুবাল্যাণ্ড ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ইতালী কিন্তু ইথিওপিয়ার কথা ভোলে নি। এবং বৃটেনও নয়। ইথিওপিয়ায় বৃটেনের নিজের কিছু স্বার্থ ছিল। তাছাড়া বৃটিশ নেতারা হয়ত ভেবেছিলেন ইথিওপিয়ার ওপর দিয়ে যদি ইতালীকে খুশী করা যায় তো মন্দ কি? ১৯২৬ সালে বৃটিশ উদ্যোগে ইঙ্গ-ইতালীয় আলোচনা শুরু হয় এবং দুই শক্তি স্থির করে :

(ক) টানা হ্রদে (ইথিওপীয়ার উত্তর-পশ্চিমে) বাঁধ এবং সুদান থেকে টানা হ্রদ পর্যন্ত রাজপথ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ইথিওপীয় সরকারের অনুমতি পাবার চেষ্টায় ইতালী বৃটেনকে সমর্থন করবে। তার বদলে, ইথিওপিয়ার পশ্চিমাংশের মধ্য দিয়ে ইরিত্রিয়া থেকে সোমালিল্যাণ্ড পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনায় বৃটেন ইতালীকে সমর্থন করবে।

(খ) ইথিওপিয়ার পশ্চিমাংশে এবং যে অঞ্চল দিয়ে উল্লিখিত রেলপথ যাবে, সে অংশে ইতালীর একচেটিয়া অর্থনৈতিক প্রভাব বৃটেন কর্তৃক স্বীকৃত হবে। এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার জন্য ইথিওপিয়ার কাছে ইতালীর অনুরোধ বৃটেন সমর্থন করবে। অবশ্য টানা হ্রদে বাঁধ নির্মাণের কনসেশন পাবার পরেই এই সমর্থন বৃটেন দেবে। অন্যদিকে ইতালী নীলনদের জল-প্রবাহ হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার দেয়। কোন স্বাধীন রাষ্ট্র সম্পর্কে অন্য দুটি রাষ্ট্রের এমন প্রকাশ্য চুক্তি সভ্য ইতিহাসে বিরল।

ইথিওপিয়া স্বভাবতঃ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করল শুধুমাত্র বৃটেন ও ইতালীর

কাছে নয়, লীগ অফ নেশন্‌সএর দরবারেও। (ইতিমধ্যে ইথিওপিয়া লীগের সদস্যপদ লাভ করেছে)। বৃটেন ও ইতালী আত্মপক্ষসমর্থনে বলে, এ চুক্তির ফলে ইথিওপিয়ার সার্বভৌম অধিকার ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা হচ্ছে না, শুধু বৃটেন ও ইতালীর পারস্পরিক প্রতিযোগিতার সম্ভাবনাই রোধ করা হচ্ছে মাত্র। ঠিক হল যে লীগ অফ নেশন্‌স প্রকাশিত ট্রিটি সিরিজ-এ (আন্তর্জাতিক-চুক্তি ও সন্ধি তালিকায়) ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তির সঙ্গে ইথিওপিয়ার প্রতিবাদ পত্রও প্রকাশিত হবে।

ইতিমধ্যে ইথিওপিয়ার রাজার উদ্যোগে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে: সৈন্যদলে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯৩১ সালে রাজা দেশকে এক সংবিধান উপহার দিলেন। এ সংবিধানে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না হলেও সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সহ পার্লামেন্টের প্রবর্তন করা হল। শিক্ষা ও বিচার ব্যবস্থারও সংস্কার সাধিত হল। কিন্তু ইথিওপিয়ার আভ্যন্তরীণ প্রগতি শান্তিপূর্ণভাবে চলতে পারে নি কারণ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফ্যাসিস্ট ইতালী ইথিওপিয়া আক্রমণ করে।

আমরা আগে বলেছি আদোয়া'র পরাজয় (১৮৯৬) ইতালীর সাম্রাজ্যবাদী মহল ভুলতে পারে নি। ইথিওপিয়ার খণ্ডীকরণ ও অন্তত কিছু অংশ দখল ইতালীর সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনার এক বড় অঙ্গ ছিল। ইতিমধ্যে অবশ্য ইতালী ও ইথিওপিয়া উভয়েই লীগ অফ নেশন্‌সের সদস্য হয়েছে এবং সে হিসাবে তারা কভেনান্টে বর্ণিত কতকগুলি দায়িত্ব ও কর্তব্য মেনে নিয়েছে যেমন পররাজ্য আক্রমণ থেকে বিরত হওয়ার দায়িত্ব। এ ছাড়া ১৯২৮ সালে এ দুই শক্তি একটি বন্ধুত্ব ও অনাক্রমণ চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে।

এ ধরনের নৈতিক ও কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতা অবশ্য কোন কালে সাম্রাজ্যবাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি এবং ইতালীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। ১৯৩৪ সালের গোড়া থেকে ইতালীয় উপনিবেশ ও ইথিওপিয়ার সীমান্তে কয়েকটি সংঘর্ষ ঘটে। ইতালী অভিযোগ করে যে ইথিওপিয়ানরা সীমানা লঙ্ঘন করে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড ও ইরিত্রিয়ায় ঢুকে অত্যাচার করেছে। আসলে এগুলো প্রায়শই বহুকাল প্রচলিত উপজাতীয় দ্বন্দ্ব এবং এতে ইওরোপীয় শাসকদের নির্ধারিত রাজনৈতিক সীমানা গণ্য নয়। অবস্থা কিন্তু চরমে ওঠে ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে

যখন ইথিওপিয়ার সীমানার প্রায় পঞ্চাশ মাইল অভ্যন্তরে ওয়াল-ওয়াল নামক স্থানে, ইতালীয় ও ইথিওপীয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়ে গেল। দু'পক্ষই সঙ্গে সঙ্গে অপরের আক্রমণের প্রতিবাদ করল।

ইথিওপিয়া লীগ অফ্ নেশন্স-এর কাছে আবেদন জানালো। প্রধানতঃ ফ্রান্স ও বৃটেনের চাপে ইতালী ওয়াল-ওয়াল ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য এক কমিশন বসাতে রাজী হয়। কিন্তু পরবর্তী কয়েক মাসে অনুসন্ধান কমিশনের কাজ বিশেষ কিছু এগোয় না। এপ্রিল মাসে বৃটিশ ফরাসী ও ইতালীয় মন্ত্রিগণ স্ট্রেসা সম্মেলনে মিলিত হলেন। কিন্তু আফ্রিকায় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা তাঁদের বিচলিত করে নি। স্ট্রেসা সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে তিন শক্তি এই সংকল্প গ্রহণ করল যে তারা ইওরোপের শান্তি বিপন্ন করতে পারে "এমন যে কোন একপাক্ষিক চুক্তিভঙ্গ" প্রতিরোধ করবে। সম্মেলনে মুসোলিনির উপস্থিতি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেবে কেন সাধারণভাবে শান্তির কথা না বলে ইওরোপের শান্তির কথা উচ্চারিত হল।

লীগে যেহেতু ফ্রান্স ও বৃটেনের নেতৃত্ব ছিল সুতরাং লীগ ইথিওপীয় যুদ্ধে কোন্ পথ নেবে সে কথা সহজেই অনুমেয়। যাই হোক, স্ট্রেসা সম্মেলনের পর ওয়াল-ওয়াল কমিশন সর্ববাদি সম্মত রিপোর্ট পেশ করে যে ওয়াল-ওয়াল সংঘর্ষের জন্য কোন সরকারই দায়ী নয়। (যদিও ওয়াল-ওয়াল ইথিওপিয়ান সীমান্তের প্রায় ৫০ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত।) বৃটেন ও ফ্রান্স একাধিকবার ইথিওপিয়ার ক্ষতি করে ইতালীকে তুষ্ট রাখার প্রয়াস পায়। কিন্তু ইতালীয় সরকার প্রতিবার তা প্রত্যাখ্যান করে। তখন লীগ কাউন্সিল এক সিদ্ধান্তে ইথিওপিয়াকে "সাহায্যের পরিকল্পনা" এবং ইথিওপিয়া ও ইতালীর মধ্যে সীমান্ত পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করে। কিন্তু এ প্রস্তাব গ্রহণের অল্পকাল পরে পূর্ণোদ্যমে ইতালীর আক্রমণ শুরু হল।

৮ই অক্টোবর লীগ কাউন্সিল ইতালীকে আক্রমণকারী বলে এক প্রস্তাব গ্রহণ করল (শুধুমাত্র ইতালী এর বিপক্ষে ভোট দেয়)। তারপর লীগ অ্যাসেম্বলার ৫৮জন সদস্যের মধ্যে ৫১ জনের সম্মতিক্রমে ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঠিক হল: লীগ সদস্যরা —

(ক) নিজ নিজ দেশ থেকে ইতালীকে যে কোন রকমের ঋণদান বন্ধ করবে ও (খ) যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় পণ্য

ইতালীতে রপ্তানী বন্ধ এবং (গ) ইতালী থেকে সব রকমের পণ্য আমদানী খারিজ করবে।

১৯৩৫ সালের ১৮ই নভেম্বর লীগের ইতিহাসে এই প্রথম প্রযুক্ত হল কোন দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এখানে বলে রাখা ভাল যে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ব্যপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রয়োগ করা হয় নি। প্রথমত ইতালীয় জাহাজের সুয়েজ খাল ব্যবহার বন্ধ করার কোন ইচ্ছা বৃটেন ও ফ্রান্সের ছিল না দ্বিতীয়ত অনেক জিনিস যা যুদ্ধ চালাবার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় যেমন পেট্রল ইতালীতে প্রেরণ বেআইনী করা হয় নি।

লীগের নেতৃস্থানীয় শক্তি ফ্রান্স ও বৃটেনের এ অনিচ্ছার কারণ স্পষ্ট। ফ্রান্স হিটলার বিরোধী ফ্রন্টে ইতালীর অংশগ্রহণ চাইছিল। সুতরাং ফরাসী সরকার এমন কিছু করতে চায় নি যাতে ইতালী ফ্রান্সের শত্রু হয়ে পড়ে। বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ সামরিক শক্তি ইথিওপিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার নিয়োগ করতে চায় নি, এই যুক্তিতে যে অদূর ভবিষ্যতে আত্মরক্ষার কাজে তার প্রয়োজন হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই এই নিষ্ক্রিয়তা আসলে তৎকালীন ফ্যাসিস্ট তোষণ নীতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

এমন অবস্থায় যখন যুদ্ধের প্রথম তিনমাস ইতালী ইথিওপিয়ার প্রধান সৈন্যবাহিনীকে নির্মূল করতে পারল না, তখন ফরাসী ও বৃটিশ রাজনৈতিক মহল নতুন করে ভাবতে শুরু করে। ফ্রান্স ভাবল ইতালীর অসাফল্যে মুসোলিনি হিটলার বিরোধী ফ্রন্ট ত্যাগ করবেন কারণ লীগের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন অন্যদের সঙ্গে বৃটেন এবং ফ্রান্সও সমর্থন করে। বৃটিশ নেতাদের কেউ কেউ ভয় পেলেন, ইথিওপিয়ায় কিছু করতে না পেরে বুঝি বা মুসোলিনি মরিয়া হয়ে বৃটেনের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেন!

এই সময়ে বৃটিশ বৈদেশিক সেক্রেটারী স্যর স্যামুয়েল হোর, ফরাসী নেতা শ্রী লাভালের সঙ্গে মিলে ইথিওপিয়ায় শান্তি স্থাপনের এক পরিকল্পনা তৈরি করেন। এই পরিকল্পনায় ইথিওপিয়ার এক বিস্তৃত ভূখণ্ড প্রায় ২ ভাগ ইতালীর নিকট সমর্পণ এবং বিনিময়ে বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডের এক অংশ ইথিওপিয়াকে হস্তান্তরণের প্রস্তাব ছিল।

প্রকাশিত হলে এই পরিকল্পনা বৃটেনের জনমত কর্তৃক এমনভাবে ধিকৃত হয় যে স্যর স্যামুয়েল হোর পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। হোর লাভাল পরিকল্পনার কথা আর শোনা যায় না।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের মোড় ঘুরেছে এবং ইতালীয় বাহিনী আরো দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকলে ১৯৩৬ সালের ১লা মে হাইলে সেলাসি দেশত্যাগ করেন। কয়েকদিন বাদে আদ্দিস আবাবার পতন হয় এবং ৯ই মে ইতালীর রাজা ইথিওপিয়ার সম্রাট পদাভিষিক্ত হলেন।

এইভাবে আফ্রিকার শেষ স্বাধীন রাজ্যের পতন হল। বহুদিন থেকে ইওরোপের একাধিক দেশ ইথিওপিয়ার দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করছিল। কিন্তু ইথিওপীয় সরকারের সতর্কতা এবং ভৌগোলিক কারণে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। লীগ অফ্ নেশন্স প্রতিষ্ঠিত হলে অনেকে আশা করেছিলেন, দুর্বল জাতির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত হবে। একটি বৃহৎ শক্তির হুঙ্কারের সামনে লীগের নপুংসকতা প্রমাণ করল তথাকথিত যৌথ নিরাপত্তার ভিত্তি কত দুর্বল। পরবর্তী কয়েক বছরে সারা দুনিয়াকে এই যৌথ নিরাপত্তার অভাবের চরম মূল্য দিতে হয়েছিল।

ইথিওপিয়া অল্প কয়েক বছর ইতালীর অধীন থাকে। ১৯৪১ সালে বৃটিশ বাহিনী ইথিওপিয়াকে মুক্ত করলে হাইলে সেলাসি পুনরায় ইথিওপিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

আফ্রিকা বিভাজনের সামগ্রিক রূপরেখাটি এবার স্পষ্ট হয়ে আমাদের কাছে ধরা পড়েছে।

বিশ বছরের ও কম সময়ে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। কী অসাধারণ গতিতে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে তা সহজে অনুমেয়।

ইতালী, জার্মানী, পর্তুগাল, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও বৃটেন ছাড়া এ যুগের ইতিহাসে অংশ নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র প্রজাতন্ত্রদ্বয়, পূর্ব আফ্রিকায় জাঞ্জিবার এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় ইথিওপিয়া। কিন্তু এতগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী থাকা সত্ত্বেও আফ্রিকার মাটিতে বড়গোছের যুদ্ধ হয় নি। দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও বহুপাক্ষিক সম্মেলন কি বা বড় জোর ছোটখাট রকমের সংঘর্ষের মারফত বিরোধ মীমাংসা করা হয়েছে।

সর্বগ্রাসী বিভাজন প্রক্রিয়ায় আফ্রিকার স্বাধীন রাজ্য বলতে অবশিষ্ট ছিল শুধু ইথিওপিয়া। তাও ১৯৩৬ সালে কয়েক বছরের জন্য ইতালীর সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। এখানে লাইবেরিয়ার ও নামোল্লেখ করা উচিত। কারণ মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের উপনিবেশ লাইবেরিয়া ১৮৪৭ সালে স্বাধীন

রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি পায় এবং আজ পর্যন্ত সে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু এই রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমেরিকার উদ্যোগে। আর তার স্বাধীনতা ও অনেকাংশে রক্ষা করেছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। যে যুগের কথা বলছি তখন পর্যন্ত খাঁটি আফ্রিকান রাষ্ট্রের মর্যাদা লাইবেরিয়াকে দেওয়া যেত কিনা সন্দেহ।

ইথিওপিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার মূলে ছিল সুসংহত রাজশক্তি। আফ্রিকার অন্যত্র দুই একটা বিচ্ছিন্ন এলাকা ছাড়া আধুনিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত ইওরোপীয় বাহিনী যাদের সঙ্গে মোকাবিলা করেছে তারা ছিল অস্ত্রসজ্জা ও সংগঠনে উভয় দিকেই অনগ্রসর। কূটনীতির খেলাতে ও ইথিওপিয়া ছাড়া অন্য আফ্রিকান রাজশক্তি ইওরোপীয় শঠতা ও চাতুর্যের কাছে দাঁড়াতে পারে নি। প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন শক্তি এমন কি শত্রুভাবাপন্ন দেশের সঙ্গে পর্যন্ত যোগাযোগ রক্ষা করা, এক শক্তিকে অন্যের বিরুদ্ধে খেলানো, কোন ষড়যন্ত্র হলে বিশ্বজনমতের সামনে তার 'মুখোস' খুলে দেওয়া প্রভৃতি যেসব উপায় মারফত যুদ্ধ ছাড়া নিজ স্বাধীনতা রক্ষার সম্ভাবনা থাকে, সে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করার মতো রাষ্ট্রীয় সংগঠন এদের ছিল না।

ইওরোপের আফ্রিকা বিজয় তাই কোন আফ্রিকান শক্তি রোধ করতে পারে নি।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন ও তার প্রভাব

এক

বিভিন্ন ঔপনিবেশিক নীতির তুলনামূলক আলোচনার সব থেকে উপযুক্ত ক্ষেত্র হল আফ্রিকা। কারণ অন্য কোন মহাদেশে এত বেশী সংখ্যক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমাবেশ ঘটে নি। ১৯৬০ সালের গোড়ায় আফ্রিকা মহাদেশ যে যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ঔপনিবেশিক শাসন চালাচ্ছিল তারা হল : গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, স্পেন ও ইটালী। এর মধ্যে প্রথম চারটি দেশের ঔপনিবেশিক নীতি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব। কারণ সাহারার দক্ষিণে (যে অঞ্চল আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়) স্পেনের অধিকার নগণ্য। আর ২য় মহাযুদ্ধের পরে আমাদের আলোচ্য অঞ্চলে ইতালী মাত্র ১০ বছরের জন্যে (১৯৫০-৬০) একটা অঞ্চলে (সোমালিল্যাণ্ড) শাসন করেছে, তাও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছি পরিষদের তত্ত্বাবধানে। সহজ কথায়, যে আফ্রিকা সাহারার দক্ষিণে অবস্থিত সেখানে প্রধানতঃ চারটি ইওরোপীয় শক্তির ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তিত হয়েছে : গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও পর্তুগাল। এ অধ্যায়ে আমরা দেখাবার চেষ্টা করব কেমন করে এ সব দেশের ঔপনিবেশিক নীতি আফ্রিকার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি অংশতঃ নির্ধারিত করেছে।

বৈদেশিক নীতির সঙ্গে ঔপনিবেশিক নীতির পার্থক্য হল এই যে কোন দেশের বৈদেশিক নীতি অন্যান্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করে, আর তার ঔপনিবেশিক নীতি ঠিক করে তার অধীনস্থ দেশের মানুষকে কিভাবে শাসন করা হবে। মূলতঃ অবশ্য দুই নীতির উদ্দেশ্য এক ; ব্যাপক অর্থে দেশের—আর সঙ্কীর্ণ অর্থে শাসক সম্প্রদায় কিংবা শ্রেণীর—স্বার্থ রক্ষা করা। স্বার্থরক্ষার জন্য বৈদেশিক নীতিতে বলপ্রয়োগ যেমন একমাত্র উপায় নয়, ঔপনিবেশিক নীতিতেও তেমনি জোর করে ঔপনিবেশিক জনসাধারণের স্বাধীনতা আন্দোলন বন্ধ করা সাম্রাজ্যবাদী দেশের স্বার্থ-রক্ষার একমাত্র

উপায় নয়। ইতিহাসে আমরা তাই দেখি সাম্রাজ্যবাদী সরকার নানা কায়দায় নিজের স্বার্থ সিদ্ধি ও রক্ষা করার চেষ্টা করেছে: কখনও বলপ্রয়োগে স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করে, কখনও ঔপনিবেশের অধিবাসীদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, আবার কখনও বা মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে আপোস করে।

দুই

ঔপনিবেশিক নীতির সাধারণ উদ্দেশ্য নিজেদের স্বার্থরক্ষা হলে, প্রশ্ন আসে কী ধরনের রাজনৈতিক লক্ষ্য গ্রহণ করলে এবং কী উপায়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করলে ব্যাপক অর্থে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করা যাবে। কোন ঔপনিবেশিক নীতির রাজনৈতিক লক্ষ্যের মূলকথা হল যেখানে সেই নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই উপনিবেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। ইওরোপীয় শাসকেরা তাদের নিজের নিজের উপনিবেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করে। ধরা যাক ইংল্যাণ্ডের কথা। ২য় মহাযুদ্ধের পর বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতির বহুঘোষিত লক্ষ্য হল যে উপনিবেশগুলোকে ভবিষ্যতে আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া হবে। আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া মানে পুরোপুরি প্রভুত্ব ত্যাগ কিনা কিংবা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিনা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সত্যিকারের স্বাধীনতা বলা যায় কিনা; এসব তর্কের মধ্যে আমরা এখানে যেতে চাই না। রাজনৈনিক স্বাধীনতা বলতে আমরা দেশশাসনের কতকগুলো মৌলিক অধিকার বুঝি। এবং ভবিষ্যতে এই অধিকারগুলো উপনিবেশের লোকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া: এইটে হল বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতির স্বীকৃত রাজনৈতিক লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতি সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া দেশকে কমনওয়েল্‌থ থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকারও দেয়। এই অধিকার প্রয়োগ করে ব্রহ্মদেশ ও সুদান কমনওয়েল্‌থ ত্যাগ করেছে।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতির রাজনৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে ফরাসী, বেলজিয়ান ও পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক নীতির রাজনৈতিক লক্ষ্যের তুলনা করা যাক। ১৯৫৯ সালে বেলজিয়ান ঔপনিবেশিক নীতির রাজনৈতিক লক্ষ্য পরিবর্তিত হবার আগে পর্যন্ত কঙ্গো ও রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির বেলজিয়ান শাসকেরা কখনও তাঁদের অধীনস্থ দেশের স্বাধীনতার কথা ভাবতে পারতেন না। এ বিষয়ে

পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক নীতিও বেলজিয়ান নীতির দোসর ছিল। পর্তুগাল ও বেলজিয়ান এই দুই দেশের অধীনস্থ অঞ্চলগুলোর আলাদা সত্তা বলতে কিছু ছিল না, তাদের বলা হত পর্তুগাল ও বেলজিয়ামের সাগর-পারের জেলা। পর্তুগীজ শাসনতন্ত্রের ১৩৫ ধারায় স্পষ্টই বলা হয়েছে উপনিবেশ-গুলো হল পর্তুগীজ রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আঙ্গোলা, মোজাম্বিক ও বেলজিয়ামের কোন খুদে জেলাশাসকের সঙ্গে। শুধু তফাত ছিল এই যে, 'জেলা-শাসক' অর্থাৎ গভর্নর বা গভর্নর জেনারেল এখানে বিদেশী। এবং 'জেলা' অর্থাৎ উপনিবেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। একদিকে বৃটিশ নীতি অন্যদিকে পর্তুগীজ ও বেলজিয়ান ঔপনিবেশিক নীতি: এই দু'য়ের মাঝামাঝি ছিল ফরাসী ঔপনিবেশিক নীতি (১৯৫৮ সালে পঞ্চম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে)। সাধারণভাবে ফরাসী উপনিবেশগুলির পৃথক সত্তা কখনও অস্বীকার করা হয় নি (ব্যতিক্রম আলজেরিয়া ও কয়েকটি ছোট ছোট অঞ্চল)। রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে উপনিবেশের জনসাধারণ পুরোপুরি বঞ্চিতও ছিল না। কিন্তু ফ্রান্সের সঙ্গে সমস্ত শাসনতান্ত্রিক বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার ১৯৫৮ সালের আগে কোন উপনিবেশ পায় নি। ফরাসী নীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল উপনিবেশের মানুষদের ফরাসী বানানো; ফরাসী ভাষায় তাই তাদের শিক্ষা দেওয়া হত, ফরাসী রীতিনীতি, আদবকায়দা শেখানো হত। শিক্ষিত ও কেতাদুরস্ত হয়ে উঠলে খাস ফ্রান্সের লোকদের সঙ্গে মোটামুটি সমান অধিকার উপনিবেশের অফরাসী অধিবাসীরাও পেত। এই ফরাসীকরণ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপনিবেশগুলিকে ফরাসী ইউনিয়ন ত্যাগের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। সত্যি তো, এত কষ্ট করে সাম্রাজ্যের কালো ও বাদামী লোকদের যখন ফরাসী বানানো হল, তখন আবার ওদের ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে চলে যেতে দেওয়া কেন?

সে যাই হোক, এই সব রাজনৈতিক লক্ষ্য অনুসারে ইওরোপীয় শাসকেরা তাদের আফ্রিকান সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেছে। বেলজিয়ান ও পর্তুগীজ উপনিবেশে এমন কি সুদূর ভবিষ্যতেও স্বাধীনতা দেবার কথা ওঠে নি। সুতরাং বেলজিয়ান কঙ্গো, মোজাম্বিক ও আঙ্গোলাতে আফ্রিকানদের ভোট দেবার প্রতিনিধি পরিষদে নির্বাচিত হবার ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার অধিকার দেওয়ার প্রশ্ন ছিল না। পর্তুগীজ আফ্রিকায় অবশ্য

তথাকথিত 'আসিমিলাডো'দের পর্তুগালের জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হয়। 'আসিমিলাডো' পদবাচ্য হতে গেলে আফ্রিকানদের পর্তুগীজ ভাষা শিখতে হয়, খৃষ্টান হতে হয়, এবং নিজেদের আচার-ব্যবহার সযত্নে পরিহার করে ইওরোপীয় ধরনে জীবনযাপন করতে হয়। কিন্তু ১৯৫০ সনের হিসাবে দেখা যায়, ৫০০ বছরের শাসনের পর ৪০ লক্ষ লোকের দেশ আঙ্গোলায় মাত্র ৩০,০০০ অধিবাসী 'আসিমিলাডো' হয়েছে। এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ হল বর্ণসঙ্কর। মোজাম্বিকের অবস্থা আরও খারাপ। সেখানে, ৫৬ লক্ষের বেশী অধিবাসীর মধ্যে ১৯৫০ সালে 'আসিমিলাডো'দের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪,৪০০। সংখ্যাল্পতার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, 'আসিমিলাডো'রা তাদের নিজের নিজের দেশে শাসনক্ষমতার কোন ভাগ পায় নি। কারণ পর্তুগীজ আফ্রিকায় প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনপ্রতিষ্ঠান বলতে কিছু নেই যেখানে দেশের জনসাধারণ তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে পাঠাতে পারে এবং যার মারফত আইন প্রণয়ন কিংবা শাসন পরিচালনা করা হয়।

বেলজিয়ান কঙ্গোর অবস্থা ১৯৫৮ সালের আগে পর্তুগীজ আফ্রিকার তুলনায় আরো খারাপ ছিল। শাসন কিংবা শাসন কাজে সাহায্য করার জন্যে সাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সেখানে ছিল না। পর্তুগীজ আফ্রিকার 'আসিমিলাডো' ব্যবস্থার মতো এখানে 'ইম্মাত্রিক্যুলাসিঅঁ, ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, যার কল্যাণে কতকগুলো বিশেষ শর্ত পূরণ করে আফ্রিকানরা কয়েকবিষয়ে ইওরোপীয়দের সঙ্গে সমান নাগরিক অধিকার পেত। কিন্তু ব্যবস্থার মারফত তাদের কোন রকমের রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় নি। ভোটের অধিকারের কথাই ওঠে না। কারণ খাস বেলজিয়ান সাহেবদের কঙ্গোর শাসন চালাবার জন্যে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা ছিল না। সব চেয়ে মজার কথা হচ্ছে : ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মাত্র ৪৫২ জন আফ্রিকান 'ইম্মাত্রিক্যুলাসিঅঁ'-এর প্রমাণ স্বরূপ 'কার্ত দ্যু মেরিত সিভিক' পায়। অবশ্য এদের মধ্যে কাউকে কাউকে গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টা পরিষদে স্থান দেওয়া হত। কিন্তু উপদেষ্টা পরিষদের সত্যিকারের শাসনক্ষমতা কিছু ছিল না। এবং 'ইম্মাত্রিক্যুলাসিঅঁ' শেষ করা আফ্রিকানদের সে পরিষদে জন-নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আসতে হত না। তাদের মনোনয়ন করতেন সরকারী কর্তৃপক্ষ।

আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশগুলিতে (চতুর্থ প্রজাতন্ত্রে) অবশ্য কিছু কিছু প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। ফরাসী-শাসিত প্রতি অঞ্চলে একটি করে আঞ্চলিক পরিষদ থাকত। তার প্রধান কাজ ছিল অর্থসংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা (যেমন বাজেট পাসকরা ইত্যাদি)। উপনিবেশের জন্য আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা প্রধানতঃ ফ্রান্সের আইনসভার হাতে ছিল।

প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশী উন্নত স্তরে পৌছায় বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলে। আগেই বলা হয়েছে বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতির চরম রাজনৈতিক লক্ষ্য হচ্ছে উপনিবেশগুলোকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া। আজকের পৃথিবীতে যাতে উপনিবেশের জনসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে কাজে লাগাতে পারে সে জন্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেবার আগে চাই উপযুক্ত প্রস্তুতি। কোন বৃটিশ উপনিবেশের সংবিধান বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে উপনিবেশটি মোটামুটি নীচের কয়েকটি স্তরের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতার পথে এগিয়েছে: (ক) সর্বপ্রথমে উপনিবেশ দখলের পর কিছুদিনের জন্য সামরিক শাসন প্রবর্তন। যে সব অঞ্চল কোন বেসরকারী চার্টার্ড কোম্পানী (যথা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) দখল করেছে, সেখানে কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, যতদিন না বৃটিশ পার্লামেণ্ট সে অঞ্চলের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে। (খ) গভর্নরকে সাহায্যের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ গঠন। (গ) উপদেষ্টা পরিষদের আইন পরিষদে রূপায়ন। (ঘ) আইন-পরিষদে অল্পসংখ্যক বেসরকারী সদস্য নিয়োগ। (ঙ) আইন-পরিষদের বেসরকারী সদস্যদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা। (চ) আইন-পরিষদে বেসরকারী (নির্ধারিত ও মনোনীত) সদস্যদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ। (ছ) আইন-পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। (জ) দায়িত্বশীল সরকারের প্রতিষ্ঠা। (ঝ) আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন অধিকার দান। (ঞ) পূর্ণ স্বাধীনতা।

প্রতি পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে (প্রধানতঃ আইন-পরিষদ) উত্তরোত্তর বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়। (ঝ) ও (ঞ)-তে এসে গভর্নরের হাতে ন্যস্ত অতিরিক্ত ক্ষমতা ও বৃটিশ পার্লামেণ্টের ক্ষমতা উপনিবেশের অধিবাসীদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। উপনিবেশ আনুষ্ঠানিক স্বরাজ পায়।

আমরা অবশ্য বলতে চাই না, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিঃস্বার্থভাবে উপনিবেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করে। আগেই বলা হয়েছে

সব উপনিবেশিক নীতির মূল লক্ষ্য হল, উপনিবেশে নিজদের স্বার্থসংরক্ষণ। কখনও কখনও অত্যন্ত স্থূল ও ক্রূর স্বৈরাচারী শাসন পরিচালনার মাধ্যমে এমন স্বার্থরক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু যখন তা অসম্ভব হয়ে পড়ে তখনই প্রয়োজন হয় উপনিবেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে আপোস করার, দরকার হলে তাকে স্বীকার করে নিয়ে তার হাতে সমস্ত শাসন ক্ষমতা তুলে দেবার। মুক্তি আন্দোলন কোন স্তরে উঠলে আর প্রত্যক্ষ শাসন চলবে না। তার সঙ্গে রফা করতে হবে, অন্য রকমের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিনিময়ে বিনা রক্তপাতে তার হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দিতে হবে, ঝানু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সযত্নে এসবের হিসাব করে থাকে।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতির তুলনায় ফরাসী ঔপনিবেশিক নীতি (চতুর্থ প্রজাতন্ত্র পর্যন্ত) অনেক বেশী কেন্দ্রানুগ। পূর্বেই বলা হয়েছে, পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের জন্মের আগে পর্যন্ত ফরাসী উপনিবেশগুলির ফরাসী ইউনিয়ন ছেড়ে যাওয়ার অধিকার ছিল না। কোন উপনিবেশ সবচেয়ে বেশী যা আশা করতে পারত তা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদ যার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের পার্লামেণ্টে এবং ফরাসী ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকারও উপনিবেশগুলিকে দেওয়া হয়। অর্থাৎ ফ্রান্সের অন্যান্য প্রতিনিধির সঙ্গে পাশাপাশি বসে ফ্রান্স তথা ফরাসী সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণ করার ক্ষমতা উপনিবেশের প্রতিনিধিরা পেতেন। এর ফল হয়েছিল এই যে ফরাসী সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ফ্রান্সের রাজনৈতিক সংগঠনগুলো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করত। ফ্রান্সের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে উপনিবেশের শ্রমিক আন্দোলন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ফরাসী রাজনৈতিক দলের শাখা উপনিবেশে স্থাপিত হয়েছে। ফরাসী নেতারা ঔপনিবেশিক অধিবাসীদের আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পক্ষান্তরে উপনিবেশের নেতারা খোদ ফ্রান্সের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করেছেন। যুদ্ধোত্তর গী মোলে মন্ত্রিসভায় আইভরী কোস্টের নেতা শ্রীহুফুয়ে বোয়াঞি মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। এর সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে শিক্ষিত আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্য নীতির প্রয়োগ ফরাসী উপনিবেশে প্রায় অজ্ঞাত ছিল।

ফরাসী আফ্রিকান সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক সংগঠনগুলো (এমন কি চরম বামপন্থী রাসঁম্বল্যমা দেমোক্রাতিক আফ্রিকা পর্যন্ত) কেন ফরাসী ইউনিয়ন

থেকে পৃথক হয়ে যাবার আন্দোলন করে নি তার খানিকটা ব্যাখ্যা ওপরের আলোচনা থেকে পাওয়া যাবে।

তিন

ঔপনিবেশিক নীতির রাজনৈতিক লক্ষ্য, প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব, তার ক্ষমতা, সে প্রতিষ্ঠানে আফ্রিকানদের অংশগ্রহণ, নির্বাচন অথবা মনোনয়ন কিভাবে সে ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়: এ সব ঔপনিবেশিক মুক্তিসংগ্রামের গতি-প্রকৃতি অনেকাংশে নির্ণয় করে। কিন্তু এ ছাড়া ঔপনিবেশিক নীতির অন্য কতকগুলি দিক আছে উপনিবেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর যাদের প্রভাব নেহাত কম নয়।

যেমন ধরা যাক উপনিবেশের সনাতন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ঔপনিবেশিক সরকারের মনোভাব। অন্য অনেক বিষয়ের মত এখানেও মতৈক্যের অবকাশ কম, যদিও কমবেশী সর্বত্রই বিদেশী শাসকেরা প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার সাহায্য নিয়েছে। পর্তুগীজ আফ্রিকায় স্থানীয় শাসনে 'রেগুলো' বা উপজাতীয় প্রধানদের সাহায্য নেওয়া হয়। অবশ্য কখনও কখনও রাজপরিবারের লোককে না নিয়ে, যুদ্ধফেরত সৈন্য বা পেন্সন-পাওয়া কর্মচারীদের 'রেগুলো' হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। 'রেগুলো'রা সরকারের বেতনভুক, বিবাদ-বিসম্বাদের আপোস মীমাংসা করার অধিকার তাদের আছে, নিজের অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলে উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে জানানো (অর্থাৎ সসম্মানে গুপ্তচরের কাজ করা), গ্রামের মোড়লদের কাজ তদারক করা: এসব হল 'রেগুলো'দের দায়িত্ব। পর্তুগীজ আফ্রিকায় আফ্রিকানদের জন্য আলাদা করে কোন আদালত নেই। তবে যদি কোন দেওয়ানী মামলায় বাদী-প্রতিবাদী উভয়পক্ষ আফ্রিকান হয় তাহলে স্থানীয় উপজাতি-প্রধানদের ডাকা হয় যাতে তাঁরা মামলার বিষয়ে স্থানীয় প্রথা কী সে বিষয়ে বিচারককে জানাতে পারেন।

পর্তুগীজ আফ্রিকার মত বেলজিয়ান কঙ্গো ও রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডিতেও প্রাক্-ইওরোপীয় যুগে প্রচলিত আফ্রিকান শাসন কাঠামোকে বেলজিয়াম-প্রতিষ্ঠিত ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয় নি। বেলজিয়ান শাসকেরা বলতেন তাঁদের এলাকায় উপজাতিদের মধ্যে যে সামাজিক ও

রাজনৈতিক কাঠামোর পরিচয় তাঁরা পেয়েছেন, এ-যুগের সরকারী কাজে তা অচল। এটা অসম্ভব কিছু নয় যে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কঙ্গোর গহন বিষুবরৈখিক অরণ্যে যারা থাকে সভ্যতার মাপকাঠিতে হয়ত তারা আফ্রিকার অন্য অঞ্চলের লোকদের চেয়ে পশ্চাৎপদ ছিল। কিন্তু কঙ্গো নদীর মোহনায় আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে প্রাক্ ইওরোপীয় যুগে যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী এক রাজ্য ছিল এ কথা আমরা সবাই জানি। এ রাজ্য—যার নাম ছিল কঙ্গো—পর্তুগালের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং অনেকদিন পর্যন্ত নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখে। সুতরাং কঙ্গোর অধিবাসীদের প্রাক্-ইওরোপীয় রাজনৈতিক কাঠামো এত নীচু স্তরের যে তাকে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের কাজেও লাগানো যায় না, এ কথা পুরোপুরি সত্য নাও হতে পারে। খুব সম্ভবতঃ কঙ্গোর অধিবাসীদের উপজাতীয় শাসন-কাঠামোর অনেকখানি নষ্ট হয়েছে স্বাধীন কঙ্গো রাষ্ট্রের শাসনকালে (১৮৮৫-১৯০৮) যখন বেলজিয়ান বণিক ও ব্যবসায়ীদের হাতে কঙ্গোর অধিবাসীগণ নির্মমভাবে শোষিত হয় ও গাঁ কে গাঁ উজাড় হয়ে যায়। তার ফলে উপজাতীয় ঐক্য ও শাসন-কাঠামো ভেঙে পড়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।

যাই হোক শেষদিকে এ অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন আসে। ১৯০৬ সালের এক আইনের বলে উপজাতি-প্রধানদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাঁরা কয়েকটি ক্ষেত্রে বিচার করবার ক্ষমতা পান। কোন আফ্রিকান যদি তার উপজাতি এলাকা ছেড়ে এক মাসের বেশী অন্য জায়গায় থাকতে চায় তবে স্থানীয় প্রধানদের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নেবার ব্যবস্থা হয়। ১৯৩৩ সনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রধানদের আদেশ জারী করার ক্ষমতা দেওয়া হল। একই সময় কিছু অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতাও তাঁরা পেলেন।

১৯০৬ সাল থেকে উপজাতিপ্রধান-শাসিত এলাকা বা 'শেফেরি' বাড়তে থাকে। ১৯০৯ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে এদের সংখ্যা প্রায় ৬ গুণ বাড়ে। অবশ্য এদের মধ্যে অনেকগুলি ছিল আয়তন ও লোকসংখ্যায় দুর্বল। কোন কোন 'শেফেরি'তে ৫০ জনেরও কম ট্যাক্সদাতা ছিল। ১৯২০ সাল থেকে ছোট 'শেফেরি'গুলোকে এক করে আরো বড় শাসন-এলাকার (সেক্ত্যর) পত্তন করা হয়। স্বাধীনতার আগে প্রতি 'শেফেরি' ও 'সেক্ত্য'রে একটি করে উপদেষ্টা পরিষদ স্থাপিত হয় যেখানে সম্মানিত বৃদ্ধরা মিলিত হয়ে নানা বিষয়ে প্রধানকে পরামর্শ দিতেন।

ইদানীং বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মধ্যকার প্রভেদ কমে আসলেও অতীতে এদের পার্থক্য খুব স্পষ্ট ছিল। ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন (এমন কি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনেও) কেন্দ্রীকরণের ছাপ রয়েছে। উপজাতি-প্রধানদের যে এখানে শাসনকার্যে লাগানো হয় নি তা নয়। ১৯৩৭ সালের হিসাবে দেখা যায়, ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকায় ছোট বড় মিলিয়ে ৫০,০০০এরও বেশী উপজাতি-প্রধান ছিল। কিন্তু বৃটিশ আফ্রিকার প্রধানদের তুলনায় এদের ক্ষমতা খুবই সীমিত থাকে। সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ পালন হল ফরাসী আফ্রিকার প্রধানদের সবচেয়ে বড় কাজ। এর ফলে অনেক সময় এঁদের শাসনকে 'প্রত্যক্ষ' শাসন বলা হয়েছে। (বৃটিশ আফ্রিকায় উপজাতীয় প্রধানদের দ্বারা চালিত স্বায়ত্তশাসনকে অনেক সময় 'পরোক্ষ' শাসন বলা হয়)।

বৃটিশ রাষ্ট্রনেতারা বলতেন, আফ্রিকান উপনিবেশে তাঁদের প্রচলিত স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বেলজিয়ান, পর্তুগীজ ও ফরাসী ব্যবস্থা থেকে মূলত পৃথক। লর্ড হেইলির ভাষায় ইংল্যাণ্ড প্রবর্তিত 'পরোক্ষশাসন' হল এমন এক ব্যবস্থা "যেটা ঔপনিবেশিক সরকার—যার ইওরোপীয় শাসনকেন্দ্র সংখ্যায় সীমিত—কতকগুলো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য শাসনযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। এই উদ্দেশ্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল : আফ্রিকানদের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, এসব উপজাতীয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান, আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, আফ্রিকানদের ওপর কর বসানো ও আদায় করা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা এবং যে সব মামলায় বাদী-প্রতিবাদী দুই পক্ষ আফ্রিকান এমন বিবাদ মীমাংসার জন্য আদালত স্থাপন করা।"

'পরোক্ষ শাসন' কথাটা ব্যাপকতর অর্থে নিলে এমন ব্যবস্থা আগেও প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের শেষে ফরাসী রাষ্ট্রনেতা লিওতে ফরাসী ইন্দোচীনের জন্য এমন এক শাসন প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। গোল্ডি তৎকালীন রয়্যাল নাইজার কোম্পানীর শাসিত এলাকায় এই রকমের শাসন ব্যবস্থার কথা তোলেন। ১৮৯৩ সালে লর্ড লুগার্ড উগাণ্ডায় পরোক্ষ শাসন স্থাপনের কথা বলেন। ডাচ-অধিকৃত ইন্দোনেশিয়ার অনেক অঞ্চলে স্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষের মারফত সরকারের কাজ চালানো হত। তবে আফ্রিকার বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে খুব ব্যাপকভাবে পরোক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত

করা হয়েছে, সেখানে উপজাতীয় প্রধানদের হাতে অনেক বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সরকার ও প্রধানদের এক্তিয়ার স্পষ্টভাবে পৃথক করা হয়েছে। এবং সবশেষে শাসনকে একটা আদর্শগত ভিত্তি দেওয়া হয়েছে।

অবশ্য কী অবস্থায় বৃটিশ আফ্রিকায় পরোক্ষ শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল সে কথা মনে রাখলে আমরা আদর্শের কথা বাদ দিতে পারি। মার্জারি পেরহাম নাইজেরিয়ায় পরোক্ষ শাসনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, সে দেশে যখন প্রথম বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হল তখন ইংরেজ শাসকদের না ছিল লোকবল, না অর্থবল। নাইজেরিয়ার মত বিরাট দেশে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাবার কোন আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা ছিল না। তার ওপর বিদেশী শাসকেরা নাইজেরিয়ার লোকদের ভাষা, আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে খুবই কম জ্ঞান রাখতেন। কাজেই উপজাতীয় শাসকদের মারফত সরকারের কাজ না চালিয়ে উপায় কী? ঐতিহাসিক ক্রোকার তাই ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের পরোক্ষ শাসনের আসল রূপটি বে-আব্রু করে সকলের সামনে তুলে ধরে বলেছেন, নিছক শাসন পরিচালনার "সুবিধাকে বনিয়াদ করে আদর্শের বিরাট ইমারত গড়ে তোলা হল।"

আদর্শের বিরাট সৌধের ফাঁক দিয়ে এই শাসনব্যবস্থার ব্যবহারিক উপযোগিতা অনায়াসে দেখা যায়। প্রথমতঃ অন্তর্বর্তীকালে উপজাতীয় প্রধানদের ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে অনুগত ও বাধ্য করা হয়। এবং তার ফলে সাধারণ মানুষের আনুগত্য সহজে মেলে। খরচের দিক থেকেও পরোক্ষ শাসন সস্তা এবং অল্প সংখ্যক শাসক ও কর্মচারী দিয়ে চালানো যায়। ১৯২৫ সালে তদানীন্তন ট্যাঙ্গানাইকার গভর্নর শাসনকর্মচারীদের এক সভায় খোলাখুলি বলেন, "স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিষ্ঠানগুলি নষ্ট করার মানে কী? আমাদের এখন যত কর্মচারী আছে, তার সংখ্যা যদি আমরা ৪ গুণও বাড়াই, তবু সরাসরি বৃটিশ কর্মচারী দিয়ে সারা দেশ শাসন আমাদের পক্ষে অসম্ভব।" তাছাড়া পরোক্ষ শাসনে উপজাতীয় নেতারা উপনিবেশিক সরকার ও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে থাকেন বলে সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের সোজাসুজি সংঘর্ষ বাধতে পারে না। সরকারের নতুন নতুন নীতি উপজাতির নেতাদের মাধ্যমে প্রয়োগ করার ফলে নতুন নীতি গ্রহণের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে মানসিক প্রতিবন্ধক থাকে তবে জোর কমে যায়। এবং জনসাধারণ সেটা সহজে গ্রহণ করতে পারে। তা ছাড়া

পরোক্ষ শাসনের মজা হচ্ছে এই যে এখানে আসল ক্ষমতা না ছেড়ে এমন ভাব দেখানো যেতে পারে যেন মনে হবে উপনিবেশের লোকরা দেশ শাসন করছে।

যে পরোক্ষ শাসনের এত সুবিধা সে-ব্যবস্থা যে বিভিন্ন অঞ্চলে চালু হবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই, আফ্রিকার সমস্ত উপনিবেশে ইংরেজ শাসকেরা এক ধরনের পরোক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। তার কারণ হল, পরোক্ষ শাসন যে উপজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্ভরশীল তারা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়েছে। যেমন নাইজেরিয়ার উত্তরাংশে সনাতন রাজনৈতিক কাঠামো উন্নত স্তরের সুতরাং ঔপনিবেশিক শাসকদের পক্ষে মৌলিক পরিবর্তন ছাড়াই তাদের কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। পক্ষান্তরে নাইজেরিয়ারই পূর্বাংশ উপজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আয়তন ও লোকসংখ্যার দিক থেকে ক্ষুদ্রকায়, অংশতঃ এই কারণে এই অঞ্চলের স্থানীয় শাসন ভিন্নধর্মী হয়েছে।

অবশ্য বলা যেতে পারে যে, সনাতন উপজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরোক্ষ শাসনের বাহক হিসাবে জীইয়ে রাখা মানে উপজাতীয় প্রধানদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে বাঁচিয়ে রাখা, অর্থাৎ উল্টোভাবে বলা যায়, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের নেতৃত্বের পথে বাধা সৃষ্টিকরা। ঘানার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখব যে রাজনৈতিক নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত ও ব্যবসায়ীরা উপজাতীয় প্রধানদের কাছ থেকে অনেক বাধা পেয়েছে। আফ্রিকায় যারা নতুন সমাজ (এমন সমাজ যা উপজাতীয় সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করবে) গড়বে তারা হচ্ছে বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত, নিজের জমির মালিক সম্পন্ন চাষী ও ব্যবসায়ী। পরোক্ষ শাসনের মারফত উপজাতির প্রধানদের শক্তিশালী করা মানে পরোক্ষভাবে নতুন সমাজ গড়ার পথে বাধা সৃষ্টি করা।

চার

উপনিবেশের রাজনীতিতে ঔপনিবেশিক নীতির যে অন্য একটি দিকের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সহজে লক্ষ্য করা যায়, তা হচ্ছে উপনিবেশে ইওরোপীয়দের স্থায়ীভাবে বসতি করতে দেওয়া বা না দেওয়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে

পর্যন্ত পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু অঞ্চল (যথা কেনিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকান ইউনিয়ন, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা) বাদ দিলে আফ্রিকা মহাদেশের (সাহারার দক্ষিণে) অন্যান্য অঞ্চল ইওরোপীয়দের স্থায়ীভাবে বাস করার অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বেলজিয়ান কঙ্গো, পর্তুগীজ আফ্রিকা ও ভূতপূর্ব ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকায় নতুন করে ইওরোপীয়দের আসা শুরু হয়েছে। কিন্তু পর্তুগীজ আফ্রিকা বাদ দিলে এই সব ইওরোপীয় আগন্তুকেরা প্রধানতঃ কারিগর, এঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য পেশার লোক। অর্থাৎ এঁরা জমি কিনে উপনিবেশে স্থায়ী বাসিন্দা বনে যাবেন এমন সম্ভাবনা কম। সুতরাং ইওরোপীয়েরা স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছেন এমন দেশের সংখ্যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও বিশেষ বাড়ে নি। কোন এক দেশে ইওরোপীয়রা থাকলেই যে সেখানকার সমস্যা জটিলতর হবে এমন কোন কথা নেই। প্রশ্ন হচ্ছে: যে ইওরোপীয়েরা আছেন তাঁরা কী ভাবে আছেন? তাঁরা যদি জমি কিনে (হয় বিরাট বিরাট এলাকা আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করে কিংবা আখ, কফি, রবার ইত্যাদির বাগিচা করে) পুরুষানুক্রমে সেখানে বসতি করেন, তবে সে উপনিবেশে তাঁদের কায়েমীস্বার্থ দাঁড়িয়ে গেছে বলতে হবে। সেক্ষেত্রে তাঁরা সেই উপনিবেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন থাকবেন না। প্রায় সর্বত্রই তাই দেখা যায় সেখানেই স্থায়ী ইওরোপীয় বাসিন্দা আছেন সেখানেই স্থাপিত হয়েছে তাঁদের রাজনৈতিক সংগঠন। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সংগঠনগুলি আফ্রিকানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পথে চরম বাধাস্বরূপ। কেনিয়া ও মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ইতিহাস আমাদের বক্তব্যের জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ট্যাঙ্গানাইকার স্বরাজের পথে সেখানকার ইওরোপীয় বাসিন্দারা খুব বেশী প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করতে পারে নি, তার একটা কারণ ট্যাঙ্গানাইকা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধীনে অছি অঞ্চল হিসাবে শাসিত হয়। আর দ্বিতীয় কারণ হয়তো এই যে ট্যাঙ্গানাইকার ইওরোপীয় বাসিন্দাদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য কম, যেহেতু ইংরেজ ছাড়াও সেখানে জার্মান (প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ট্যাঙ্গানাইকা জার্মান উপনিবেশ ছিল) গ্রীক ইত্যাদি অন্যান্য ইওরোপীয় সম্প্রদায় ছিল। প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক বাধা সৃষ্টি ছাড়াও ইওরোপীয় বসতিস্থাপনের ফলে কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে অনেক আফ্রিকান

চাষীকে জমি থেকে বঞ্চিত করে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত করা হয়েছে। এবং এমনি করে ইওরোপীয় বিরোধী রোষানলে ইন্ধন যোগানো হয়েছে। কেনিয়ার মাউ মাউ আন্দোলনের একটা বড় কারণ যে ভূমিহীন কিকিয়ুর ক্ষোভ ও অসন্তোষ একথা সকলে স্বীকার করেন।

ঔপনিবেশিক নীতিকে ব্যাপকার্থে গ্রহণ করলে তার মধ্যে উপনিবেশের অর্থনৈতিক প্রগতি সম্বন্ধে সরকারী মনোভাব ও আলোচ্য বিষয় হয়। আফ্রিকার বিভিন্নাংশে অর্থনৈতিক প্রগতি একছারে এগোয় নি। প্রাকৃতিক সম্পদ সব দেশে সমানভাবে ছড়িয়ে না থাকায় অর্থনৈতিক বিকাশ অবশ্য অসম হতে বাধ্য। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়া অন্য কারণও এর জন্যে দায়ী। প্রথমতঃ যে ইওরোপীয় দেশ উপনিবেশের শাসনভার নিয়েছে তার লোকবল ও অর্থনৈতিক মান (যার ওপর নির্ভর করছে উপনিবেশের অর্থনৈতিক সম্পদ কাজে লাগানোর ক্ষমতা) অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণে উপনিবেশের অর্থনৈতিক প্রগতির গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করবে। আঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের কথা ধরা যাক। বিশেষ ঐতিহাসিক কারণে এই দুই দেশে পর্তুগীজ শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু বিরাট বিরাট এই দুই দেশের অর্থনীতি গড়ে তোলার সামর্থ্য পর্তুগালের নেই। পর্তুগালের লোকসংখ্যা ৮০ লক্ষের মত কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে বোধ হয় এখন তার স্থান ইংল্যাণ্ডের পরেই। পর্তুগালের নিজের অর্থনীতি ইওরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পেছিয়ে আছে। এরকম অবস্থায় পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক নীতির মূল লক্ষ্য হয়েছে উপনিবেশে তার যেটুকু কাজ করা। এর ফলে ২য় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পর্তুগীজ আফ্রিকায় ইওরোপীয়দের নতুন জমি সংগ্রহ করে বসতি স্থাপন খুব সামান্য এগিয়েছে। কৃষি ও শিল্পের স্থাণুত্ব ঘোচে নি। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত মোজাম্বিক কোম্পানী ৫২,০০০ বর্গমাইল ব্যাপী বিরাট এক অঞ্চলে শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণ দুইই চালিয়ে এসেছে (যা ঔপনিবেশিক সরকারের কিছু না করার নীতির আর এক পরোক্ষ প্রমাণ)।

পর্তুগীজ আফ্রিকার অর্থনৈতিক স্থাণুত্ব যে সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করেছে সে কথা বলা বাহুল্য। পর্তুগীজ আফ্রিকায় পুরোনো উপজাতীয় অর্থনীতির ওপর আধুনিক অর্থনীতি এখনও ভাল করে গড়ে ওঠে নি। অর্থাৎ নতুন অর্থনীতি গড়ে ওঠার ফলে অন্যত্র

যে সমস্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে (যেমন ঘানা, উগাণ্ডা ও নাইজেরিয়ায় সম্পন্ন-চাষী, সেনেগাল ও ঘানার বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত, দক্ষিণ আফ্রিকান ইউনিয়ন ও মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে শহরে বিত্তহীন শ্রমিকশ্রেণী), তার জন্ম পর্তুগীজ আফ্রিকায় হয় নি। মুক্তি আন্দোলনে এই সব শ্রেণী উপজাতীয় সঙ্কীর্ণতার বেড়া কাটিয়ে সারা দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারে সে কথা অন্যত্র বলা হয়েছে। আঙ্গোলা-মোজাম্বিকে রাজনৈতিক আন্দোলন পেছিয়ে থাকার একটা বড় কারণ যে সেখানকার অর্থনৈতিক স্থাণুত্ব, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম।

অর্থনৈতিক বিকাশ বনাম স্থাণুত্ব ছাড়া, সে বিকাশের গতি অর্থাৎ হার এবং তার প্রকৃতি ও উপনিবেশের মুক্তি আন্দোলনের চরিত্র কিছুটা পরিমাণে নির্ধারিত করে। অতিদ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে কতকগুলি বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। যথা, শহরে খুব লোক বেড়ে যাওয়ায় বাসস্থানের অসুবিধা, স্ত্রী-পুরুষ সংখ্যার অসম-অনুপাত যার আংশিক ফল হল যৌনাপরাধ ও নৈতিক অবনতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা ইত্যাদি। ইদানীং এই ধরনের সমস্যা শহরে আফ্রিকানদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। তার উদাহরণ কঙ্গো (ভূতপূর্ব বেলজিয়ান কঙ্গো), মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের সাম্প্রতিক ইতিহাসে অনেক পাওয়া যাবে। এই সব বিক্ষোভকে খুব সহজেই রাজনৈতিক আন্দোলনের ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যদিও দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ হলেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে এমন কোন কথা নেই, তবু ঔপনিবেশিক সরকার জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ও দায়িত্বশীল নয় বলে শাসকেরা এ ধরনের সমস্যার গুরুত্ব প্রায়ই উপলব্ধি করে না। এবং বিশেষ করে পরাধীন দেশে এই সব সমস্যা সহজেই জনবিক্ষোভে ফেটে পড়তে পারে।

অর্থনৈতিক বিকাশ কোন পথে চলছে তার ওপর রাজনৈতিক আন্দোলন অনেকাংশে নির্ভরশীল। নাইজেরিয়া ও ঘানার দক্ষিণাংশের কথা ধরা যাক। এসব অঞ্চলে কোকো ও উদ্ভিজ্জ তৈল ভিত্তি করে নতুন অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। ছোট ছোট এলাকায় এ সব জিনিসের চাষ করতে হয়। তার ফলে এই দুই দেশে নিজেই জমির মালিক এমন এক সম্পন্ন কৃষক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে ও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ও সমৃদ্ধির প্রসার হয়েছে। এই সম্পন্ন চাষীরা ধীরে ধীরে তাঁদের সম্পদ বাড়িয়েছে এবং তাদের কেউ কেউ অন্যত্র

মূলধন বিনিয়োগ করেছে। তাদের জীবনযাত্রার মান বেশ উঁচু: শহরে বাড়ি ও গাড়ি আর গ্রামে জমিজমা। পশ্চিম আফ্রিকার পূর্বতন বৃটিশ ও ফরাসী উপনিবেশগুলিতে রাজনৈতিক নেতাদের অনেকে এইসব শ্রেণী থেকে উদ্ভূত ঘানার মুক্তি আন্দোলনে স্থানীয় কাষ্ঠব্যবসায়ীরা ১৯৪৭ সালে ইউ. জি. সি. সি. (ইউনাইটেড গোল্ড কোস্ট কনভেনশ্যন) প্রতিষ্ঠার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করে। নাইজেরিয়ায় এন. সি. এন. সি. র (ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ নাইজেরিয়া এবং ক্যামেরুন্স) সঙ্গে পূর্ব নাইজেরিয়ার পরিবহন ব্যবস্থার মালিক, অন্য ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারদের যোগাযোগ স্পষ্ট।

যে সব দেশে কৃষির উন্নতির ফলে চাষীরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন সেখানে তাঁদের নিজেদের সংগঠন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে। আইভরী কোস্টে শ্রীহুফুয়ে বোয়াঞি 'স্যঁাদিকা আগ্রিকোল আফ্রিক্যাঁ' নামে এক কৃষক সংগঠনের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছেন। উগাণ্ডায় আফ্রিকান ফার্মার্স ইউনিয়ন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে।

কিন্তু অর্থনৈতিক প্রগতি হলেই যে রাজনৈতিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠবে এমন কোন কথা নেই। এই নিয়ম যদি সত্য হত তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমরা সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন দেখতে পেতাম, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার মত এত বেশী অর্থনৈতিক উন্নতি অন্য কোন আফ্রিকান দেশে হয় নি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে শুধু অর্থনৈতিক প্রগতি যথেষ্ট নয়। অনুধাবন করা দরকার সে প্রগতি কোন পথে এগিয়েছে, সে প্রগতিতে আফ্রিকান অধিবাসীরা কী ভূমিকা অভিনয় করেছে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া কেমন।

দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনৈতিক প্রগতিতে আফ্রিকানরা সর্বত্র অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রমিক সরবরাহ করেছে। এই শ্রমিকদের এক বিরাট অংশ বাগিচায় কাজ করে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাগিচায় ঘনিষ্ঠ সংযোগহীন শ্রমিকদের ঐক্য ও সংগঠন গড়ে তোলা দুঃসাধ্য। সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। খনি ও কারখানার শ্রমিকেরা বাগিচা ও রিজার্ভ এলাকার শ্রমিকদের তুলনায় অনেক বেশী রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন। এবং এঁরা হয়তো সে দেশের গণসংগ্রামকে আরো জোরদার করতে পারতেন। হয়তো অন্য দেশের তুলনায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিবাদ আন্দোলন আরো উঁচু পর্যায়ে উঠত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানে সমগ্র

রাষ্ট্রযন্ত্র এ ধরনের আন্দোলনের টুঁটি টিপে ধরার জন্য তৈরী। সামান্যতম পৌর ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে সেখানকার আফ্রিকান অধিবাসীরা বঞ্চিত।

সংক্ষেপে, অর্থনৈতিক বিকাশের গতি ও প্রকৃতি উপনিবেশের মুক্তি আন্দোলনকে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করে,—কিন্তু সবটা নয় অথবা অন্য নিরপেক্ষ-ভাবেও নয়।

পাঁচ

ঔপনিবেশিক নীতি যদি আমরা ব্যাপক অর্থে ধরি তবে শিক্ষা-সম্পর্কিত নীতিও তার মধ্যে পড়বে। স্বভাবতঃ উপনিবেশের জনসাধারণকে আদৌ শিক্ষা দেওয়া হবে কি না, হলে কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে, কোন্ ভাষার মাধ্যমে, ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান ঔপনিবেশিক নীতির উদ্দেশ্য অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। ফরাসী ঔপনিবেশিক নীতির লক্ষ্য হল আফ্রিকানদের 'ফরাসী' করে তোলা। শিক্ষাক্ষেত্রে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে যদি তাদের ফরাসী সংস্কৃতি ও সভ্যতা আকণ্ঠ পান করতে দেওয়া হয়। তাই ফরাসী উপনিবেশের শিক্ষানীতিতে ফরাসী সাহিত্য পড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়। নীচু ক্লাস থেকে ফরাসী ভাষা শেখানো হয় এবং যথাসম্ভব ফরাসী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। বৃটিশ উপনিবেশে অন্য ধরনের নীতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু এই শিক্ষানীতিও আবার বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন নয়। আমরা আগেই দেখেছি শাসন ক্ষেত্রে 'পরোক্ষ শাসন' বৃটিশ নীতির অন্যতম মূল স্তম্ভ। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা চালু আছে। 'পরোক্ষ শাসনে' স্থানীয় রাজনৈতিক ও শাসন সংস্থাগুলোকে ইওরোপীয়দের শাসন চালাবার উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হয়। একই ভাবে বৃটিশ শিক্ষানীতিতে স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতিকে আধুনিক শিক্ষার বাহন করার চেষ্টা করা হয়।

এর ফল এই হয়েছে যে আফ্রিকার বৃটিশ-অধিকৃত এলাকায় স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি অনেকটা এগিয়ে গেছে (উদাহরণ:—পূর্ব আফ্রিকায় সোয়াহিলি, পশ্চিম আফ্রিকায় হাউসা)। পক্ষান্তরে ফরাসী এলাকায় বুদ্ধিজীবিরা প্রধানতঃ ফরাসী ভাষায় নিজেদের চিন্তা-ধারণা প্রকাশ করেন; এবং সেখানকার অধিবাসীদের ভাষা বৃটিশ উপনিবেশের ভাষার তুলনায় অপেক্ষাকৃত অপরিণত থেকে গেছে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর এই পরিস্থিতির প্রভাব খুব স্পষ্ট। পৃথিবীর সব স্বাধীনতা আন্দোলনে দেখা যায় রাজনৈতিক সংগ্রামের দোসর হিসাবে কাজ করছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুক্তি সংগ্রাম। একটা দেশ, জাতি বা কোন জনসমষ্টির পুনরভ্যুত্থান সর্বাঙ্গীন হয়—সমাজ-জীবনের প্রতিটি দিক সে স্পর্শ করে। রাজনৈতিক আন্দোলন যেমন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোলনকে সাহায্য করে, তেমনি উন্নততর শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি রাজনৈতিক সংগ্রামকে নতুন হাতিয়ার দিয়ে সমর্থন যোগায়। এদিক থেকে বলা চলে বৃটিশ উপনিবেশে অনুসৃত শিক্ষানীতি সেখানকার স্বাধীনতা আন্দোলনকে পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে।

ছয়

এই পরিচ্ছেদে আমরা শুধু এইটুকু দেখাবার চেষ্টা করেছি যে ঔপনিবেশিক নীতি ও শাসন উপনিবেশের মুক্তি আন্দোলনের তীব্রতা, গতি ও প্রকৃতি কিছুটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে। এর প্রভাব কতদূর ব্যাপক, তার উত্তর দিতে আমরা অপারগ। ঔপনিবেশিক নীতি ও শাসন ছাড়া অবশ্য অন্য প্রভাবও আছে, যথা উপনিবেশের অধিবাসীদের সভ্যতার মান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ইত্যাদি। এদের মধ্যে কার অবদান সবচেয়ে বেশী সে আলোচনা আমাদের বিতর্কের গোলক ধাঁধায় নিয়ে যাবে। অতএব সে প্রসঙ্গ থাক। পরাধীন দেশের মুক্তি সংগ্রামের বিষয় বলতে গিয়ে ঔপনিবেশিক নীতি ও শাসনপদ্ধতির কথা আমরা প্রায় ভুলে যাই। আমাদের এই আলোচনা শুধু বলতে চায়, কোন উপনিবেশের স্বাধীনতা আন্দোলন কী ভাবে এবং কোন পথে এগোবে, সেটা অন্ততঃ কিছুটা নির্ভর করে ঔপনিবেশিক শাসনপদ্ধতির ওপর। এবং ঔপনিবেশিক নীতি ও শাসন ব্যবস্থাকে ব্যাপক অর্থে নিলে তার মধ্যে রাজনৈতিক লক্ষ্য, প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও ক্ষমতা, সনাতন সমাজ কাঠামো ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ঔপনিবেশিক শাসকের মনোভাব, উপনিবেশে ইওরোপীয়দের স্থায়ীভাবে বসতি করতে দেওয়া সম্পর্কে সরকারী নীতি, উপনিবেশের অর্থনৈতিক প্রগতি, তার বৈশিষ্ট্য ও হার এবং শিক্ষানীতি সবই এসে পড়ে। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উদাহরণ দিয়ে আমরা পূর্বোক্ত বক্তব্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি।

সপ্তম অধ্যায় : আন্তর্জাতিক জনমত, সংগঠন এবং আফ্রিকা

এক

আন্তর্জাতিক রাজনীতির শক্তি পরীক্ষায় আফ্রিকার দেশগুলি নানা কারণে পেছিয়ে ছিল। তাই বহির্বিশ্ব একাধিকভাবে আফ্রিকা মহাদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব নিয়ন্ত্রণ হয়েছে নিয়ন্ত্রকের স্থূল স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কিন্তু কখনও কখনও নিছক বিশ্বপ্রেমী সদিচ্ছার বশবর্তী হয়েও বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ আফ্রিকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হয়েছেন, তার কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের ব্রত নিজেদের হাতে নিয়েছেন। স্বভাবতঃ যতদিন বাইরের পৃথিবীর কাছে আফ্রিকা অজ্ঞাত কিংবা অর্ধজ্ঞাত ছিল, ততদিন এ মহাদেশ সম্বন্ধে বিদেশীদের ঔৎসুক্য সীমিত ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

ইতিমধ্যে ইওরোপীয় পর্যটক ও আবিষ্কারকরা আফ্রিকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে নানা খবর বয়ে আনছিলেন। লিভিংস্টোন ও স্ট্যানলের রোমাঞ্চকর অভিযান, দাসব্যবসায়ের নিষ্ঠুরতা, স্ট্যানলে-বর্ণিত বুগাণ্ডার সুসংবদ্ধ রাজ্যের কথা ইওরোপে বিশেষ ঔৎসুক্যের সঞ্চার করে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ামের রাজা লেওপোল্ড আফ্রিকা মহাদেশকে সভ্যজগতের সঙ্গে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে ব্রাসেল্‌সে এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারী, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী এবং রাশিয়া থেকে উৎসাহী পর্যটক এবং অন্য প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে মিলিত হলেন। এখান থেকে জন্ম নিল একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যার নাম দেওয়া হল আন্তর্জাতিক আফ্রিকা সঙ্ঘ (International Africa Association)।

এই সঙ্ঘের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকার অভ্যন্তর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য অভিযাত্রী দল প্রেরণ এবং আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যে ইওরোপীয় সভ্যতা প্রচার। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৭-৭৮ সালে সঙ্ঘ মধ্য

আফ্রিকায় অভিযাত্রীদল পাঠায়। ১৮৮০ সালে সঙ্ঘের উদ্যোগে একটি স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপন করা হয়—যেখান থেকে পর্যটক ও আবিষ্কারকেরা আফ্রিকার অজ্ঞাত অঞ্চলে প্রবেশ করবে।

আন্তর্জাতিক আফ্রিকা সঙ্ঘের সাফল্য অসামান্য হয়নি। কয়েকটি পর্যটকদল অবশ্য কিছু কিছু অঞ্চল সম্বন্ধে বাইরের জগতের জ্ঞানবৃদ্ধি করেছে। কিন্তু কিছুদিন বাদেই আন্তর্জাতিক আফ্রিকা সঙ্ঘ তার আন্তর্জাতিকত্ব হারাল এবং কার্যতঃ লেওপোল্ড-পৃষ্ঠপোষিত এক বেলজিয়ান সংগঠনে পরিণত হল। আফ্রিকায় 'সভ্যতা' প্রচার পর্যবসিত হল আবিষ্কৃত অঞ্চলে খৃষ্টধর্ম ও ইওরোপীয় পণ্য প্রচারে। তবু একাধিক রাষ্ট্র মিলে আফ্রিকা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অল্পদিনের জন্য হলেও সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন কার্যক্রম অনুসরণ এই প্রথম। এবং ১৮৭৬ সালের ব্রাসেল্‌স সম্মেলনের তাৎপর্য এইখানেই।

ব্রাসেল্‌স সম্মেলন (১৮৭৬) ও আন্তর্জাতিক আফ্রিকা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার পর কয়েক বছরের মধ্যে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ আফ্রিকায় (বিশেষতঃ কঙ্গো নদীর অববাহিকায়) রীতিমত সক্রিয় হয়ে উঠল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল, জার্মানী ও বেলজিয়াম প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের স্বার্থ সমন্বয়ের জন্য ১৮৮৪-৮৫ সালে বের্লিন শহরে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কঙ্গো ও নাইজার নদীর অববাহিকায় স্বাধীনভাবে বাণিজ্য এবং নৌবাহন ও মধ্য আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে পরস্পরের দাবি-দাওয়ার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ছাড়াও এই সম্মেলন থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে :

(ক) অতঃপর আফ্রিকার কোন অঞ্চল অধিকার করার আগে দখলকারী শক্তি অন্য সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করবে যাতে অন্যের দাবি আছে এমন এলাকায় আগন্তুক কোন দেশ ভাগ বসাতে না পারে।

(খ) কোন অঞ্চলে কার্যকরীভাবে অধিকৃত হলে তবেই শুধু সে এলাকা সম্বন্ধে দখলকারী কর্তৃপক্ষের আইন সঙ্গত দাবি গ্রাহ্য করা হবে।

আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় ইওরোপীয় শক্তিবর্গ আফ্রিকার মাটিতে যে কোন বড় রকমের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নি তার একটা কারণ বের্লিন সম্মেলনের এই সব সিদ্ধান্ত। কিন্তু সম্মেলনের এই সব দিক আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক নয়। পরের যুগের ম্যাণ্ডেট ও অছি ব্যবস্থার পূর্বসূরী হিসাবে সম্মেলনের যে দিকটা অভিনন্দিত হয়েছে সেটা নিয়ে এখন আলোচনা করা যাক।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টেম্পারলে বলেছেন, "ইতিহাসে ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার একমাত্র তুলনা মেলে ১৮৮৫ সালের বের্লিন-কঙ্গো ঘোষণাপত্রে, যার মারফত আফ্রিকায় স্বার্থ আছে এমন প্রধান প্রধান ইওরোপীয় শক্তি কঙ্গো নদীর অববাহিকার শাসনভার বেলজিয়ান রাজা দ্বিতীয় লেওপোল্ডের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সর্ত মেনে শাসনকার্য চালাবার জন্তে।" সঙ্গে সঙ্গে অন্য ইওরোপীয় শাসনকর্তৃপক্ষ মেনে নিলেন যে তাঁদের উপনিবেশ-শাসন হবে ঔপনিবেশিক অধিবাসীদের স্বার্থে। একাধিক লেখক মন্তব্য করেছেন যে বের্লিন-কঙ্গো ঘোষণাপত্রের এইসব ধারায় পরবর্তী যুগের ম্যাণ্ডেট এবং অছি ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

অবশ্য বের্লিন সম্মেলনের অনুষ্ঠানকালে অপরের মঙ্গল কামনা বা মঙ্গল-সাধনের ওপর এত বেশী জোর দেওয়া হয় নি।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের তালিকায় এই ধরনের কোন উদ্দেশ্যের উল্লেখ পর্যন্ত ছিল না। এবং স্বভাবতঃই সম্মেলনের আলোচনার অধিকাংশ কাটে বাণিজ্য এবং রাজনীতি সংক্রান্ত প্রশ্নে।

অবশ্য একথা ঠিক লর্ড গ্রেনভিল বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার ই. ম্যালেটকে নির্দেশ দিয়েছিলেন: "কঙ্গো অববাহিকার বাজার সবার জন্তে উন্মুক্ত করা বাঞ্ছনীয় হলেও স্থানীয় অধিবাসীদের মঙ্গলের কথা ভুললে চলবে না। কিন্তু বের্লিন শহরে সম্মিলিত প্রতিনিধিরা "স্থানীয় অধিবাসীদের মঙ্গল" সম্পর্কে কতটা চিন্তিত ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে ম্যালেটের চিঠি থেকে। গ্রেনভিলের কাছে লেখা তিনটি দীর্ঘ পত্রে "স্থানীয় অধিবাসীদের মঙ্গল সাধনের" মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ম্যালেট কয়েকটি বাক্যে সেরে দিয়েছিলেন। ফল হল এই যে বের্লিন-কঙ্গো ঘোষণাপত্রের ৩৮টি ধারার মধ্যে মাত্র ২টি ধারায় এ বিষয়ের উল্লেখ ছিল। দাসব্যবসায় বন্ধ করার ঔচিত্য সম্পর্কে স্বাক্ষরকারীরা অবশ্য একমত ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট কার্যক্রম গৃহীত হয় নি।

জনগণের স্বার্থে শাসন সম্পর্কে পরবর্তীকালে যতই জোর গলায় বলা হোক না কেন (টেম্পারলের উক্তি স্মরণীয়) কঙ্গো-অববাহিকায় লেওপোল্ডের শাসনকে কিছুতেই অভিনন্দিত করা যায় না। অধস্তন কর্মচারীদের সরকারী কার্য পরিচালনার ভয়াবহ কঠোরতা অবিশ্বাস্য। রবার, গজদন্ত এবং অন্যান্য জিনিস বেশী করে পাওয়ার জন্য আফ্রিকানদের অকথ্য শাস্তি দেওয়া, গাঁ কে

গাঁ জ্বালিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্তের অভাব নেই, এর ওপর স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর কর বসানো হয়—যে কর দেওয়ার টাকা যোগাড় করার জন্যে আফ্রিকান অধিবাসীরা ইওরোপীয় বণিকদের জন্যে কাজ করতে বাধ্য হবে। অসাধু কর্মচারীরা সহজেই দেয় করের দু-তিনগুণ আদায় করে নিত। এছাড়া উর্বর জমির বেশীর ভাগ লেওপোল্ড সরকার নিজ কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে নেয় এবং লাইসেন্স ছাড়া রবার এবং গজদন্ত সংগ্রহ বেআইনী করে দেওয়া হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের বিদেশী ব্যবসায়ীদের কাছে পূর্বোক্ত জিনিস বিক্রি করার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়।

যে সব এলাকা বেসরকারী কোম্পানীর কাছে কনসেশন হিসাবে দেওয়া হয় সেখানকার অধিবাসীদের অবস্থা হয় শোচনীয়তর। এই সব কোম্পানীকে শুধু বাণিজ্য করারই অনুমতি দেওয়া হয় নি, তারা নিজ নিজ অধিকারভুক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাগ্যবিধাতা হ'য়ে দাঁড়ায়। যতই দিন যেতে লাগল ততই আফ্রিকানদের ওপর আরো বেশী করে চাপ দেওয়া হতে লাগল, যাতে তারা রবার ও অন্যান্য জিনিস উৎপন্ন করে এবং নির্ধারিত পরিমাণে বাঞ্ছিত জিনিস সরবরাহ করতে অক্ষম হলে তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালান হত। এমন অত্যাচার ও নিষ্ঠুর শোষণের কথা বাইরের জগতের লোকের কাছে অবিদিত থাকে নি। ইওরোপ এবং আমেরিকার উদারনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গোষ্ঠী এ নিয়ে অনেক আলোড়ন তুলেছেন। এমন কি ১৯০৬ সালে প্রকাশিত 'কঙ্গো' আখ্যাত বৃটিশ পার্লামেন্টারী পেপারে বলা হয়েছে: "পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে যে রাবার কিংবা গঁদের মত স্থানীয় বাসিন্দারাও হচ্ছে কনসেশনভোগী কোম্পানীগুলির সম্পত্তির অংশ বিশেষ।"

এমন শাসনকে জনসাধারণের স্বার্থে অছি-শাসন বলা যায় কিনা, এ বিচারের ভার আমরা পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিলুম।

বের্লিন সম্মেলনে যে আদর্শকে দায়সারা ভাবে স্থান দেওয়া হয়েছিল পাঁচ বছর বাদে তাকে প্রধান উদ্দেশ্য করে নতুন এক বৈঠক আহূত হল। ইতিহাসে তার নাম হল ব্রাসেল্‌স সম্মেলন (১৮৯০)। এ সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল আফ্রিকায়:

(১) দাসব্যবসায় এবং দাসপ্রথা উচ্ছেদ এবং

(২) ইওরোপীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও উত্তেজক মদ আমদানী বন্ধ করা (এদের

বিরুদ্ধে যুক্তি ছিল এই যে এরা সকলে আফ্রিকানদের নৈতিক অধঃপতন ঘটাচ্ছে)।

পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করার জন্য ব্রাসেল্‌স সম্মেলন যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল তা অনেকাংশে লীগ অফ্‌ নেশন্‌সের কথা মনে করিয়ে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এই সম্মেলন থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে স্বাক্ষরকারী শক্তিবর্গ দাসব্যবসায় রহিত ও আগ্নেয়াস্ত্র এবং মদ আমদানী বন্ধ করা সম্বন্ধে নিজ নিজ দেশের আইন আদালতের রায় এবং অন্যান্য তত্ত্ব ও তথ্য একে অপরকে সরবরাহ করবে। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল।

এ সম্মেলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল, দাসব্যবসায় ও অন্যান্য নিন্দনীয় প্রথা বন্ধ করা যে সাধারণভাবে রাজ্য শাসনের মানের ওপর অংশতঃ নির্ভরশীল সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বলা হল যে রেলপথ ইত্যাদি বিস্তার মারফত পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি দাসব্যবসায়ের ভিত্তি দুর্বল করবে। প্রথমতঃ ভারবাহী মানুষের (অর্থাৎ দাসের) পরিবর্ত হবে রেলগাড়ি বা অন্য যান্ত্রিক বাহক। দ্বিতীয়তঃ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হবে এবং দাসব্যবসায়ের মুনাফা অন্যত্র মিলবে। ব্রাসেল্‌স সম্মেলনের পরেও কেন আফ্রিকায় দাসব্যবসায় এবং ইওরোপীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও মদ্য আমদানী পুরোপুরি বন্ধ হয় নি সে আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। এখানে শুধু এই কথা মনে রাখা দরকার যে ১৮৭৬ ও ১৮৯০ সালের ব্রাসেল্‌স সম্মেলন এবং ১৮৮৪-৮৫ সালের বের্লিন সম্মেলনে বাইরের পৃথিবীর লোকে আফ্রিকা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরের যুগে জাতিসঙ্ঘের ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থাও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছি-ব্যবস্থায় যে নিয়মের পূর্ণতর বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় এই সব সম্মেলন থেকে তার শুরু।

দুই

১৮৯০ সালের ব্রাসেল্‌স সম্মেলনের ৩০ বছর বাদে এল লীগ অফ নেশন্‌স ও ম্যাণ্ডেট্‌স ব্যবস্থা। শেষোক্ত ব্যবস্থায় এই প্রথম কয়েকটি আফ্রিকার দেশ আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে শাসিত হতে থাকল।

ম্যাণ্ডেট্‌স ব্যবস্থাকে অবিমিশ্রিত আদর্শবাদের সন্তান বলা যে ঠিক হবে না একথা উইলিয়াম র‍্যাপার্ড (লীগ সেক্রেটারিয়েটে ম্যাণ্ডেট্‌স বিভাগের প্রথম অধিকর্তা) অতি পরিষ্কারভাবে বলেছেন। র‍্যাপার্ড দেখিয়েছেন যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিজিত শত্রুর অধীনস্থ অঞ্চলগুলি নিয়ে কী করা হবে এ নিয়ে বিতর্ক ওঠে। একদল সেগুলি নিজ নিজ রাজ্যভুক্ত করার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু অন্য একদল সেই সব অঞ্চলে আন্তর্জাতিক শাসন স্থাপন করার পক্ষে মত দেন। অনেক বিতর্কের পর অবশেষে এই দুই বিরোধী মতবাদের মধ্যে আপোস সমন্বয় করল ম্যাণ্ডেট্‌স ব্যবস্থা।

লীগ কভেনান্টে ২২ ধারায় ম্যাণ্ডেট্‌স ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়। এই ধারা অনুযায়ী: ম্যাণ্ডেট শাসন তত্ত্বাবধান করার কাজ লীগ অফ নেশন্‌স-এর কাউন্সিল এবং পার্লামেণ্ট ম্যাণ্ডেট্‌স কমিশন চালাত।

দৈনন্দিন শাসনের তত্ত্বাবধান প্রধানত: শেষোক্ত সংগঠনের ওপর ন্যস্ত ছিল কিন্তু লীগের দায়িত্বের গুরুভার কাউন্সিলের স্কন্ধে দেওয়া হয়।

পার্লামেণ্ট ম্যাণ্ডেট্‌স কমিশনের সদস্যরা তাঁদের ব্যক্তিগত ক্ষমতায় (অর্থাৎ নিজ নিজ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে নয়) নির্বাচিত ও পদাধিষ্ঠিত হতেন। অবশ্য কার্যতঃ এই ব্যবস্থায় কিছু ইতরবিশেষ হত না। কারণ সদস্যরা নির্বাচনের পূর্বে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নিজ নিজ দেশের উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাছাড়া কাউকে মনোনীত করার আগে সেক্রেটারী জেনারেল সংশ্লিষ্ট সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। যদিও তাঁর পক্ষে সে পরামর্শ গ্রহণের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না।

যেসব দেশের হাতে ম্যাণ্ডেট শাসনভার ছিল (অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড) তার মধ্য থেকে চারটি দেশের (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান এবং বেলজিয়াম) নাগরিককে সদস্যপদে মনোনীত করা হয়। এছাড়া বাকী ৫ জন সদস্যদের ৪ জন

আসেন এমন দেশ থেকে যাদের হাতে উপনিবেশ ছিল (ইতালী, নেদারল্যাণ্ডস, পর্তুগাল ও স্পেন)। স্থতরাং এমন অনুমান করা কিছু অসঙ্গত নয় যে পার্লামেণ্ট ম্যাণ্ডেট্স কমিশনের কার্যকলাপে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রভাব বেশী জোরালো হত।

কমিশনের সরেজমিন তদন্ত করার কোন ক্ষমতা ছিল না। স্বভাবতঃই ম্যাণ্ডেট শাসকদের বার্ষিক রিপোর্টের ওপর তাকে মূলতঃ নির্ভর করতে হত। সমস্ত রকমের খবর পাওয়ার জন্যে কমিশন এক বিস্তৃত প্রশ্নতালিকা তৈরি করে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ ছিল: দাসপ্রথা, শ্রম, অস্ত্র ব্যবসায়, মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসায়, ধর্মের স্বাধীনতা, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সাম্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমিব্যবস্থা ইত্যাদি।

বার্ষিক রিপোর্ট নিয়ে কমিশনে বিস্তৃত আলোচনা হত এবং তারপর কমিশন কাউন্সিলকে তার অনুমোদন পাঠাত। কাউন্সিল সাধারণতঃ সেগুলি মেনে নিত।

বার্ষিক রিপোর্ট ছাড়া ম্যাণ্ডেট অধিবাসীদের দরখাস্ত মারফত কাউন্সিল ও কমিশন ম্যাণ্ডেট শাসন সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারত। কিন্তু এইসব দরখাস্ত ম্যাণ্ডেট শাসকদের মারফত পাঠানোর নিয়ম হওয়ায় এই ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী হ'তে পারে নি।

লীগ কভেনাণ্টে মোট তিন ধরনের ম্যাণ্ডেটের কথা বলা হয়। আফ্রিকার বেশীর ভাগ অঞ্চল খ-শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট রূপে শাসিত হত। এই শ্রেণীর ম্যাণ্ডেটের জন্য শাসক সরকারের ক্ষমতা ছিল নিম্নরূপ:

(ক) ম্যাণ্ডেট-অধিবাসীদের ধর্মের স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে।

(খ) দাসব্যবসায়, অস্ত্রশস্ত্র ও মাদকদ্রব্যের ব্যবসায় বন্ধ করতে হবে।

(গ) নৌ ও সামরিক ঘাঁটি এবং দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণ বন্ধ করা হবে। তেমনি করে স্থানীয় অধিবাসীদের দেশরক্ষা এবং পুলিসী কাজ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া চলবে না।

(ঘ) ম্যাণ্ডেট অঞ্চলে লীগের অন্য সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রকে ব্যবসায়-বাণিজ্য করার সমান স্থযোগ দিতে হবে (তথাকথিত 'মুক্তদ্বার' নীতি)।

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে অবশ্য গ-শ্রেণীর ম্যাণ্ডেটে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। কভেনাণ্টে স্পষ্ট বলা হয়, শাসক রাষ্ট্র তার নিজ রাজ্যের 'অখণ্ড অংশ' হিসাবে গ-শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট শাসন করবে।

আফ্রিকায় নিম্নলিখিত দেশগুলি ছিল ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার অধীন

দেশের নাম	পূর্বতন রাজনৈতিক অবস্থা	কোন শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট	শাসক দেশ
১ বৃটিশ টোগোল্যাণ্ড	পূর্বতন জার্মান উপনিবেশ টেগোলাল্যাণ্ডের পশ্চিমাংশ	খ	বৃটেন
২ ফরাসী টোগোল্যাণ্ডে	পূর্বতন জার্মান উপনিবেশ টোগোল্যাণ্ডের পূর্বাংশ	খ	ফ্রান্স
৩ বৃটিশ ক্যামেরুন্স	পূর্বতন জার্মান উপনিবেশ ক্যামেরুন্সের পশ্চিমাংশ	খ	বৃটেন
৪ ফরাসী ক্যামেরুন্স	পূর্বতন জার্মান উপনিবেশ ক্যামেরুন্সের পূর্বাংশ	খ	ফ্রান্স
৫ ট্যাঙ্গানাইকা	পূর্বতন জার্মান পূর্ব আফ্রিকার বৃহত্তর পূর্বাংশ	খ	বৃটেন
৬ রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি	পূর্বতন জার্মান পূর্ব আফ্রিকার ক্ষুদ্রতর পশ্চিমাংশ	খ	বেলজিয়াম
৭ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা	পূর্বতন জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা	গ	দক্ষিণ আফ্রিকান ইউনিয়ন

আজ ১৯৬১ সালে বসে আছি অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করলে ম্যাণ্ডেট্স-ব্যবস্থা ও ম্যাণ্ডেট শাসনের যুগকে গুরুত্বহীন বলে মনে হবে। সত্যি কথা, বিশ বছরেরও কম স্থায়ী জীবনে ম্যাণ্ডেট্স ব্যবস্থা আফ্রিকার ম্যাণ্ডেটগুলিতে কোন সুদূর প্রসারী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় নি। অবশ্য আমাদের এ-কথা ভুললে চলবে না যে, এমন ধরনের কোন উদ্দেশ্যও লীগের ছিল না। 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর ম্যাণ্ডেটের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, এমন কী আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ত-শাসনের নামও লীগ কভেনাণ্ট করে নি।

লীগ কভেনাণ্টে বর্ণিত উদ্দেশ্যের মানদণ্ডে বিচার করলে অবশ্য ম্যাণ্ডেট্স শাসন আংশিক সাফল্য অর্জন করেছিল বলা যায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্যগুলির

চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কভেনান্টে স্থান পেলে ভাল হত। তবু ঔপনিবেশিক শাসনে আন্তর্জাতিক সংগঠনকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করেছে বলে, ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থাকে অভিনব আখ্যা দেওয়া যায়। নীতিগতভাবে বলতে হবে এই প্রথম বিজিত শত্রুর রাজ্য সরাসরি দখল না করে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে রাখা হল। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানের যন্ত্র, পার্মানেণ্ট ম্যাণ্ডেট্স কমিশনে, একটি ছাড়া আর সব আসন দখল করে ছিল সাম্রাজ্যভোগী রাষ্ট্রগুলি। এ ছাড়া, কোন শাসক দেশকে কোন নীতি বা কার্যক্রম জোর করে মানতে বাধ্য করানোর ক্ষমতা লীগের ছিল না। এক কথায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে লীগের শুধুমাত্র নৈতিক চাপ দেওয়ার শক্তি ছিল। আর যে সমস্ত রাষ্ট্রের ওপর নৈতিক চাপ দেওয়া হবে তাদের নাগরিকদেরই সেই নৈতিক প্রভাব সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। তবু মাণ্ডেট কমিশনের সদস্যদের কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে (যথা: সুইস অধ্যাপক র‍্যাপার্ড) ম্যাণ্ডেট অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন। এবং এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে লীগ অফ নেশন্‌সের সমালোচনায় ম্যাণ্ডেট শাসক তার নীতি বদলিয়েছে। অতএব, ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার প্রবর্তকদের বৈপ্লবিক পরিকল্পনা কিংবা বিশ্বপ্রেমী সদিচ্ছা ছিল একথা বলা না গেলেও এ ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক জগতে কোন পরিবর্তনই আনে নি—এমন যুক্তি দিয়ে একে নস্যাৎ করার প্রয়োজন নেই।

তিন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের সময় ঠিক হল যে যুদ্ধপূর্বযুগে পরাধীন অঞ্চলগুলোর শাসনব্যবস্থার ওপর যে তত্ত্বাবধান পার্মানেণ্ট ম্যাণ্ডেট্স কমিশন করছিল তার ভার এখন নেবে ট্রাস্টীশিপ কাউন্সিল বা অছি পরিষদ। ১৯৪৬ সালে ডিসেম্বরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা বাদে পূর্বতন ছ'টি আফ্রিকান ম্যাণ্ডেটের অছি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করল। এই সব দেশের শাসকরাষ্ট্রেরও কোন পরিবর্তন হয় না। অনেকে আশা করেছিলেন অন্য মাণ্ডেটের মত দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাও অছি এলাকায় রূপান্তরিত হবে। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকান ইউনিয়ন সরকার একে অছি ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করল। এবং পরে আন্তর্জাতিক

আদালতের (ইণ্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ্ জাষ্টিস্) রায় অনুযায়ী দেখা গেল কোন ম্যাণ্ডেটকে যে অছি ব্যবস্থার মধ্যে আনতেই হবে এমন কথা আন্তর্জাতিক আইন বলে না। সে যাই হোক দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বিতর্কের বিষয়। একদিকে দক্ষিণ আফ্রিকান সরকার বলছে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা হল তাদের পঞ্চম প্রদেশ (বাকী চারটি প্রদেশ হল কেপ, নাটাল, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট)। অন্য দিকে এই দক্ষিণ আফ্রিকা অন্তর্ভুক্তি স্বীকার করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সম্প্রতি দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে স্বাধীনতা দানের আহ্বান জানিয়েছে। পূর্বতন ইতালীয় উপনিবেশ, সোমালিল্যাণ্ড, ১৯৫০ সালে অছি এলাকায় পরিণত হয়। এর অছি-ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তি কিছুটা অপ্রত্যাশিত। বস্তুতঃ সারা পৃথিবীতে সোমালিল্যাণ্ড হল একমাত্র অঞ্চল যা ম্যাণ্ডেট ছিল না অথচ অছি শাসনের অধীন হয়েছে।

সুতরাং আফ্রিকায় মোট ৭টি দেশ অছি শাসন প্রবর্তিত হয়। এর মধ্যে তিনটি অঞ্চলের শাসক হল বৃটেন, দুটির ফ্রান্স, এবং বাকী দুটির মধ্যে একটি বেলজিয়াম এবং অপরটির ইতালী।

১৯৪৬ সালে সাধারণ পরিষদে অছি চুক্তি সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রধানতঃ নিম্নোক্ত চারটি প্রশ্নে মতভেদ ঘটে :

(ক) অছি অর্থনীতির কোন অংশে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে একচেটিয়া অধিকার দানের যৌক্তিকতা ;

(খ) শাসক রাষ্ট্র কর্তৃক কোন অছি অঞ্চলকে তার নিজ রাজ্যের 'অখণ্ড অংশ' (ইনটিগ্রাল পার্ট) হিসাবে শাসনের আইনগ্রাহ্যতা ;

(গ) অছি এলাকায় সামরিক ঘাঁটি ও দুর্গ স্থাপনের অধিকার ;

(ঘ) অছি-চুক্তি মুসাবিদার সময় সেই বিশেষ এলাকা শাসনে কোন্ কোন্ রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট তা নির্ধারণ।

অছি-এলাকায় কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে একচেটিয়া অধিকার দান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত কিনা, এ প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ খুঁজতে হবে সনদের এক বিশেষ ধারায় (৭৬-ঘ) অছি এলাকায় সকলের সমান অধিকার দানের কথা ঘোষণা। অতএব যখন দেখা গেল, রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি, ট্যাঙ্গানাইকা, বৃটিশ টোগোল্যাণ্ড ও বৃটিশ ক্যামেরুন্সের অছি-চুক্তিতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একচেটিয়া মালিকানা সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, তখন অনেকেই আপত্তি তুললেন। এর বিরুদ্ধে যুক্তি হল প্রধানতঃ দুটি :

(১) একচেটিয়া অধিকার সকলের সমান অধিকারকে খর্ব করবে ; (২) একচেটিয়া অধিকার অছি এলাকার অর্থনৈতিক প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য ফরাসী অছি-অঞ্চলে এ সমস্যারও অস্তিত্ব ছিল না, কারণ ফ্রান্সের আইন অছি-অঞ্চলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে একচেটিয়া অধিকার দান নিষিদ্ধ করে। সুতরাং আলোচনা ও বিতর্ক প্রধানতঃ বৃটিশ ও বেলজিয়ান অছি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে। যাই হোক অনেক বিতর্কের পর বেলজিয়ান ও বৃটিশ প্রতিনিধি নিম্নোক্ত শর্তে রাজী হলেন : (অ) একচেটিয়া অধিকার দানে জাতি ও দেশের ভিত্তিতে কোন পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করা হবে না ; (আ) শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রগতির প্রয়োজনেই একচেটিয়া অধিকার দাতব্য ; (ই) একচেটিয়া অধিকার দান স্বাভাবিক অবস্থার অনুসৃত নীতি হিসাবে গণ্য হবে না, (ঈ) শুধুমাত্র অস্থায়ীকালের জন্যই একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হবে ; (উ) কোন বিশেষ ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার দেওয়ামাত্র অছি পরিষদকে জানানো হবে।

নিজ রাজ্যের 'অখণ্ড অংশ' হিসাবে অছি অঞ্চল শাসন আইনগ্রাহ্য কিনা, এ নিয়ে বিতর্ক আরো জোরালো হয়। পাঁচটি অছি চুক্তিতে শাসকরাষ্ট্রেরা এই ধরনের অধিকারের দাবি জানায়।

(১) বেলজিয়াম রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডিকে কঙ্গোর 'অখণ্ড অংশ' হিসাবে শাসন করতে চায় ;

(২) বৃটেন টোগোল্যাণ্ডকে গোল্ডকোস্টের এবং ক্যামেরুন্সকে নাইজেরিয়ার 'অখণ্ড অংশ' হিসাবে শাসন করবে বলে জানায় ;

(৩) ফ্রান্স টোগোল্যাণ্ডকে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার এবং ক্যামেরুন্সকে ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকার 'অখণ্ড অংশ' হিসাবে শাসনের প্রস্তাব তোলে।

অবশ্য, পূর্বোল্লেখিত অছি-অঞ্চলগুলিকে এমনভাবে শাসনের পক্ষে যুক্তি নেহাত কম ছিল না। ওপরে যে পাঁচটি অছি অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে সেগুলি (ফরাসী ক্যামেরুন্স ছাড়া) এত ছোট এবং তাদের সম্পদ এত অল্প যে এদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক শাসনপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, কষ্ট এবং ব্যয়সাধ্য হত সন্দেহ নেই। যাই হোক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিরা আপত্তি তোলে। অছি অঞ্চল এমনভাবে শাসন করলে এদের স্বাধীনতার পথ বিঘ্নিত হবে ও কার্যতঃ এরা শাসকশক্তির ঔপনিবেশিক অধিকারে এসে পড়বে। এই বিরুদ্ধাচরণে মার্কিন প্রতিনিধিরও সক্রিয় সমর্থন ছিল। দীর্ঘ বিতর্কের পর

অবশেষে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও বৃটেন একযোগে জানায়, অছি অঞ্চলকে তাদের নিজ রাজ্যের 'অখণ্ড অংশ' হিসাবে শাসন শুধুমাত্র সরকারী কাজের সুবিধার জন্য। এর মানে অছি অঞ্চলের রাজনৈতিক সত্তার অবলুপ্তি নয়। বৃটিশ প্রতিনিধি আরও পরিষ্কার ভাষায় বললেন, অছি অঞ্চলকে বৃটিশযুক্তরাজ্যের 'অখণ্ড অংশ' হিসাবে শাসনের কথা বলা হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় বৃটিশ সার্বভৌমত্বও ঘোষিত হচ্ছে না।

অছি অঞ্চলকে সামরিকীকরণ-এর প্রশ্নেও বাদানুবাদ বড় কম হয় না। ভারতবর্ষ, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন অছি চুক্তিতে সামরিকীকরণের উল্লেখে প্রতিবাদ জানান। এঁদের মূল বক্তব্য ছিল, যে ক্ষেত্রে শাসক সরকার জাতিপুঞ্জ সনদের ৮২ ও ৮৩ ধারায় কোন দায়িত্ব নেবেন, কেবল সেই সব ক্ষেত্রেই অছি অঞ্চলে অস্ত্রীকরণ ইত্যাদির অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। উত্তরে, অছি শাসকেরা বলেন (এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনও তাঁরা পেয়েছিলেন) লীগ কভেনাণ্ট থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে জাতিপুঞ্জ সনদ বলেছে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ অছি অঞ্চলের অধিকার শুধুই নয় কর্তব্যও বটে। অতএব, সামরিকীকরণের প্রয়োজনও পরোক্ষভাবে জাতিপুঞ্জ সনদে স্বীকৃত। শেষপর্যন্ত, সাধারণ পরিষদ অছি শাসকদের এই যুক্তি গ্রহণ করে।

অছি চুক্তি অনুমোদনের সময় আর একটি বিবেচ্য বিষয় ছিল: জাতিপুঞ্জ সনদের ৭৯ ধারায় বর্ণিত 'প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি' কথাটির যথার্থ তাৎপর্য। ৭৯ ধারা বলে, অছি চুক্তি প্রণয়ন ও পরিবর্তনে অছি শাসক ও 'প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি' সম্মতিজ্ঞাপন করবে। সনদে এ কথাটির পরিষ্কার ব্যাখ্যা না থাকায় এর অনেক মানে করা যেতে পারতো:

(ক) ম্যাণ্ডেট অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রথম মহাযুদ্ধের মিত্র ও সহযোগী রাষ্ট্রসমূহ;

(খ) লীগকাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ;

(গ) বিজিত শত্রুর কাছ থেকে অধিকৃত দেশ হলে, সমস্ত মিত্রশক্তি;

(ঘ) বিজিত শত্রুর কাছ থেকে অধিকৃত দেশ হলে, প্রধান প্রধান মিত্রশক্তি;

(ঙ) প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ;

(চ) অছি পরিষদের সদস্যবৃন্দ;

(ছ) নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

কার্যতঃ কোন্ কোন্ দেশের মত গ্রহণীয় সে সম্পর্কে অছি শাসকদের কোন রকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনা যায় নি। নীচের উদাহরণ থেকেই তা পরিষ্কার হবে। রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির অছি চুক্তির শর্তাবলী প্রণয়নের সময় বেলজিয়ান সরকার 'প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র' হিসাবে বৃটেনের কাছে অছি চুক্তির মুসাবিদা পাঠায়। এবং 'খবর হিসাবে' সেই মুসাবিদা যায় চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে। ফ্রান্স টোগোল্যাণ্ড ও ক্যামেরুন্স-এর জন্য অছি-চুক্তি 'প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র' বৃটেনের কাছে প্রেরণ করে এবং চুক্তির খসড়া 'খবর হিসাবে' নিরাপত্তা পরিষদের সমস্ত স্থায়ী সদস্য এবং আফ্রিকা মহাদেশের সমস্ত অছি অঞ্চল ট্যাঙ্গানাইকা, টোগোল্যাণ্ড এবং ক্যামেরুন্সের জন্য অছি-চুক্তি মতামতের জন্য পাঠায় ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের কাছে এবং খবর হিসাবে পাঠায় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যবৃন্দের কাছে।

অছি ব্যবস্থাকে ম্যাণ্ডেটব্যবস্থার উন্নততর অনুবর্তন বলা চলে। একে 'উন্নততর' আখ্যা দেওয়ার কারণগুলি এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত করা যাক :

১। লীগ আমলে যেখানে ম্যাণ্ডেট শাসনের তত্ত্বাবধান করত একটি কমিশন মাত্র, এখন সেখানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি প্রধান অঙ্গ প্রতিষ্ঠান (অছি পরিষদ) সে কাজের ভার নিয়েছে।

২। অছি পরিষদে অছি শাসক ও অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। লীগ আমলে ঔপনিবেশিক শিবিরকে অধিকতর প্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হয়।

৩। ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানের যে পদ্ধতি ছিল (অর্থাৎ বার্ষিক রিপোর্ট ভিত্তি করে আলোচনা ও তাদের অভিযোগ প্রতিবিধানের জন্য সুপারিশ), অছি ব্যবস্থায় তা আরো কার্যকরী করার প্রচেষ্টা হয়েছে অছি অঞ্চলে পরিদর্শকদল পাঠাবার ব্যবস্থা করে। তার ওপর নিয়ম করা হয়েছে, অছিবাসীদের অভিযোগ অছি শাসকদের মারফত না এসে সরাসরি জাতিপুঞ্জের কাছে আসতে পারবে।

৪। সমস্ত অছি অঞ্চলের ভবিষ্যতে 'স্বাধীনতা কিংবা স্বায়ত্ব শাসন'-এর লক্ষ ঘোষিত হয়েছে।

আফ্রিকায় অছি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর ১৫ বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে

এ মহাদেশের সমস্ত অছি অঞ্চল স্বাধীন হয়েছে। এদের মধ্যে সোমালিল্যাণ্ডের কথা নানাভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ সালে যখন ভূতপূর্ব ইতালীয় উপনিবেশ সোমালিল্যাণ্ডকে অছি ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয়, তখনই স্থির হয়েছিল দশ বছর বাদে এই অঞ্চলটি স্বাধীনতা পাবে। সোমালিল্যাণ্ড উল্লেখযোগ্য আরও এই কারণে যে তার অছি শাসক নিযুক্ত হয় এক পরাজিত শত্রু, ইতালী, এবং এই রাষ্ট্রটি তখনও জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করে নি। এই প্রথম একটি দেশ জাতিপুঞ্জের সদস্য না হয়েও তার তত্ত্বাবধানে একটি অছি অঞ্চলের শাসনভার পেল। সোমালিল্যাণ্ডের স্বাধীনতার লক্ষ্য এবং তারিখ নিশ্চিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মৌলিক সংবিধানিক নীতিও ঘোষিত হল, যার ভিত্তিতে ভাবী সোমালি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবং সোমালিল্যাণ্ড শাসনের কাজে ইতালীকে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে মিসর, কলম্বিয়া ও ফিলিপাইন্‌সকে নিয়ে একটি উপদেষ্টামণ্ডলী গঠিত হয়। লক্ষ্যমাফিক ইতালী শাসিত অছি অঞ্চল সোমালিল্যাণ্ড ১৯৬০ সালে স্বাধীন হয়েছে—তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রতিবেশী উপনিবেশ বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড।

অবশ্য তার আগেই বৃটিশ অছি টোগোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়েছে। এই দেশটির অধিবাসীদের এক তৃতীয়াংশ ছিল এবে উপজাতি। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ গোল্ডকোস্টেও তারা বাস করতো এবং প্রকৃতপক্ষে সেখানকার এবেরা টোগোল্যাণ্ডে এবেদের থেকে সংখ্যায় বেশী ছিল। এ ছাড়া পার্শ্ববর্তী ফরাসী টোগোল্যাণ্ডেও বহু এবের (সমগ্র এবে উপজাতির এক-চতুর্থাংশেরও বেশী) বাস। এমন অবস্থায় এবেদের ঐক্যবদ্ধ করার এবে আন্দোলন চলতে থাকে। ইতিমধ্যে গোল্ডকোস্টের স্বাধীনতা স্থিরীকৃত হওয়ায়, বৃটেন জাতিপুঞ্জকে জানায়, গোল্ডকোস্টের স্বাধীনতার পর তার পক্ষে টোগোল্যাণ্ড শাসন অতিরিক্ত ব্যয়সাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। অতএব, বৃটিশ টোগোল্যাণ্ডের ভাগ্যনির্ধারণের জন্য ১৯৫৫ সালে অছি পরিষদ এক পরিদর্শকদল টোগোল্যাণ্ডে প্রেরণ করে। এদের কাছ থেকে প্রস্তাব আসে:

(ক) প্রথমে বৃটিশ টোগোল্যাণ্ডে এক গণভোট অনুষ্ঠিত হোক: স্বাধীন গোল্ডকোস্টের সঙ্গে মিলন কিংবা গোল্ডকোস্ট থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে অছি অঞ্চল হিসাবে শাসিত হতে থাকা এই দুই বিকল্পের মধ্যে একটি নির্বাচন যার উদ্দেশ্য হবে।

(খ) যদি গণভোটে দ্বিতীয় মতটি গৃহীত হয়, তবে ফরাসী টোগোল্যাণ্ডের

ভবিষ্যৎ নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত বৃটিশ টোগোল্যাণ্ডে অছি শাসন চলতে থাকবে।

১৯৫৬ সালের মে মাসে বৃটিশ টোগোল্যাণ্ডের গণভোটে শতকরা ৮০ জনেরও বেশী লোক অংশগ্রহণ করে। মতদাতাদের ৯৩,৩৬৫ জন চায় টোগোল্যাণ্ডের স্বাধীন গোল্ডকোস্টে অন্তর্ভুক্তি এবং ৬৭,৪২২ জন প্রচলিত অছি শাসন বজায় রাখার পক্ষে মত দেয়। এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃটিশ টোগোল্যাণ্ড বর্তমানে স্বাধীন ঘানা রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ।

অন্য দুটি অছি অঞ্চল ফরাসী টোগোল্যাণ্ড ও ফরাসী ক্যামেরুন্স পঞ্চম প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের কল্যাণে ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা পেয়েছে। বৃটিশ ক্যামেরুন্স নিয়ে কিছুটা মতভেদ দেখা যায়। একদিকে এই অঞ্চল শাসিত হত নাইজেরিয়ার 'অখণ্ড অংশ' হিসাবে। অন্যদিকে ফরাসী ক্যামেরুন্সের সঙ্গে বৃটিশ ক্যামেরুন্সের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। অতএব এখানেও গণভোটের সাহায্য নেওয়া হয়। বৃটিশ ক্যামেরুন্সের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে দুটি পৃথক গণভোটের রায় অনুসারে জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে উত্তরাংশ নাইজেরিয়ায় এবং দক্ষিণাংশ ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্রে (ভূতপূর্ব ফরাসী ক্যামেরুন্স) অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নেয়।

আফ্রিকার অন্যদুটি অছি অঞ্চলের মধ্যে ট্যাঙ্গানাইকা স্বরাজ পায় ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে। শেষ অছি অঞ্চল স্বল্পায়তন, রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি, হল পূর্বতন জার্মান পূর্ব আফ্রিকার ক্ষুদ্রতর পশ্চিমাংশ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এই দেশটি বেলজিয়াম শাসন করে আসছে। কঙ্গোয় 'পরিবর্তনের হাওয়া' বইতে শুরু করলে, বোঝা গেল রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডিরও রাজনৈতিক অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য।

১৯৫৯-এর এপ্রিল মাসে রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য এক অনুসন্ধান কমিশন বসানো হয়। সেপ্টেম্বরে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করার পর নভেম্বরে সরকারী ঘোষণায় এই দেশটিকে শীঘ্রই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার কথা বলা হয়। এর কিছু দিনের মধ্যে হুতু কৌম রুয়াণ্ডায় এক সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে। রুয়াণ্ডার ৮০% ভাগ লোক হল হুতুকৌমগুলির অন্তর্ভুক্ত। এখানকার অন্য কৌম, তুৎসি, সমগ্র জনসংখ্যার ১৫% এর কম হয়েও হুতুদের ওপর প্রভুত্ব করে এসেছে। এই বিদ্রোহে তুৎসি-আধিপত্যের অবসান ঘটানোই হুতুদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। যাই হোক বেলজিয়ান ও কঙ্গোলী সেনাদের সহায়তায় এই বিদ্রোহ দমন করা হলেও, ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে

রুয়াণ্ডার সাধারণ নির্বাচনে হুতু সংগঠন 'পার্মেহুতু' ৭০% এরও বেশী ভোট পেয়ে বৃহত্তম দল হিসাবে নিজদের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

১৯৬০ সালে সেপ্টেম্বরে বেলজিয়ান শাসন কর্তৃপক্ষ ১৯৬২ সালে রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডিকে স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব করে। কয়েক মাস বাদে এই প্রস্তাব কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে রুয়াণ্ডা ও উরুণ্ডির জন্য দুটি পৃথক সম্মেলন আহূত হয়। প্রধানতঃ দুই বিষয়ে তুৎসি ও হুতু কৌমের মতভেদ ছিল: (১) স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সময় ও (২) ভাবী সংবিধানিক রূপ। ১৯৫৯ সালের বিদ্রোহের পর থেকে রুয়াণ্ডার হুতু সংগঠনগুলি দাবি করে আসছিল, স্বাধীনতা কিছুদিন স্থগিত রেখে সত্বর নির্বাচন ও তারপর এক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হোক। উরুণ্ডিতে অবশ্য তুৎসি রাজতন্ত্রীরা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। তাদের দাবি ছিল, অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণা সিংহাসনচ্যুত 'মোয়ামি' (অর্থাৎ রাজা) পঞ্চম কিগেরিকে স্বরাজ্য প্রত্যাবর্তনে অনুমতিদান এবং তারপর সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একাধিকবার রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির ঐক্য বজায় রাখার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রাচুর্য ও ঘনবসতি এই দুটি অঞ্চলের পৃথক পৃথক রাষ্ট্রগঠনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ এখানকার অধিবাসীদের ঐক্যের তাগিদ বড় একটা দেখা যায় নি। জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে রুয়াণ্ডা ও উরুণ্ডিতে নির্বাচন এবং রুয়াণ্ডায় এক গণভোট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান আইনসভায় উভয় অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা স্পষ্ট-ভাষায় দেশবিভাজন দাবি করেছেন। এ ছাড়া বিপুল ভোটাধিক্যে রুয়াণ্ডা প্রজাতন্ত্র এবং উরুণ্ডি রাজতান্ত্রিক শাসন চালিয়ে যেতে চেয়েছে। এমতাবস্থায় জাতিপুঞ্জের রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি কমিশন মত প্রকাশ করে, ঘটনাচক্র এমনদিকে গেছে যে, দেশের ঐক্য বজায় রাখা অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই রুয়াণ্ডা ও উরুণ্ডি পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে স্বাধীনতা পায়। তবে স্থির হয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা আংশিক সহযোগিতা চালিয়ে যাবে এবং দুইদেশে এক মুদ্রা ব্যবস্থা, এক ইউনিয়ন ও একটি কফিবোর্ড কার্যকরী থাকবে।

চার

আমরা এতক্ষণ অছি অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করছিলুম। কিন্তু আফ্রিকার অধিকাংশ এতদিন ছিল উপনিবেশ ও রক্ষিত রাজ্য, যেখানে অছি

অঞ্চলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭টি। আর আজ যেখানে আফ্রিকায় অছি শাসন শেষ (দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কথা স্বতন্ত্র), সেখানে ঔপনিবেশিক ও আশ্রিত রাজ্যের অস্তিত্ব এখনও বর্তমান। ১৯৫০ সালের শেষে (অছি দেশগুলি ছাড়া) আফ্রিকায় নিম্নোক্ত দেশগুলি ছিল উপনিবেশ ও আশ্রিত রাজ্য :

(১) মরক্কো, (২) আলজেরিয়া, (৩) টিউনিসিয়া, (৪) ইঙ্গ-মিসরীয় সুদান, (৫) ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড, (৬) বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড, (৭) উগাণ্ডা, (৮) কেনিয়া, (৯) জাঞ্জিবার, (১০) উত্তর রোডেসিয়া, (১১) দক্ষিণ রোডেসিয়া, (১২) নায়াসাল্যাণ্ড, (১০, ১১ ও ১২ এর মিলনে ১৯৫৩ সালে মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়), (১৩) মোজাম্বিক, (১৪) বেচুয়ানাল্যাণ্ড (১৫) বাসুটোল্যাণ্ড, (১৬) সোয়াজিল্যাণ্ড, (১৭) ম্যাডাগাস্কার, (১৮ আঙ্গোলা, (১৯) কঙ্গো (বেলজিয়ান), (২০) স্পেনীয় গিনি, (২১) ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকা, (২২) ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা, (২৩) নাইজেরিয়া, (২৪) গোল্ডকোস্ট, (২৫) সিয়েরা লিওন, (২৬) গ্যাম্বিয়া, (২৭) পর্তুগীজ গিনি ও (১৮) স্পেনীয় সাহারা।

অছি অঞ্চলের তুলনায় এই সব দেশের শাসনের ওপর জাতিসংঘ (লীগ) ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা অধিকতর সীমাবদ্ধ ছিল। লীগ কভেনান্টে পরাধীন দেশের অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার কথা মাত্র একটি ধারায় (২৩) সেরে দেওয়া হয়। এই ধারা অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রদের নিম্নলিখিত দায়িত্বগ্রহণ করতে বলা হয় :

(ক) অধীনস্থ অঞ্চলের অধিবাসীদের কাজের পরিবেশ উন্নততর করার প্রচেষ্টা ; (খ) তাদের প্রতি ন্যায় ব্যবহার ; (গ) নারী ব্যবসায়, শিশু ব্যবসায় এবং আফিম ও অন্যান্য মাদকদ্রব্যের ব্যবসায় প্রভৃতি বন্ধের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি কার্যকরী করার জন্য লীগকে তত্ত্বাবধানের ক্ষমতাদান ; (ঘ) যেসব দেশে জনস্বার্থের পক্ষে মারণাস্ত্র ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয়, তাদের সঙ্গে এ ধরনের ব্যবসায় রহিত করার জন্য লীগকে গ-অনুরূপ ক্ষমতাদানের ব্যবস্থা ; (ঙ) পরিবহণ ও যাতায়াতের স্বাধীনতা এবং সমস্ত লীগ সদস্যরাষ্ট্রের অধিবাসীদের সমানভাবে বাণিজ্যের অধিকার সংরক্ষণ; এবং (চ) ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও নিবারণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

পক্ষান্তরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে একটি গোটা অধ্যায় পরাধীন দেশগুলি সম্বন্ধে লেখা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদটিকে এক ঘোষণাপত্র বললেই হয় এবং পৃথিবীর সমস্ত উপনিবেশ সম্পর্কে এমনভাবে এক সাধারণ নীতি ঘোষণার

নজির ইতিহাসে আর বিশেষ নেই। এ ছাড়া, উক্ত ঘোষণাপত্রে সমস্ত ঔপনিবেশিক শক্তিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছে অধীনস্থ দেশগুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ (সনদে রাজনৈতিক সংবাদের উল্লেখ করা হয় নি) সরবরাহ করতে বাধ্য করা হল। অবশ্য কোন্ কোন্ দেশ স্বশাসিত নয়, সে বিচারের ভার কার্যতঃ ঔপনিবেশিক দেশগুলির ওপর এসে পড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকান সরকার দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে অছি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকৃত হয় এবং একই সঙ্গে অ-স্বশাসিত অঞ্চল হিসাবে তার সম্বন্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছে সংবাদ সরবরাহেরও প্রয়োজন মনে করে নি। স্পেন ও পর্তুগাল জাতি-পুঞ্জের সদস্য না থাকার সময় (অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত) তাদের উপনিবেশ (আফ্রিকায় স্পেনীয় গিনি, স্পেনীয় সাহারা, পর্তুগীজ গিনি, আঙ্গোলা ও মোজাম্বিক) সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহে আপত্তি জানায়।

অবশ্য কোন উপনিবেশ সম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহ করা হলেই যে তার প্রগতি অবধারিত, এমন কথা কেউ বলবে না। প্রথমতঃ উপনিবেশের রাজ-নৈতিক প্রগতি বিষয়ে সংবাদ সরবরাহ বাধ্যতামূলক নয়। দ্বিতীয়তঃ, যেসব খবর জাতিপুঞ্জে আসছে, সেগুলি কাজে লাগানোর সুযোগ সীমাবদ্ধ, কারণ, জাতিপুঞ্জের সুপারিশ ঔপনিবেশিক সরকার মেনে নিতে বাধ্য নয়। তবু অনেক সময় কোন কোন উপনিবেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে জাতিপুঞ্জে যেটুকু সংবাদ সংগৃহীত হয়, আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের পক্ষে সেটুকুই লাভ।

১৯৪৬ সালের পর কঙ্গো নদীতে অনেক জল বয়ে গেছে। এবং এই সার্ধ-দশাব্দীতে বহু পরাধীন দেশ স্বায়ত্তশাসন এমন কি স্বাধীনতাও পেয়েছে। আজ আফ্রিকা মহাদেশে পরাধীন বলতে নিম্নলিখিত দেশগুলিকেই বোঝায় :

	দেশ	অবস্থান	শাসক
১	স্পেনীয় সাহারা	পশ্চিম আফ্রিকা	স্পেন
২	পর্তুগীজ গিনি	” ”	পর্তুগাল
৩	স্পেনীয় গিনি	মধ্য-পশ্চিম আফ্রিকা	স্পেন
৪	আঙ্গোলা	.. ..	পর্তুগাল

দেশ	অবস্থান	শাসক
৫ দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা	দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা	দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র
৬ মোজাম্বিক	দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা	পর্তুগাল
৭ সোয়াজিল্যাণ্ড—হাই কমিশন অঞ্চল	দক্ষিণ আফ্রিকা	বৃটেন
৮ রোডেসিয়া	মধ্য দক্ষিণ আফ্রিকা	বৃটেন
৯ ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড	উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা	ফ্রান্স

ওপরের দেশগুলির মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার নাম পূর্ববর্ণিত ২৮টি পরাধীন দেশের তালিকায় উল্লিখিত হয় নি। কারণ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্মকালে এই অঞ্চলটির অছি অবস্থায় অন্তর্ভুক্তির সাধারণ প্রত্যাশা ছিল। পূর্বোক্ত ২৮টি দেশের মধ্যে মোট ২০টি আজ পর্যন্ত স্বরাজলাভ করেছে। তবে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা ৮টি এবং ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকা ৪টি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছে। তার মানে, ওই ২০টি দেশ আজ ৩০টি সার্বভৌম রাষ্ট্রে রূপান্তরিত।

এই সব দেশের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অবদান কতখানি? আগেই বলা হয়েছে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সমালোচনা ও সুপারিশ ছাড়া অন্যভাবে, সাধারণ উপনিবেশ তো দূরের কথা এমনকি অছি অঞ্চলেরও স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করতে পারে নি। তা সত্ত্বেও অত্যল্পকালের মধ্যে আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন দিকে মোড় ঘুরেছে যে অছি অঞ্চল ও উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দানের আয়োজন করতে হয়েছে। অবশ্য এই নতুন অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আলাপ-আলোচনা, বাদ-প্রতিবাদ ও সুপারিশে এবং এদের মারফত আবার আলোচ্য আন্তর্জাতিক সংগঠনটি বিশ্বরাজনীতির ওপর স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করেছে।

পাঁচ

বর্তমান সমীক্ষা কয়েকটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক জনমত ও সংগঠন আফ্রিকার দেশগুলির ভাগ্য-নির্ধারণে অনেকাংশে সক্রিয় ছিল। অবশ্য, সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন কোন জনসমাজ বা দেশ বাদ দিলে, একথা সব অঞ্চল সম্বন্ধেই বলা চলে যদি সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসের ঐক্য ও বিশ্বসমাজের একত্ব আমরা মেনে নিই তবে কোন অঞ্চল, দেশ কিংবা মহাদেশই আন্তর্জাতিক জনমত ও সংগঠনের আওতার বাইরে পড়ে না। আফ্রিকার পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এখানে বহির্বিশ্ব একপাক্ষিকভাবে আফ্রিকার ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। সাম্প্রতিককালে পর্যন্ত আফ্রিকার সার্বভৌম ও স্বনির্ভর অস্তিত্ব বিশ্বসমাজে অস্বীকৃত থাকে। অতএব আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি ছিল আফ্রিকার স্বকীয় ভাবনা-ধারণা, আবেগ প্রত্যয় ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বিশ্ব জনমতের অংশীদারী পায় নি। আজ যখন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলি বিশ্বসভায় নিজদের আসন গ্রহণ করছে, তখন আফ্রিকা মহাদেশে বিশ্বজনমত ও সংগঠন তাদের পূর্বতন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনে বাধ্য। এবং যে অর্থে এশিয়া ইউরোপ কিংবা আমেরিকার ভাগ্যনির্ধারণে বিশ্বজনমত ও সংগঠন প্রাসঙ্গিক, ক্রমে আফ্রিকার ক্ষেত্রেও সে অর্থের কিছু ইতরবিশেষ হবে না।

আন্তর্জাতিক জনমত ও সংগঠনের ভূমিকা অনুসারে আমরা আফ্রিকার ইতিহাসকে কয়েক যুগে বিভক্ত করতে পারি। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত হল প্রথম যুগ, যখন উত্তর আফ্রিকা ও উপকূলবর্তী কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া আফ্রিকা মহাদেশ ছিল বহির্বিশ্বের কাছে অজ্ঞাত। আনুষ্ঠানিকভাবে উল্লেখযোগ্য কোন বিশ্ব সংগঠন ও তখন কার্যকরী ছিল না। দ্বিতীয় যুগের শুরু আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগ আবিষ্কার থেকে। এর পরিসমাপ্তি হয় প্রথম মহাযুদ্ধে। এই যুগে আমরা পাই ১৮৭৬ ও ১৮৯০ সালের ব্রাসেল্‌স সম্মেলন দুটি এবং ১৮৮৪-৮৫ সালের বের্লিন সম্মেলন। এই সময়ে পৃথিবীর অগ্রগণ্য শক্তিবর্গ সংঘবদ্ধভাবে আফ্রিকার দেশগুলির ভাগ্য-নির্ধারণে নেমেছে, যদিও কোন সার্বজনীন বিশ্বসংগঠন সক্রিয়ভাবে এই কাজে নিযুক্ত হয় নি। তৃতীয় যুগে ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং লীগ

অফ নেশন্‌স ম্যাণ্ডেট ছাড়া অন্য পরাধীন অঞ্চল সম্পর্কেও আগ্রহ দেখাতে থাকে। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও অছি ব্যবস্থার যুগ।

আজ আমরা এমন সময়ে বাস করছি যখন অছি ব্যবস্থা আফ্রিকায় তার কাজ শেষে করেছে এবং পরাধীন দেশগুলি একে একে স্বাধীনতা পাচ্ছে। আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পূর্ণাবসানে আমরা আর এক নতুন যুগের উদ্বোধন প্রত্যক্ষ করব, যখন আফ্রিকার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করবে বিশ্ববাসী ও আফ্রিকাবাসীরা ঠিক যেমন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করবে যথাক্রমে বিশ্ববাসী ও আমেরিকানরা এবং বিশ্ববাসী ও ও সোভিয়েত নাগরিকেরা।

অষ্টম অধ্যায় ঃ সামাজিক রূপান্তর ও মুক্তি সংগ্রাম

এক

আফ্রিকার সাম্প্রতিক নবজাগৃতির দুটি দিক লক্ষ্যণীয়: প্রথমতঃ এতদিন পর্যন্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন যে সব উপজাতীয় সমাজ বেঁচে ছিল তাদের অনেকের বর্তমান ভগ্নদশা এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন সমাজের ভাঙনের পাশাপাশি এক নতুন সমাজের ভিত্তি-পত্তন।

স্বভাবতঃ আফ্রিকার মত বিশাল ও বৈচিত্র্যময় মহাদেশে প্রাচীন সমাজের অবক্ষয় ও নতুন সমাজের প্রস্থাপনের প্রক্রিয়া একহারে চলছে না। কোথাও এর গতি শ্লথ (যেমন মোজাম্বিক, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেনীয় উপনিবেশসমূহ), কোথাও বা এর পদক্ষেপ দৃপ্ত (যেমন ঘানা, সেনেগাল প্রভৃতি দেশ)। এমন কি কোনো একটি দেশে যে পরিমাণে প্রাচীন সমাজের অবক্ষয় হচ্ছে সব সময় ঠিক সেই পরিমাণে যে নয়া সমাজ গড়ে উঠেছে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কঙ্গোর কথা ধরা যাক। বেলজিয়ানরা আসার আগে দাসব্যবসায়ের বিভীষিকায়, লেওপোল্ডের নেতৃত্বে স্বাধীন কঙ্গো-রাজ্যের ('কঙ্গো ফ্রী স্টেট') আমলে কনসেশনভোগকারী কোম্পানীগুলির জুলুমে ও পরে মুদ্রাকেন্দ্রিক আধুনিক অর্থনীতির দাবিতে কঙ্গোদেশের একটা প্রধান অংশের পুরনো সমাজ প্রচুর আঘাত খেয়েছে। কিন্তু প্রাচীন সমাজদেহ যে পরিমাণে ছত্রভঙ্গ হয়েছে, ঠিক সেই পরিমাণে কি নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে? নতুন সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য হল পুরনো দিনের সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর জনসমষ্টির মধ্যে সমবৈশিষ্ট্য চেতনার উদ্ভব। সমগ্র কঙ্গোবাসীদের মানসে সমবৈশিষ্টচেতনা যে খুব গভীর শিকড় গাড়তে পারে নি, তার প্রমাণ তো স্পষ্ট। আর যতদিন না এই চেতনা দানা বেঁধে ওঠে, ততদিন কোনো দেশ জাতিতে পরিণত হয় না। তাকে বড় জোর এক ভৌগোলিক নামই দেওয়া যায়।

আফ্রিকার দেশগুলিতে সমবৈশিষ্ট্যচেতনা বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। এর

একেবারে প্রাথমিক স্তরে একাধিক অনুরূপ উপজাতি তাদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম বা সংস্কৃতির সাদৃশ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে এক সংগঠন গড়ে তোলে। উদাহরণস্বরূপ আমরা ট্যাঙ্গানাইকার চাগা উপজাতিসমূহের সাধারণ সংগঠনের উল্লেখ করতে পারি। আবার কখনও কখনও বহুদিন এক সরকারের সাধারণ শাসনের অধীনে থাকার পর বিভিন্ন উপজাতির মধ্যেও সমবৈশিষ্ট্যচেতনা জেগে উঠতে পারে। আফ্রিকা বিভাজনের সময় ইওরোপীয় প্রতিযোগীরা নিজ নিজ অধিকৃত ভূখণ্ডের রাজনৈতিক সীমারেখা নৃতত্ত্ব বা ভাষাতত্ত্বের মানদণ্ডে টানে নি। এর ফলে অনুরূপ এমন কি একই উপজাতির লোকেরা অনেকসময় দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকার এবে উপজাতি তো ত্রিধাবিভক্ত হয়েছিল। তাদের এক অংশ পড়ে তৎকালীন বৃটিশ উপনিবেশ গোল্ডকোস্টে, অন্যভাগ বৃটিশ টোগোল্যাণ্ডে ও তৃতীয় আর একভাগ যুক্ত হয়েছিল ফরাসী টোগোল্যাণ্ডে। এইভাবে নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের সীমানার সঙ্গে রাজনৈতিক সীমানার গরমিল হওয়ায় অনেক দেশে এমন অনেক উপজাতির সমাবেশ হয় যাদের মধ্যে সাদৃশ্য কম। অথচ এমন পার্থক্যসত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন একভাবে শাসিত হওয়ার ফলে অধিবাসীদের অন্ততঃ একাংশের মনে জন্ম নিতে পারে এক আঞ্চলিক চেতনাবোধ। পশ্চিম আফ্রিকার ঘানায় বহু উপজাতির বাস এবং তাদের কারো কারো মধ্যকার শত্রুতা বহুদিনের। তা সত্ত্বেও আজ একথা বলা যায়, ঘানার অনেক অধিবাসীর মধ্যে 'ঘানীয়' বোধ ও চেতনা জাগছে।

আরো উচ্চস্তরে, একাধিক দেশ নিয়ে সমবৈশিষ্ট্যচেতনা জাগাবার চেষ্টা কোন কোন মহলে করা হচ্ছে। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক রাষ্ট্রের মিলনে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হল এর উদাহরণ।

সবশেষে সমগ্র মহাদেশের, এমনকি আফ্রিকার বাইরের নিগ্রোদেরও একাংশের মধ্যে জন্ম নিয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ হিসাবে সমবৈশিষ্ট্যচেতনা, যা বহু-বিঘোষিত প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের মানসিক বনিয়াদ। মার্কিন-নিগ্রো-নেতা ডু বয়েসের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস, গার্ভে পরিচালিত 'ফিরে চলো আফ্রিকায়' আন্দোলন ও গত কয়েক বছরের সরকারী বেসরকারী বহু সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই প্যান-আফ্রিকান মনোভাবের কিছুটা পরিচয় আমরা পেয়েছি।

মোদ্দা কথা তাহলে এই দাঁড়ায়, নয়া সমাজের বাহকস্তম্ভ হল সঙ্কীর্ণ

উপজাতি গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তম জনসমষ্টি সম্পর্কে মমত্ববোধ ও সমবৈশিষ্ট্যচেতনা —যা আমাদের এক দেশ, এক সরকারের অধীনে বাস করতে ও এক আদর্শের রূপায়নে সংগ্রাম করতে প্রেরণা যোগায়।

অবশ্য কোনো সমাজের বিশেষ বিশেষ অংশে এক এক ধরনের চেতনার স্তর থাকা সম্ভব। যেমন, অশিক্ষিত ও রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে অনগ্রসর লোকেরা স্বকীয় উপজাতি বন্ধনকে সবার ওপরে স্থান দিতে পারে, যখন 'আলোকপ্রাপ্ত' অংশ হয়তো বৃহত্তর রাষ্ট্রগড়ার স্বপ্ন দেখছে। তাছাড়া, একই লোকের মধ্যে একাধিক সমবৈশিষ্ট্যচেতনার সহাবস্থান সম্ভব: নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের সম্পর্কে এক ধরনের আবেগ ও প্রত্যয়, নিজশ্রেণী সম্বন্ধে আর এক ধরনের বোধ, স্বকীয় ধর্মের প্রতি হয়তো অন্যধরনের মমত্ব। এর মধ্যে ঠিক কোন্ সমবৈশিষ্ট্যচেতনাটি রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাষ্ট্রগঠন ব্যাপারে অন্য চেতনাগুলির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে তা সাধারণভাবে বলা অসম্ভব। তবে এটুকু সুনিশ্চিত যে, এক-উপজাতীয় সমাজের ওপর ভিত্তি করে আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো দাঁড়াতে পারে না; কারণ এক-কৌমিক সমাজের লোকবল, ধনবল ও বাহুবল বর্তমান জগতের কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

সমবৈশিষ্ট্যচেতনার অসমান স্তর ছাড়া তার বিভিন্ন রূপের কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার। সমবৈশিষ্ট্যচেতনা ও পরশাসনবিরোধী মনোভাব ও প্রতিরোধ যে সব সময় পরিষ্কার রাজনৈতিক রূপ নেবে এমন কোনো কথা নেই। বহু ক্ষেত্রে সমবায়, জাতীয় শিক্ষা এমন কি বিশেষ কোনো ধর্মীয় আন্দোলনের আড়ালে আফ্রিকার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামী মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে (উদাহরণ: ট্যাঙ্গানাইকায় সমবায়, ঘানায় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গোয় কিম্বাঙ্গু-প্রবর্তিত সংগ্রামমুখী নবধর্ম আন্দোলন)।

স্বভাবতঃ সনাতন উপজাতীয় বন্ধন যতদিন অটুট থাকে, ততদিন বৃহত্তর সমাজের চেতনা জাগতে পারে না। অতএব এই অর্থে আমরা বলতে পারি, সনাতন সমাজের ভাঙনে নতুন সমাজের বীজ গুপ্ত আছে। এখন এই, প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে যায় কেমন করে, সে কথায় আসা যাক।

দুই

ইওরোপীয় প্রভুত্ববিস্তার যেমন ভারতবর্ষের সনাতন সমাজব্যবস্থায় সুদূর-প্রসারী পরিবর্তনের কারণ, আফ্রিকার দেশগুলিতেও তাই। এতদিন যেসব

অঞ্চলের আধুনিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হল বৃহদায়তন সাম্রাজ্যসমূহে, যাদের প্রাণকেন্দ্র ছিল ইওরোপে। অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত যেসব দেশ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, তাদের বিচ্ছিন্নতা এবার শেষ হয়। এবং বলা বাহুল্য এর প্রভাব সনাতন সমাজে না পড়ে পারি নি।

অবশ্য, সর্বক্ষেত্রে সনাতন সমাজের ধ্বংসসাধন ইওরোপীয় শাসন কর্তৃপক্ষের সচেতন ও সুপরিকল্পিত নীতি ছিল, একথা বলা যায় না। বরং, অনেক সময় (যেমন, ইদানীংকালে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের ইওরোপীয় শাসকেরা চেষ্টা করছেন) কর্তৃপক্ষ প্রয়াস পেয়েছে পুরাতন সমাজকে বাঁচিয়ে রাখবার। তবু সামগ্রিকভাবে ইওরোপীয় প্রভু কর্তৃক আধুনিক শাসনযন্ত্র স্থাপন, বাণিজ্য ও মুদ্রাকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রসার ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইওরোপীয় ও এশীয় ঔপনিবেশিকদের বসতি স্থাপন পরোক্ষভাবে উপজাতীয় সমাজের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে।

নিরন্তর আন্তঃউপজাতি দ্বন্দ্ব বন্ধ করা হল ইওরোপীয় শাসন স্থাপনের সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ এক ফল। এক উপজাতির সঙ্গে অন্য উপজাতির দ্বন্দ্ব ও কখনও কখনও রক্তাক্ত যুদ্ধ বন্ধ করে সাধারণ লোকের কাছে উপজাতি প্রধানকে ছোট করা হয়েছে। যুদ্ধ পরিচালনা বহুক্ষেত্রে উপজাতি প্রধানের অন্যতম কাজ ছিল। ইওরোপীয় শাসন বলপ্রয়োগের ওপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে প্রধানের পদমর্যাদা খর্ব করেছে। প্রধানের অন্য বহু ক্ষমতাও ইওরোপীয় সরকারের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। আর বাকি যে ক্ষমতা তাঁদের রাখতে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি তাঁরা প্রয়োগ করতে পারেন বিদেশী প্রভুদের অনুগত কর্মচারী হিসেবে। এক কথায়, পূর্বে উপজাতি প্রধান রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতা নিজপদে কেন্দ্রীভূত করে সমগ্র উপজাতিকে যেমনভাবে ঐক্যবদ্ধ রূপ দিতেন, ইওরোপীয় আমলে তা হবার আর উপায় নেই। অন্যনিরপেক্ষ শাসক হিসাবে উপজাতি প্রধানদের অবলুপ্তি এক হিসাবে সনাতন সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধ্বংসের সূচক।

ইওরোপীয় শাসন প্রতিষ্ঠার আনুষঙ্গিক অন্য একটি ব্যাপার হল নতুন রকমের কর প্রবর্তন। সনাতন সমাজে উপজাতি প্রধানকে হরেকরকমের ভেট ও উপহার দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ইওরোপীয় শাসকেরা যে করটির প্রবর্তন করলেন তা পণ্যের বদলে মুদ্রায় দেয়। আধুনিক শাসন চালাবার

জন্য কর হিসাবে প্রদত্ত এই অর্থ যে অতিপ্রয়োজনীয় সেকথা অনস্বীকার্য। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে এই, বহুক্ষেত্রে রাজভাণ্ডারের আয়ের চেয়ে আরো জরুরী প্রয়োজনে এই মুদ্রাকর বসানো হয়। কর দেবার জন্য আফ্রিকানদের প্রয়োজন টাকার। এবং সে টাকা উপার্জন করা যায়, যাদের হাতে টাকা আছে সেই ইওরোপীয়দের জন্য কাজ করে কিংবা বাজারে বিক্রি করে টাকা পাওয়া যায় এমন ফসল উৎপাদন করে।

প্রথমটার পরিণতি হয়েছে সনাতন সমাজ থেকে দলে দলে আফ্রিকানদের শহরাঞ্চলে খনি এলাকায় ও বাগিচায় কর্ম অনুসন্ধানে। একথা সত্য যে এমনভাবে যারা গেছে তাদের এক ভগ্নাংশ মাত্র চিরকালের জন্য গাঁ-ছাড়া হয়েছে। অর্থাৎ বেশীর ভাগ লোক কিছুদিনের জন্য 'টাকা কিনতে' বাইরে গেছে। তারপর গাঁয়ে ফিরেছে, পরে আবার বাইরে গেছে।

'ঘর-বাহির' করার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত মিলবে দক্ষিণ আফ্রিকার 'কাইসকামাহুক' গ্রাম্য সমীক্ষায় বর্ণিত জনৈক শ্রমিকের জীবন-বৃত্তান্তে। অজ্ঞাতনামা এই আফ্রিকান ১৬ থেকে ৫৩ বছর পর্যন্ত শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছে। ৩৭ বছরের কর্মজীবনে সে রেল ও খনিশ্রমিক, গৃহস্থবাড়ির ভৃত্য, রাজমিস্ত্রী, দুধ সরবরাহকারী, ইস্পাত কারখানার মিস্ত্রী, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী প্রভৃতি অনেক রূপে ছ-টি বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়েছে। তেরোবার সে বাইরে গেছে আর বাড়ি ফিরেছে এবং সবসুদ্ধ ষোলবার চাকরি বদলিয়েছে।

'কাইসকামাহুক' সার্ভের কর্তারা মন্তব্য করেছেন: এই শ্রমিকটির জীবনেতিহাস সাধারণভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিকদের কর্মে অস্থায়িত্বের এক যথোপযুক্ত দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। এর ফলে নগরগামী শ্রমিকরা স্থায়ীভাবে শহরের বাসিন্দা হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু এই আসা-যাওয়ার ফলে যে তার উপজাতীয় বন্ধন অংশতঃ শিথিল হয়ে পড়ে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যতই দিন যাচ্ছে, ততই ক্রমশঃ বেশি সংখ্যায় আফ্রিকানরা শহরের দিকে ছুটছে। হিসেব করে দেখা গেছে ১৯২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের আফ্রিকান অধিবাসীদের মাত্র ১৩% শহরাঞ্চলে বাস করত। ১৯৫০ সালে এই অনুপাত বেড়ে হয় ২৫%। বাসুতোল্যাণ্ডের মোট সাত লক্ষ অধিবাসীর এক লক্ষ লোক সব সময়ই দক্ষিণ আফ্রিকায় খনি, শিল্প ও বাগিচায় কর্মব্যস্ত থাকে। বেসিল ডেভিডসনের সংখ্যানুযায়ী ১৯৫৩ সালে তৎকালীন বেলজিয়ান

কঙ্গোর আফ্রিকান অধিবাসীদের এক-চতুর্থাংশ উপজাতি এলাকার বাইরে বাস করত, যেখানে ১৯৪৬ সালে এই অনুপাত ছিল এক-ষষ্ঠাংশ।

উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় আফ্রিকানদের শহরবাসের তাৎপর্য কী? প্রথমতঃ প্রাচীন সমাজের বাইরে যারা যায়, তারা নতুন নতুন লোকের নতুন নতুন সমাজের সংস্পর্শে আসে। ফলে, অন্তত কিছু পরিমাণে তাদের মানসিক সঙ্কীর্ণতা দূর হয়। শহরে গিয়ে চটকদার ভোগ্যবস্তুর সন্ধান পেয়ে এদের অনেকে কর দেবার জন্য যেটুকু প্রয়োজনীয় তারও অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনে সচেষ্ট হতে পারে। এর জন্যে প্রয়োজন হয় আরও বেশিদিন ধরে উপজাতি সমাজের বাইরে কাজ করা। এদের দৃষ্টান্ত অনেককে প্রেরণা যোগায়। এমনি করে ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় লোকের সনাতনী অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীলতা কমে যায়।

অন্যদিকে প্রাচীন সমাজ থেকে দলে দলে লোক অন্যত্র চলে যাওয়ার দরুন এতদিনকার প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ভীষণভাবে আঘাত খেয়েছে। এ পর্যন্ত প্রাচীন সমাজের প্রয়োজনীয় পণ্যের মোটামুটি উৎপাদন হত সমাজের ভেতরেই। এখন এতগুলি শক্ত, সমর্থ লোকের সমাজত্যাগের ফলে খাদ্যোৎপাদনের কাজ ব্যাহত হয় এবং অনেকক্ষেত্রে বাইরে থেকে খাদ্য আমদানীর ওপর উপজাতীয় সমাজকে নির্ভর করতে হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির বিনাশ সনাতন সমাজের ধ্বংস ঘনিয়ে আনে।

বহু লোকের সনাতন সমাজ ত্যাগের ফলেই শুধু উপজাতীয় অর্থনীতিতে ভাঙন ধরে নি। আমরা আগে বলেছি অর্থোপার্জন করা যায় গ্রামে বসেই, অর্থকরী ফসল উৎপাদন করে। আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে এমনি করে তুলো, কফি, তামাক, কোকো, চীনেবাদাম, এমনকি সাইসাল পর্যন্ত আফ্রিকান কৃষকেরা উৎপাদন করছে। এভাবে অর্থোপার্জনের জন্য গ্রাম ছেড়ে বাইরে যেতে হয় না (বিক্রয় উদ্দেশ্যে ছাড়া)। কিন্তু তাই বলে এর দ্বারা উপজাতীয় অর্থনীতি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এমন কথা বলব না। কারণ, পূর্বোক্ত ফসল-উৎপাদন, বাজারে বিক্রয় ও লব্ধ অর্থে প্রয়োজনীয় দ্রব্য (অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যও) ক্রয়: এই সব কার্যকলাপ উপজাতীয় সমাজ ছাড়িয়ে সারা দেশব্যাপী যে অর্থনীতি-ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে (এবং যার সঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিরও যোগাযোগ আছে) তার অংশীভূত। অন্যভাবে বলা যায়, উপজাতীয় অর্থনীতির স্বয়ংসম্পূর্ণতার পরিপন্থী হল এই সব কার্যকলাপ।

আরো একটু এগিয়ে গিয়ে আমরা বলতে পারি, এই সব কার্যকলাপে বিশ্ব-অর্থনীতির সঙ্গে আফ্রিকার দেশসমূহের যোগসাধনই সূচিত। সামগ্রিকভাবে আফ্রিকা কতখানি বিশ্ব-অর্থনীতির অঙ্গীভূত হয়েছে তার ইঙ্গিত আমরা পাই দুটি হিসাব থেকে :

(ক) বিশেষ বিশেষ পণ্যের পৃথিবীর সামগ্রিক উৎপাদনের কতখানি আফ্রিকা নিয়ন্ত্রণ করে ও মোট বিশ্ববাণিজ্যে আফ্রিকার অংশ কতটা।

(খ) আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিশ্ব-অর্থনীতির যোগসাধনের এক তুলনামূলক বিচার চলতে পারে কোথায় কতখানি বিদেশী মূলধন লগ্নী হয়েছে তার হিসাবে।

১৯৫০ সালে সারা পৃথিবীতে উৎপন্ন খনিজ দ্রব্যের ৫.৫%, কোকো উৎপাদনের ৫০%, ও উদ্ভিজ তৈলের প্রায় ৮০% উৎপন্ন হয় আফ্রিকায়। খনিজ দ্রব্যকে পৃথকভাবে ধরলে তার হিসাব এই দাঁড়ায় : আফ্রিকায় উৎপন্ন কয়লা সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের ১.৩%, বক্সাইট ১.৫%, লৌহ ২%, স্বর্ণ ৩৮.৫% এবং হীরক ৯৮%।

বিশ্ববাণিজ্যে আফ্রিকার অংশ যৎসামান্য এবং অন্যান্য মহাদেশের থেকে যে অনেক কম সেকথা অনুমান করা শক্ত নয়। ১৯২৯ সালে পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের মাত্র ৪.৬% আফ্রিকার ভাগে ফেলা যেত। আজ আফ্রিকার সঙ্গে বহির্বিশ্বের বাণিজ্য মূল্য ও পরিমাণে অনেক বাড়লেও, পূর্বোক্ত শতকরা হার বেড়েছে কিনা সন্দেহ।

সাধারণভাবে বলা যায়, মুদ্রা অর্থনীতি ও বিনিময় ব্যবস্থা প্রসারের ফলে আফ্রিকা মহাদেশে বিদেশে রপ্তানীর জন্য পণ্যোৎপাদন ক্রমশঃ বাড়ছে। অর্থাৎ ভাষান্তরে আফ্রিকা বিশ্বশ্রম বিভাজনের অংশীদার হচ্ছে। আবার লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের সুদ দেবার জন্যও রপ্তানী বাণিজ্য বাড়াতে হচ্ছে। এছাড়া আফ্রিকানদের নিজেদের অর্থোপার্জনের স্পৃহা ও প্রয়োজন দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে ও পাচ্ছে, যার ফলে অর্থকরী ফসল উৎপাদন এবং খনি ও কারখানায় আফ্রিকানদের কর্মগ্রহণের প্রবণতা ক্রমবর্ধমান।

বিশ্ববাণিজ্যে আফ্রিকার অংশ ছাড়া, লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের পরিমাণ অনুসারে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বিশ্ব অর্থনীতির যোগসাধন কতটা হয়েছে তার এক তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। সাহারার দক্ষিণস্থিত আফ্রিকায় দেশী পুঁজিপতিশ্রেণী না থাকায় গোড়া থেকেই

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশী মূলধনের চাহিদা ছিল প্রচুর। এবং এর প্রধান নিয়োগক্ষেত্র ছিল খনি, রেলপথ ও বাগিচা। অধ্যাপক হার্বার্ট ফ্যাঙ্কেলের হিসাবানুযায়ী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুদিন আগে আফ্রিকায় মোট লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের পরিমাণ ১৩০ কোটি পাউণ্ড, এর প্রায় এক চতুর্থাংশ নিয়োজিত হয় রেলপথ নির্মাণে। অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্কেল মন্তব্য করেছেন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বৃটিশ সরকার যে সব ঋণ করেছেন, তার ৭৫% ছিল রেলপথ নির্মাণ, প্রচলিত রেলপথ আধুনিকীকরণ ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য। রেলপথ নির্মাণে সবচেয়ে বেশী খরচ করে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন (£ ১৬·৭ কোটি), তারপর পর্যায়ক্রমে পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গো (£ ৩·৮ কোটি), পূর্বতন ফরাসী আফ্রিকান সাম্রাজ্য (£ ৩·২ কোটি), রোডেশিয়া ও নায়াসাল্যাণ্ড (£ ২·৬) কেনিয়া উগাণ্ডা (£ ২·৩ কোটি), নাইজেরিয়া (£ ২·৩ কোটি) এবং পর্তুগীজ সাম্রাজ্য (£ ২·২ কোটি)।

অবশ্য দেশের আয়তন ও লোকসংখ্যার অসমতার জন্য পূর্বোক্ত হিসাব থেকে সঠিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না। অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্কেল ওপরের দেশগুলির মাথাপিছু লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের হিসাব দিয়েছেন: দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন £ ৫৫·৮, তৎকালীন উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া £ ৩৮·৪, তৎকালীন বেলজিয়াম কঙ্গো £ ১৩, পর্তুগীজ আফ্রিকান সাম্রাজ্য £ ৯·৮, ট্যাঙ্গানাইকা, কেনিয়া ও উগাণ্ডা £ ৮·১, তৎকালীন বৃটিশ পশ্চিম আফ্রিকা (অর্থাৎ গ্যাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন, ঘানা ও নাইজেরিয়া) £ ৪·৮, তৎকালীন ফরাসী সাম্রাজ্য £ ৩·৩।

শ্রীফ্র্যাঙ্কেল তাঁর তথ্য থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন: (ক) আফ্রিকায় লগ্নীকৃত মূলধনের এক বৃহদংশ নিয়োজিত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে (৪২·৮১%); (খ) যেসব অঞ্চলে খনিজ দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানে বিদেশী মূলধনের বৃহত্তর অংশ গেছে, যথা দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া ও বেলজিয়ান কঙ্গো; (গ) মোট লগ্নীকৃত মূলধনের মধ্যে সরকার নিয়ন্ত্রিত মূলধনের অনুপাত ৪৪·৭২%, তৎকালীন বৃটিশ আফ্রিকান সাম্রাজ্যে এই অনুপাত ছিল ৪৭·৬৮%।

শ্রীফ্র্যাঙ্কেলের বইটি প্রকাশিত হয় তিন দশাব্দী আগে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আফ্রিকায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার খুব দ্রুত বেড়েছে। ইংল্যাণ্ডের 'ইকনমিস্ট' পত্রিকার 'দি অ্যাফ্রিকান রেভলুশন' নামক বিশেষ সংখ্যায়

(১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮) হিসেব দেওয়া হয়েছে, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকান কিম্বার্লেতে প্রথম যখন হীরক আবিষ্কৃত হয় তখন থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাহারার দক্ষিণে অবস্থিত আফ্রিকায় ৩০০০ কোটি টাকা নিয়োজিত হয়। কিন্তু যুদ্ধোত্তর একটি মাত্র দশকে (১৯৪৫/৪৬—১৯৫৫/৫৬) প্রায় ততখানি মূলধন আফ্রিকায় এসেছে। অবশ্য দেশনির্বাচনে যুদ্ধোত্তর কালেও পুঁজিপতিদের মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। 'ইকনমিস্ট'-এর মতে, ১৯৪৭ সালের পর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে ১,০০০ কোটি টাকার বেশি মূলধন নিয়োজিত হয়েছে। পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গো এবং উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়ায় এর পরিমাণ হচ্ছে যথাক্রমে ১,০০০ কোটি ও ৫০০ কোটি টাকার কাছাকাছি।

এই মূলধনের এক বৃহদংশ গেছে ফরাসীরা যাকে বলে 'অ্যাঁক্রাস্ত্র্যুকত্যুর' তার গঠনে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র তো কারখানা নির্মাণেই নয়। কারখানায় পণ্য উৎপাদন ও সে পণ্য বিক্রয়ের জন্য আরও অনেক আনুষঙ্গিক জিনিস দরকার: রাস্তাঘাট, রেলপথ, বন্দর, শ্রমিকদের গৃহসংস্থান, এমনকি কারিগরী শিক্ষা পর্যন্ত। শিল্পায়নে এই সব দিকের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য অনেক মহলে আজকাল 'অ্যাঁক্রাস্ত্র্যুকত্যুর' বা 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গোয় ১৯৪৯ সালে গৃহীত দশবার্ষিকী যোজনায় ৪৪% অর্থ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পৃথক করে রাখা হয়। মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের ১৫৫ কোটি টাকার যোজনায় এক-চতুর্থাংশ যায় একই খাতে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে প্রথম ৭০০ কোটি টাকা রেলপথ উন্নয়ন ও প্রসারে ব্যয় করার কথা হয়। পরে প্রয়োজনের তুলনায় এই টাকা যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় আরও ১২½ কোটি টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কিছুদিন আগে, এর ওপর আরও ৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন আফ্রিকার দেশগুলির বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের পক্ষে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা তো স্পষ্ট। সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙে ফেলার পক্ষে এ জিনিস যেমন প্রয়োজনীয়, বৃহত্তর সমবৈশিষ্ট্য-চেতনার উন্মেষের পক্ষেও তেমন। অতএব, পরিবহন ব্যবস্থার প্রগতি প্রকারান্তরে নয়া সমাজ গঠনের সম্ভাবনা সূচিত করে।

বিদেশী মূলধন লগ্নীর অন্যতম ক্ষেত্র হল সাইসাল, কফি, রাবার, তুলো,

আখ ইত্যাদির বাগিচা। জলবায়ু ইওরোপীয় বসতির অনুকূল হওয়ায় পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার অনেকাংশে ইওরোপীয়রা স্থায়ীভাবে বসতি করেছে; বিরাট বিরাট জমি নিয়ে আধুনিক কায়দায় বহু মূলধন ঢেলে চাষাবাদ করছে। কেনিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে অনাফ্রিকান বসতি দ্বারা এই সব দেশের প্রাচীন সমাজ নানাভাবে প্রভাবিত। এই প্রভাবের রাজনৈতিক দিকটা আমরা সবাই জানি। এখানে অন্য দিকের আলোচনায় আসা যাক।

ইওরোপীয় কৃষি মানেই হল মুদ্রাব্যবস্থানির্ভর আধুনিক অর্থনীতি। ইওরোপীয় কৃষি আবাদযোগ্য জমির অনেকাংশ ও বহু আফ্রিকান শ্রমিককে এমন অর্থনীতির মধ্যে নিয়ে এসেছে। তাই পূর্বোক্ত দেশসমূহে সনাতন স্বয়ংসম্পূর্ণ কৌম-অর্থনীতির ভাঙনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে ইওরোপীয় বসতি।

ওপরের বক্তব্য আমরা কোনও মূল্যবিচারের প্রশ্নে না গিয়েই পেশ করছি। ইওরোপীয় বসতি ভাল কি খারাপ সে বিচার করার প্রয়োজন এখানে নেই। স্পষ্টতঃ, ইওরোপীয় বসতি আফ্রিকানদের অনেক দুঃখদুর্দশার কারণ। এবং হয়তো ইওরোপীয় বসতি ছাড়াও পূর্বোক্ত দেশসমূহে মুদ্রাকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রসার অসম্ভব হত না। কিন্তু ইতিহাসে কী না হলে কী হতে পারত এই ধরনের গবেষণা নিষ্ফল। কতকগুলি দেশে অনাফ্রিকান বসতি হয়েছে এটা ঐতিহাসিক সত্য এবং ইওরোপীয় বসতি মুদ্রাকেন্দ্রিক অর্থনীতির সম্প্রসারণ করেছে, এটাও ঐতিহাসিক ঘটনা।

ইওরোপীয় বসতি ও বাগিচার প্রসারে বহু দেশে আফ্রিকানদের জমি হস্তান্তর-প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে, সেখানে ৮০% এর-ও বেশি জমি থেকে আফ্রিকানরা বঞ্চিত। তার পরে আসে পূর্বতন রোডেশিয়া (৪৯%), পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গো (৯%), উপনিবেশিক যুগে কেনিয়া (৭%), এবং উত্তর রোডেশিয়া (৪% এর কিছু কম)।

ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকরা শুধু অনেক পরিমাণে জমিই নেয় নি। তারা দখল করেছে উর্বর ও অবস্থানের দিক থেকে সুবিধাজনক জমি। তার ফলে আফ্রিকান অঞ্চলে ভিড় বেড়েছে, অযত্ন ও যথেচ্ছ ব্যবহারে জমির উর্বরা শক্তি কমে গেছে এবং সনাতন কৃষি দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে এক ভূমিহীন শ্রেণীর, যার অস্তিত্ব কখনও আফ্রিকান সমাজে

ছিল না। এই ভূমিচ্যুত আফ্রিকানরা ভিড় বাড়িয়েছে অন্য এলাকায়, কিংবা গেছে শহরাঞ্চলে, অথবা ইওরোপীয় কৃষিক্ষেত্র ও বাগিচায় কৃষিশ্রমিক হিসাবে, দুঃখদুর্দশা ও বঞ্চনা প্রায়ই এদের করেছে সংগ্রামমুখী। জমি বঞ্চিত কিকিয়ুদের বিক্ষোভ যে মাউ মাউ আন্দোলনে বিস্ফোরিত হয়, একথা তো সর্বস্বীকৃত।

ভূমিহীন শ্রমের লোকে শহরে গেছে জীবিকার্জনের তাগিদে। যারা ভূমিহীন নয়, তাদের অনেককেও বেরিয়ে পড়তে হয়েছে কর দেবার জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টায়। তার ওপর অনেকে গেছে ভোগ্যবস্তুর আকর্ষণে। অর্থোপার্জন করে একটা সাইকেল, নাইলন শার্ট কি ট্রানজিস্টার রেডিও কেনার অভীপ্সা অনেক যুবককে টেনে নিয়ে গেছে শহরের দিকে। এ ছাড়া শহরের অন্য আকর্ষণও রয়েছে। সনাতন সমাজে যারা বিদ্রোহী তাদের অনেকে শহরাঞ্চলে এসেছে রক্ষণশীল বিধিবন্ধন থেকে মুক্তি পেতে। প্রায় সর্বত্র শহুরে হালচাল ও আদবকায়দা সামাজিক পদমর্যদা বাড়িয়ে দেয়। ঐতিহাসিক টমাস হজকিনের ভাষায় ('ন্যশনালিজম ইন কলোনিয়্যাল আফ্রিকা' নামক গ্রন্থে), অনেক যুবকের কাছে শহরে যাওয়া হল সাবালকত্ব প্রাপ্তির প্রমাণ। শহুরে ছাপ না থাকলে কোন যুবকের পক্ষে তার বাঞ্ছিতার প্রেমলাভ শক্ত হতে পারে।

অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার। পূর্বোক্ত কারণগুলির মধ্যে দারিদ্র্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক শ্যাপেরা তাঁর 'মাইগ্র্যাণ্ট লেবার অ্যাণ্ড ট্রাইব্যাল লাইফ' নামক পুস্তকে এ বিষয়ে কিছু তথ্য প্রমাণ পরিবেশন করেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকান কোন শহরে ২৯৭ জন আফ্রিকানকে গ্রাম ছেড়ে শহরে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তর পওয়া যায় নিম্নরূপ :

১১৯ জন বলে তারা শহরে যায় কর দেবার অর্থসংগ্রহ করতে।

৮৩	"	"	জামাকাপড় কেশ ও কর দেবার অর্থ সংগ্রহ করতে।
৩৯	"	"	দারিদ্র্য থেকে মুক্তিলাভের জন্য।
২৯	"	"	জামাকাপড় কিনতে।
১৬	"	"	জামাকাপড় ও গোরুবাছুর কিনতে।
৫	"	"	মা-বাপকে অর্থ সাহায্য করতে।
মাত্র ৬	"	"	শহরের চটুল আকর্ষণে।

অধ্যাপক শ্যাপেরা অনুসন্ধান করে যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন

মহাদেশের অন্যত্র তার কিছু ইতরবিশেষ হতে পারে। কিন্তু সর্বত্রই মোটামুটি একথা স্বীকৃত যে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে আফ্রিকানদের শহরমুখী অভিযান চলেছে।

উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, ফলপ্রাপ্তি এক। অর্থাৎ সনাতন সমাজ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। ফু দিয়ে ফোলান বেলুনের মত শহরগুলি স্ফীতাকৃতি ধারণ করছে। এবং উত্তরোত্তর বেশী সংখ্যায় ও বেশী অনুপাতে লোক সনাতনী গণ্ডী থেকে মুক্তির সুযোগ পাচ্ছে। এক কথায় গ্রামের লোকের শহরাভিমুখে যাত্রা দুটি জিনিসের সূচক : (ক) উপজাতীয় সমাজের ভাঙন ও (খ) উপজাতি নিরপেক্ষ বৃহত্তর সমাজ গঠনের সুযোগ। সুযোগ বলা হল এই কারণে যে, কোন শহরে বিভিন্ন উপজাতির লোকেরা একত্রিত হলেই যে তারা সবাই মিলে বৃহত্তর সমাজ গঠন করবে, এমন কোন কথা নেই।

বিভিন্ন দেশে শহরমুখী অভিযান কতখানি শক্তি অর্জন করেছে তার পরিচয় মিলবে শহরগুলির বর্ধমান লোকসংখ্যায়। সেনেগালের শহরের লোকসংখ্যা ১৯১০ সালে ২৪,৯১৪ থেকে বেড়ে ১৯৫৫ সালে ৩ লক্ষে দাঁড়ায়। একই সময়ে নাইজেরিয়ার রাজধানী লেগসের লোকসংখ্যা ৭৪,০০০ থেকে ২৭০,০০০ এ পরিণত হয়। পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গোর রাজধানী কিনসাসা'র (লিওপোল্ডভিল) উদাহরণ তো আরো চমকপ্রদ। ১৯৩৫ সালে এই শহরের জনসংখ্যা ছিল ২৬,৬২২। বিশবছরে সে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৩৪০,০০০ এ।

আরো জানা যায়, সাতটি দক্ষিণ রোডেশীয় শহরে আফ্রিকান পুরুষদের সংখ্যা ১৯৩৬ সালে ৪৫,৬৩৮ থেকে ১৯৫৬ সালে ১৯৮,৪৫২ হয়েছে, অর্থাৎ বিশ বছরে চার গুণেরও বেশি বেড়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের '১৯৫০ সাল থেকে আফ্রিকার অর্থনৈতিক সমীক্ষা' নামক রিপোর্টে বিভিন্ন দেশে শহরবাসী আফ্রিকানদের সংখ্যাবৃদ্ধির নিম্নোক্ত ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে :

দেশ	শহরবাসী আফ্রিকানরা সমগ্র জনসংখ্যার কত অংশ
পূর্বতন ফরাসী ক্যামেরুন্স	১৯৩৭ সালে ২·৪% থেকে ১৯৫৭ সালে ৫·৫%
পূর্বতন ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকা	১৯৩৬ সালে ১·৭% থেকে ১৯৫৬ সালে ৪·৪%
পূর্বতন ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা	১৯৩৬ „ ১·১% „ ১৯৫৬ „ ৪·১%
ম্যাডাগাস্কার (বর্তমানে মালাগাসী প্রজাতন্ত্র)	১৯৩৬ „ ৩·৯% „ ১৯৫৬ „ ৫·৬%

পূর্বতন ফরাসী টোগোল্যাণ্ড   ১৯৩৬ সালে ১·৮% থেকে ১৯৫৬ সালে ৩·৭%

সমগ্র অবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাহলে এই: প্রাক্-ইওরোপীয় যুগে আফ্রিকান কৌমসমাজ ছিল মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। ইওরোপীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে নানা কারণে সনাতনসমাজে ভাঙন ধরেছে। মুদ্রাকেন্দ্রিক বিনিময় অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও ক্রমে সম্প্রসারিত হচ্ছে। উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় আফ্রিকানরা শহরের দিকে আসছে এবং এদের মধ্যে অনেকে উপজাতীয় প্রভাবমুক্ত হচ্ছে। এমনিভাবে এক বৃহত্তর সমাজ-সত্তার চৈতন্যোদয়ের ভিত্তি ক্রমশঃ শেকড় গাড়ছে।

তিন

কোন দেশের আফ্রিকানদের উপজাতীয় বন্ধন অতিক্রম করে সামগ্রিক ঐক্যপ্রতিষ্ঠার দিক থেকে পূর্বোক্ত কথাগুলি প্রাসঙ্গিক। কিন্তু ঐক্যপ্রতিষ্ঠার সুযোগ ছাড়া জনসাধারণের সংগ্রামমুখিতা এবং সংগ্রামকার্যকারিতাও আমাদের বিবেচ্য বিষয়। একই সঙ্গে বৃহত্তর ঐক্য ও জনসংগ্রামের সম্ভাবনা মেলে নয়া শ্রেণীবিন্যাসে। প্রাক্-ইওরোপীয় যুগে সমাজের অঙ্গবিন্যাস ছিল সহজ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একদিকে থাকতেন উপজাতিপ্রধান, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ। বহুক্ষেত্রে প্রধান হতেন একাধারে শাসক, বিচারক, রাজনৈতিক নেতা, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার সেনাপতি, জাদুকর ও পুরোহিত। প্রায়শঃ উপজাতিপ্রধানকে সব ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্য থাকতেন সম্মানিত বৃদ্ধের দল। এছাড়া ছিল পুরোহিত ও জাদুকর আর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রধানেরা। কিন্তু শ্রমবিভাগের সীমাবদ্ধ প্রয়োগ উৎপাদনযন্ত্র ও পদ্ধতির পশ্চাৎপদতা এবং উদ্বৃত্ত সম্পত্তির অপ্রাচুর্যের জন্য সনাতন সমাজে বহুশ্রেণীর উদ্ভব হতে পারে নি।

কিন্তু পূর্ববর্ণিত কারণে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। নয়া অর্থনীতির ফলস্বরূপ এসেছে নয়াশ্রেণীবিন্যাস। বিস্তৃত জমি হস্তান্তরের ফলে কেনিয়া, জাম্বিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে জন্ম নিয়েছে একদল ভূমিহীন চাষী। কঙ্গো (কিনসাসা) জাম্বিয়া, রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের মত দেশে যেখানে কিছুটা শিল্পায়ন হয়েছে, সেখানে আবির্ভূত হয়েছে এক শহুরে অল্পবিত্ত ও শূন্যবিত্ত শ্রমিকশ্রেণী। নাইজেরিয়া, ঘানা ও উগাণ্ডায় আফ্রিকানরা

অর্থকরী কৃষির দিকে ঝুঁকেছে। এইসব দেশে উদ্ভব হয়েছে এক ভূমিবান সম্পন্ন কৃষকশ্রেণীর। কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে (যেমন কঙ্গো-কিনসাসা, ট্যাঙ্গানাইকার কোন কোন এলাকা, ঘানা ও নাইজেরিয়ার দক্ষিণাংশে) আফ্রিকানরা ব্যবসায়-বাণিজ্যেও হাত দিয়েছে। সর্বোপরি অর্থনৈতিক প্রগতি ও শিক্ষার বিস্তার অনেক দেশে শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক, অফিস-আদালতের কর্মচারী কারিগর ও দক্ষশ্রমিক প্রভৃতি নানা উপশ্রেণীর সৃষ্টি করেছে (সেনেগাল, ঘানা, নাইজেরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র হল তার অন্যতম উদাহরণ)।

কোন একটি শ্রেণী বা উপশ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ একাধিক উপজাতি থেকে আসে। এক নিয়ম মেনে একসঙ্গে কাজ করতে করতে, এক শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হয়ে এবং একই সংগ্রামে অংশগ্রহণের ফলে এদের মধ্যে যোগাযোগ ও ভাবের আদানপ্রদানের সুযোগ ঘটে এবং আবহাওয়া অনুকূল থাকলে ধীরে ধীরে সমবৈশিষ্ট্যচেতনার জন্ম হওয়া সম্ভব।

কিন্তু নবশ্রেণীবিন্যাস সংগ্রামমুখিতা এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের কার্যকরতা বাড়ায় কী ভাবে? নতুন পরিবেশে, অনাফ্রিকানদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে এবং কখনও কখনও কিছুটা লেখাপড়া শিখে এইসব নতুন শ্রেণীতে মিলিত জনগণ প্রাচীনসমাজবদ্ধ জনসাধারণের চেয়ে অনেক সহজে রাজনৈতিক চেতনা লাভ করতে পারে। এই চৈতন্য শুধুমাত্র নিজেদের দারিদ্র্য, পশ্চাৎপদতা ও বিদেশীদের প্রভুত্ব সম্পর্কিত নয়, নিজেদের সম্ভাব্য শক্তি সম্বন্ধেও বটে। বিশেষ করে, পরিবহন ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ কারখানা, বিদ্যুৎ কোম্পানী ইত্যাদির শ্রমিকদের আত্মবিশ্বাস জাগে যখন তারা উপলব্ধি করে দেশের অর্থনীতি ও শাসনযন্ত্র কত বেশি তাদের ওপর নির্ভরশীল; ভাষান্তরে, সুপরিকল্পিত ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হলে কত সহজে দেশের স্বাভাবিক জীবন অচল করে দেওয়া যায়। যত বেশি সংগঠিত হোক, যত আক্রমণাত্মক হয়ে উঠুক না কেন, বিশেষ কোন উপজাতির পক্ষে কি সারা দেশ অচল করে দেওয়া সম্ভব? এছাড়া নবোদ্ভূত শ্রেণীসমূহের নেতারা নিজেদের দাবিদাওয়া সম্বন্ধে আধুনিক কায়দায় প্রচার করতে জানেন; কখন সংগ্রাম করতে হয় বা সংগ্রামের হুমকি দিতে হয় পক্ষান্তরে কখন আপস করতে হয়, সারা দেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির খবর রাখেন বলে, সে সব কথা তাঁদের পক্ষে বোঝা সহজ হয়।

তাই আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে যখন শ্রেণী প্রতিষ্ঠান-গুলিকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়, তখন আমরা আশ্চর্যবোধ করি না। কোৎ দিভোয়ার-এ (হস্তিদন্ত উপকূল) 'স্যঁাদিকা আগ্রিকোল আফ্রিক্যাঁ' ও উগাণ্ডায় 'আফ্রিকান ফার্মার্স ইউনিয়ন' নামে কৃষকপ্রতিষ্ঠানদ্বয় নিজ নিজ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে। নাইজেরিয়া, ঘানা ও কোন কোন পূর্বতন ফরাসী উপনিবেশে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর ছাত্র যুবকেরা আন্দোলনের একস্তরে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছে।

শিল্পায়ন সীমাবদ্ধ হওয়ায়, সংখ্যার দিকে থেকে শ্রমিকশ্রেণী দু-একটি দেশ ছাড়া কোথাওই উল্লেখযোগ্য নয়। শ্রীটমাস হজকিন তাঁর 'ন্যাশনালিজম ইন কলোনিয়্যাল আফ্রিকা' নামক গ্রন্থে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে শ্রমিকশ্রেণীর যে আয়তন উল্লেখ করেছেন তার হিসেব আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি।

শ্রী হজকিনের হিসাবমত এই শতাব্দীর মাঝামাঝি তৎকালীন ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার ৫% মাত্র। এদের মধ্যে আবার একটা বৃহদংশ স্থায়ীশ্রমিক বনে যায় নি। অবশ্যই বিভিন্ন দেশে সমগ্র জনসংখ্যায় শ্রমিকদের সংখ্যানুপাত তুলনীয় নয়। রোডেশিয়ায় (তৎকালীন দক্ষিণ রোডেশিয়ায়) যেখানে শ্রমিকরা সমগ্র জনসংখ্যার ২৪% ছিল সেখানে জাম্বিয়া (তৎকালীন উত্তর রোডেশিয়া), কেনিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, ঘানা, পূর্বতন ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা ও তৎকালীন বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডে অনুরূপ সংখ্যানুপাত ছিল যথাক্রমে ১৩%, ৮%, ৬%, ৪·৫%, ২% ও ০·৩%।

শ্রমিকদের সংখ্যাল্পতা ছাড়াও উল্লেখ করা দরকার যে অনেক দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কর্তৃপক্ষের সুনজরে ছিল না এবং কোন কোন সরকার শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন বে-আইনী ঘোষণা করে। দক্ষিণ আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের লোকদের মিশ্র ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ, অথচ আফ্রিকান শ্রমিকদের ইউনিয়ন রেজিস্ট্রি করা হয় না। দক্ষিণ রোডেশীয় সরকার বরাবর আফ্রিকান শ্রমিক ইউনিয়নকে বিষদৃষ্টিতে দেখেছে। পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গোতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন গঠন আইন সম্মত ছিল না। সে বছর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলেও নিয়ম করা হয় যে প্রতি ইউনিয়নের সভায় জনৈক রাজকর্মচারী উপস্থিত থাকবে। এই নিয়মের ফলে সেখানকার শ্রমিক সংস্থাগুলি স্বাধীনভাবে বাড়তে পারে নি।

কিন্তু এতসব অসুবিধা সত্ত্বেও অধিকাংশ আফ্রিকান দেশে শ্রমিক আন্দোলন রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামে প্রত্যক্ষ সমর্থন জুগিয়েছে। ১৯৩৭ সালে ফ্রান্সের 'ফ্রঁ পপ্যুলেয়ার' সরকারের আমলে ফরাসী আফ্রিকান সাম্রাজ্যে সর্বপ্রথম আইনসঙ্গত শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। ভিশি আমলে কিছুদিন মন্দা পড়ার পর যুদ্ধোত্তরকালে আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গিনিতে শ্রীসেকু তুরে-র ক্ষমতাপ্রাপ্তি শ্রমিক নেতা হিসাবে। ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্রে অধুনা নিষিদ্ধ 'য়্যুনিওঁ দে পপ্যুলাসিওঁ' কামেরুনেজ্-এর (ইউ. পি. সি.) অন্যতম প্রধান সহায় ছিল জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন। অন্যান্য দেশের মধ্যে বেলজিয়ান কঙ্গোয় সংগ্রামী রাজনৈতিক আন্দোলনের শুরু হয় বেকার শ্রমিকদের বিক্ষোভে। কেনিয়ায় ১৯৫২ সালে ঘোষিত 'জরুরী' অবস্থার শুরু যে সঙ্কটকে কেন্দ্র করে তার উদ্বোধন হয় ১৯৫০ সালের সাধারণ ধর্মঘট থেকে। পরবর্তীকালে সেখানকার অন্যতম নেতা শ্রীটম এম্বোয়া শ্রমিক সংগঠক হিসেবে নিজের প্রভাব বিস্তার করেন। উত্তর রোডেশিয়ার 'তাম্র এলাকায়' ১৯৩৫, ১৯৪০, ১৯৫২, ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালের শ্রমিক ধর্মঘট আফ্রিকানদের সংগ্রামাত্মক চেতনার পরিচায়ক। নাইজেরিয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অবতারণা হয়েছে শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। ১৯৪৫ সালের সাধারণ ধর্মঘট, ১৯৪৯ সালে এনুগু শহরে খনিশ্রমিকদের ওপর গুলি-চালনা ও তার প্রতিবাদে সাধারণ ধর্মঘট এবং পরের বছর ইউনাইটেড আফ্রিকা কোম্পানীর বিরুদ্ধে সফল ধর্মঘট তার সাক্ষ্য দেয়। ঘানার সাধারণ নির্বাচনে শ্রীন্‌ক্রুমার কনভেনশন পিপ্‌ল্‌স্ পার্টির জয়লাভে অনেকখানি সহায়তা করে ১৯৫০-এর সাধারণ ধর্মঘট।

কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন ছাড়া, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও যুব প্রতিষ্ঠানগুলি আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রামে যে উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছে, সেকথা আমরা আগে বলেছি। সম্প্রতিকালের নেতাদের বেশির ভাগ এসেছেন এই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও বিভিন্ন পেশা থেকে। সেনেগালের রাষ্ট্রপতি শ্রীসেঙ্ঘর লেখাপড়া করেছেন ফ্রান্সে। নাইজেরিয়ার পূর্বতন রাষ্ট্রপ্রধান শ্রীআজিকিওয়ে-ও ('জিক' নামে খ্যাত) শিক্ষা পেয়েছেন আমেরিকায়। তিনি একাধারে সাংবাদিক, লেখক ও পেশাদারী রাজনৈতিক নেতা। কঙ্গোর লুমুম্বা ছিলেন সরকারী কর্মচারী। মালাবির হেস্টিংস বান্দা পেশায় চিকিৎসক। ট্যাঙ্গানাইকার জুলিয়াস নিয়েরেরে এক মিশনারী স্কুলে

শিক্ষকতা করতেন। কেনিয়ার জোমো কেনিয়াট্টা লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স এর ছাত্র।

মুক্তি সংগ্রামের এই সব নেতাদের প্রেরণার উৎস কোথায়? কোন্ আদর্শে তাঁরা উদ্বুদ্ধ? প্রধানতঃ ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার মাধ্যমে বাইরের পৃথিবীর বহুবিচিত্র ভাবাদর্শ তাঁদের নাগালের মধ্যে এসেছে। ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, মিশন ও প্যান-ইস্লামিক বন্ধন, সমাজতন্ত্র, পশ্চিমী গণতন্ত্র—এইসব আদর্শের কিছু না কিছু প্রভাব সংগ্রামী নেতৃত্বের অংশবিশেষে কোন না কোন সময়ে পড়ে। নতুন আফ্রিকার নেতাদের জীবনী তার অজস্র প্রমাণ দেবে।

চার

সমস্ত ব্যাপারটা তাহলে এই দাঁড়াল। আফ্রিকার রাজনৈতিক চৈতন্যোদয়কে সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর থেকে পৃথক করে দেখা যায় না। ইওরোপীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর আফ্রিকান দেশসমূহে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এসেছে। এইসব পরিবর্তনের ফলে একদিকে সনাতন সমাজের ভাঙন এবং অন্যদিকে নবশ্রেণী বিন্যাসের জন্ম সূচিত হচ্ছে। তাই সঙ্কীর্ণ উপজাতীয় গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজচেতনা বিকাশের সুযোগও ক্রমশঃ মিলছে।

উন্নতস্তরে গিয়ে এই চৈতন্যের পরিণতি হয় জাতীয়তাবোধে। বৃহত্তর সমাজচেতনার সংগ্রামে রূপায়ন ও সেই সংগ্রামের নেতৃত্বে নবোদ্ভূত শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও স্বাধীন বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন নেতার এইসব শ্রেণীতে জন্ম এবং এইসব শ্রেণীর নেতা হিসেবে তাঁদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার পূর্বোক্ত অবদানের অন্যতম লক্ষণ।

নবম অধ্যায় ঃ প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন

এক

আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন নামে খ্যাত। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মহাদেশে বহুভাষা ও উপভাষার প্রচলন, আছে শত শত উপজাতি, এবং তাদের বিভিন্ন সমাজ সংগঠন, ধর্ম ও আচার-ব্যবহার। কিন্তু এমন পার্থক্য সত্ত্বেও অনুরূপ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাই প্রধানতঃ এই ঐক্যবোধের প্রেরণা যুগিয়েছে। সারা আফ্রিকা মহাদেশ প্রথমে ইওরোপীয় বণিকদের এবং পরে একাধিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন ও শোষণের শিকার হয়েছে। আমরা জানি, ঔপনিবেশিক যুগের মধ্যাহ্নে ইথিওপিয়া ছাড়া আফ্রিকায় অন্য কোন স্বাধীন দেশের অস্তিত্ব ছিল না। বহিরাগত ইওরোপীয়দের অত্যাচার, নিজদের দুরবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা এবং ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনে উৎসাহ যুগিয়েছে, বিশেষতঃ যখন আফ্রিকানরা দেখেছে যে প্রতিযোগিতা যতই থাক সামগ্রিকভাবে ঔপনিবেশিকতা বজায় রাখতে ইওরোপীয়রা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে। সেযুগে পারস্পরিক মেলামেশা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ ছিল ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে, অতএব প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের জন্ম হয়েছে ইওরোপের মাটিতে। এবং যেহেতু আফ্রিকানদের তুলনায় আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর নিগ্রোরা শিক্ষায় ও রাজনৈতিক চৈতন্যে উন্নততর ছিল এবং যেহেতু তাদেরও বর্ণবৈষম্য ও শোষণের শিকার হতে হয়েছে, তাই স্বাভাবিকভাবে প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের প্রথম যুগের নেতৃত্ব দিয়েছেন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর নিগ্রোরা।

দুই

ত্রিনিদাদের এক নিগ্রো ব্যারিস্টার শ্রীহেনরী সিলভেস্টার উইলিয়ামস সর্বপ্রথম প্যান-আফ্রিকান আদর্শের রূপ দেন। লণ্ডনে পড়তে এসে সিলভেস্টার

উইলিয়ামস পশ্চিম আফ্রিকানদের সংস্পর্শে আসেন। পরে আইনজ্ঞ হিসাবে তিনি একাধিক আফ্রিকান উপজাতি প্রধানকের পরামর্শ দিয়েছেন। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে (রোডেশিয়া, গোল্ডকোস্ট ইত্যাদি) এই সময়ে বৃটিশ শাসকেরা আফ্রিকানদের জমি ছিনিয়ে নিতে উদ্যোগী হয়। জমি হস্তান্তরের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সিলভেস্টার উইলিয়ামস ১৯০০ সালে লণ্ডনে এক সম্মেলন আহ্বান করেন। প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়ের অন্যতম নেতা ডু বয়েস' এর ভাষায়: "এই সম্মেলন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং 'প্যান-আফ্রিকান' কথাটি সর্বপ্রথম বিভিন্ন অভিধানে স্থান পেল। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা প্রধানতঃ ইংল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও উত্তর আমেরিকার নিগ্রো সম্প্রদায় থেকে আসেন। এবং সম্মেলনের দাবিতে রাণী ভিক্টোরিয়া 'নেটিভ' অধিবাসীদের স্বার্থ ও মঙ্গলের দিকটা উপেক্ষা না করার" প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন বেশীদিন টিকে থাকে নি। কয়েক বছর বাদে সিলভেস্টার-উইলিয়ামস ওয়েস্ট ইণ্ডিজে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের অন্য কোন বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় নি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনে জোয়ার এল। কিন্তু তার স্রোত ছিল দ্বিমুখী। তার এক ধারার নেতা ছিলেন ডু বয়েস অন্য ধারার মার্কাস অরেলিয়াস গার্ভে।

১৯২০ সালে গার্ভে 'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনের মূল কথা ছিল: আফ্রিকানরা যেখানেই থাকুক না কেন (আমেরিকা কিংবা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) আফ্রিকা হল তাদের মাতৃভূমি। অতএব সব নিগ্রোকে আফ্রিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। গার্ভের বর্ণ-সচেতনতা যেন ইওরোপীয় বর্ণ-সচেতনতার উল্টো পিঠ। ইহুদীরা যেমন নিজেদের ঈশ্বর নির্বাচিত সম্প্রদায় ভাবে, গার্ভে তেমনি ভাবতেন যে নিগ্রোরা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ এবং মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভগবৎ প্রেরিত। তাঁর নিজের ভাষায়: "সমস্ত আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন শ্বেতাঙ্গ যেমন অবিমিশ্র 'শ্বেত' জাতিতে বিশ্বাসী। আমিও তেমনি অবিমিশ্র 'কৃষ্ণ' জাতিতে বিশ্বাসী।" অতএব তাঁর আন্দোলন বর্ণসঙ্করদের কোন স্থান ছিল না। 'খাঁটি' নিগ্রোদের নিয়ে গার্ভে সম্মেলন আহ্বান করেন ও পরে নিগ্রো জাতীয় চার্চ নিগ্রো জাহাজ কোম্পানী ও সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এইসব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে গার্ভে

'দি ইউনিভার্সাল, নিগ্রো ইমপ্রুভমেণ্ট অ্যাণ্ড আফ্রিকান কম্যুনিটিজ লীগ' নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়লেন।

১৯২০ সালে নিগ্রো 'রাষ্ট্রের' প্রথম পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসে নিউ ইয়র্ক শহরে। দূরদূরান্ত থেকে প্রতিনিধিরা এই অধিবেশনে যোগ দিতে আসেন। সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে ৩৩ বছর বয়স্ক গার্ভেকে আফ্রিকার অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে। একই সঙ্গে একটি 'ছায়া' মন্ত্রিসভা ও নির্বাচিত হয়। এবং রাজকীয় কায়দায় গার্ভে তাঁর অনুচরদের কারোকে নীলনদীর ডিউক, কারোকে কঙ্গোর আর্ল, কারোকে বা জাম্বেসির ব্যারন প্রভৃতি উপাধিতে বিভূষিত করলেন। আফ্রিকাকে মুক্ত করার জন্য গঠিত হল সার্বজনীন আফ্রিকান সেনাদল। অর্থ? প্রথম প্রথম তার অভাব হয় না। আমেরিকা, ইওরোপ ও আফ্রিকার নিগ্রোরা বহু দানখয়রাত করেন। বৃটিশ হণ্ডুরাসের এক নিগ্রো ধনী স্যর ইসাইয়া ইমানুয়েল মর্টার ('আফ্রিকার যুবরাজ' উপাধিপ্রাপ্ত) গার্ভেকে ১৫ লক্ষ টাকা দান করেন। নিগ্রো রাজ্যের লক্ষ্য প্রচারের জন্য গার্ভে ইংরাজী, ফরাসী ও স্পেনীয় ভাষায় 'নিগ্রো জগত' নামে এক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। ১৯২৩ সালে সংগঠনের কর্তারা দাবি করেন যে তাঁদের সভ্যসংখ্যা ৬০ লক্ষ।

'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলন শুধু কাগজপত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নি। লাইবেরিয়ায় মুক্তিপ্রাপ্ত নিগ্রো দাসদের উপনিবেশ স্থাপনের কথা আমেরিকান নিগ্রোরা ভোলে নি। গার্ভে ও তাঁর অনুগামী বন্ধুরা দাবি করলেন, "শ্বেত আমেরিকানরা আফ্রো-আমেরিকানদের লাইবেরিয়ায় যেতে ও সে দেশকে উন্নত করতে সহায়তা করুক। তারপর রয়েছে জার্মান উপনিবেশ। আমেরিকান ও ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান নিগ্রোরা মিত্রপক্ষের হয়ে মহাযুদ্ধে লড়াই করেছে। অতএব তাদের হাতে এই দেশগুলো তুলে দিতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে বাধ্য করা হোক। তার ওপর ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ইংল্যাণ্ডের কাছে আমেরিকা কোটি কোটি টাকা পায়। সে টাকা এই দেশগুলি এক্ষুনি শোধ দিতে পারছে না। বেশ, তারা সিয়েরা লিওন (বৃটিশ উপনিবেশ) ও আইভরী কোস্ট (ফরাসী উপনিবেশ) লাইবেরিয়া হাতে তুলে দিয়ে লাইবেরিয়াকে তার ইতিহাসের যোগ্য দেশ হয়ে উঠতে সাহায্য করুক।"

গার্ভের পরিকল্পনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশের কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতার সমর্থন পায়। আমেরিকার সরকারী সমর্থন পাওয়া যাবে এই

আশায় গার্ভে লাইবেরিয়ার এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল নিগ্রোদের বসতির জন্য লাইবেরীয় সরকারের কাছ থেকে কিছু জমি পাওয়া। লাইবেরিয়া রাষ্ট্রের শাসকেরা অধিকাংশ হচ্ছেন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের বংশধর। অতএব গার্ভের পরিকল্পনা তাঁদের সমর্থন পেল।

১৯২৪ সালে গার্ভে প্রেরিত দ্বিতীয় এক প্রতিনিধি দল লাইবেরিয়ার সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে সক্ষম হয়। ঠিক হল: (ক) প্রথম দুই বছরে ২০ থেকে ৩০ হাজারের মত নিগ্রো পরিবার লাইবেরিয়ায় যাবে। (খ) লাইবেরীয় সরকার বিনামূল্যে হাজার হাজার একর জমি এদের দেবেন। (গ) নবাগত নিগ্রোরা লাইবেরীয় সরকারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেবে। (ঘ) গার্ভের সংগঠন দি ইউনির্ভাস´াল নিগ্রো ইমপ্রুভমেণ্ট অ্যাসোসিয়েশন (ইউ. এন. আই. এ.) এই উপনিবেশ-পরিকল্পনার জন্য এক কোটি টাকা খরচ করবে। জনসাধারণকে এজন্য সাহায্যের আবেদন করা হয় এবং প্রভূত সাড়া পাওয়া যায়। এবং এই অর্থে ইউ. এন. আই. এ. নয়া ঔপনিবেশিকদের জন্য হাসপাতাল, টাউন হল, আদালত, ডাকঘর, পুলিস ঘাঁটি, সিনেমা, পাঠাগার, বিদ্যালয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি করে।

যখন এত আয়োজন হয়েছে তখন হঠাৎ লাইবেরীয় সরকার কনসেশন প্রত্যাহার করে এবং লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইউ. এন. আই. এ. যেসব মালমসলা লাইবেরিয়ায় পাঠায় এবং যা কিছু নির্মাণ করে সব বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেয়। লাইবেরিয়ার সরকারী মহল সন্দেহ করে যে লাইবেরিয়ার সরকারকে পদচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করাই হচ্ছে গার্ভে ও তাঁর দলবলের উদ্দেশ্য। তাছাড়া হয়তো লাইবেরিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর শাসক, বৃটেন ও ফ্রান্স, লাইবেরিয়াকে সাবধান করে দিয়েছিল যে তাদের উপনিবেশের এত কাছে এমন সংগ্রামমুখী আন্দোলন তারা সহ্য করবে না। কারণ যাই হোক ফল হল: গার্ভের 'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলনের আকস্মিক অপমৃত্যু।

লাইবেরিয়ার উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনার বুদ্বুদ বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া ছাড়া গার্ভে-আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হল নিগ্রো জাহাজ কোম্পানী ব্ল্যাকস্টার লাইনের দেউলিয়ায়। অবস্থা চরমে ওঠে যখন ১৯২৫ সালে গার্ভেকে মার্টিন সরকার প্রবঞ্চনার অপরাধে পাঁচ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। ভগ্নহৃদয় 'ভবিষ্যৎ আফ্রিকা-রাজ্যের রাষ্ট্রপতি' গার্ভে ১৯৪০ সালে প্রায়-বিস্মৃত ও অবজ্ঞাত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

গার্ভে নিজেকে নিগ্রোজাতির মোষেস বলতেন। মোসেস পরিচালিত ইহুদীদের সঙ্গে অবশ্য গার্ভে পরিচালিত আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-প্রবাসী নিগ্রোদের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। স্বভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে পরদেশে ইহুদীরা গোলামের মত দিন কাটাত। আর আফ্রিকা থেকে বলপ্রয়োগে নিগ্রোদের আমেরিকায় এনে সেখানে তাদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হয়েছিল। ইহুদীদের জেরুসালেমে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন মোসেস। নিগ্রোদের আফ্রিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল গার্ভের।

গার্ভের পরিকল্পনার অনেকখানি ছিল অবাস্তব। আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজএর সমস্ত নিগ্রো অধিবাসীদের আফ্রিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ইউ. এন. আই. এ.র মত কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম নয়। প্রথমতঃ কয়েকপুরুষ ধরে আমেরিকার মাটিতে বাস করে উচ্চতর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত আমেরিকান নিগ্রোরা যে আফ্রিকার অনুন্নত অঞ্চলে ফিরতে চাইত, তা মনে হয় না। আর তারা চাইলেও তাদের জন্য উপনিবেশ স্থাপন করার জায়গা কোথায়? ১৯২০ সালে আফ্রিকায় লাইবেরিয়া ও ইথিওপিয়া ছাড়া অন্য কোন স্বাধীন দেশ ছিল না। আর ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা যে তাদের অধীনস্থ অঞ্চলে গার্ভে-অনুগামীদের বসবাস করতে দেবে, এমন কথা ভাবা অলীক স্বপ্ন! সুতরাং রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভা নির্বাচন, উপাধি বিতরণ ও 'সৈন্যদল' গঠন সত্ত্বেও গার্ভের আশা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। মহাশূন্যে তো আর রাষ্ট্র গঠন করা যায় না।

তিন

গার্ভের প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রী ডু বয়েস 'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলনের মূল্যবিচার এইভাবে করেন, "এ আন্দোলন ছিল জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ যদিও সামগ্রিকভাবে এর বাস্তবে রূপায়ন অসম্ভব ছিল। তবু এর নিষ্ঠা ও ব্যবহারিক দিকের কথাও বলতে হবে। গার্ভে প্রমাণ করেছেন, তিনি যে শুধু এক অসাধারণ জনপ্রিয় নেতা তা-ই নয়, প্রচারকার্য চালানোতেও তিনি নিপুণ।" গার্ভে তাঁর নির্ভীক প্রচার ও সংগঠনে সারা দুনিয়ার নিগ্রোদের এক নতুন প্রেরণা ও স্বাজাত্যগর্ব এনে দেন। অন্য সব কিছু ভুলে গেলেও এ অবদান কিছু কম নয়।

গার্ভে ছিলেন উপপ্লবক জননেতা জনমনস্তত্ত্ব তিনি ভাল বুঝতেন, কেমন করে বিক্ষোভ জাগাতে হয়, কেমন করে সাহস ও বিশ্বাস দিতে হয়; এসব ছিল তাঁর নখদর্পণে। পক্ষান্তরে ডু বয়েস ছিলেন মননশীল অধ্যাপক। গার্ভে যেখানে আবেদন করতেন হৃদয়বৃত্তির কাছে, ডু বয়েস'এর আবেদন সেখানে যেত বুদ্ধিবৃত্তিতে। গার্ভে ইওরোপীয় বর্ণসচেতনতা ও জাতিগঠনে আঘাত করতে চাইতেন কৃষ্ণবর্ণগর্ব দিয়ে, আর ডু বয়েস ছিলেন সকল প্রকার জাতি-আভিজাত্যগর্বের শত্রু। অজস্র রচনা ও বক্তৃতায় তিনি 'শ্বেত' জাতির শ্রেষ্ঠত্বের মুখোস খুলে দিয়েছেন। প্রচার ও আন্দোলনে তিনি গার্ভের অনেক আগে নেমেছেন। এবং গার্ভে যখন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্মভূমি জ্যামেইকা ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন, ডু বয়েস ততদিন আমেরিকান নিগ্রোদের কিছু অংশকে সংগঠিত করতে পেরেছেন।

যাই হোক, প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের দুর্ভাগ্যবশতঃ ডু বয়েস ও গার্ভে এক সঙ্গে কাজ করতে পারেন নি। তার একটা কারণ আমরা আগেই বলেছি, ডু বয়েস গার্ভের মত বর্ণাভিজাত্য ও বর্ণসচেতনতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। দ্বিতীয় এক কারণ ডু বয়েস ছিলেন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। 'বর্ণসমস্যাকে তিনি ধনতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করেন নি। পক্ষান্তরে গার্ভে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখেন নি। তাঁর নিজের ভাষায় পৃথিবীর প্রগতির জন্য ধনতন্ত্রের প্রয়োজন আছে। যারা এর বিরুদ্ধে অযৌক্তিকভাবে এবং যথেচ্ছাক্রমে বাধা দেয় তারা মানবিক প্রগতির শত্রু। গার্ভের আক্ষেপ শুধু ছিল "আফ্রিকা কেন পৃথিবীকে কৃষ্ণাঙ্গ রকফেলার, রথসচাইল্ড ও হেনরি ফোর্ড উপহার দেবে না?" অন্যদিকে ডু বয়েস ৯০ বছর বয়সে ১৯৫৮ সালে ঘানায় অনুষ্ঠিত সারা আফ্রিকান সম্মেলনে বাণী পাঠাচ্ছেন, "বেসরকারী ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে নির্বাচনের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বেসরকারী ধনতন্ত্রের দিন শেষ হয়ে গেছে।······যে আফ্রিকান উপজাতি থেকে আপনাদের সকলের জন্ম সে আফ্রিকান সমাজ প্রথম থেকে-ই ছিল সাম্যাত্মক ···পশ্চিমী পুঁজিবাদীদের ভিক্ষান্নের জন্য আপনাদের মহান ঐতিহ্য বিক্রয় করার চেয়ে বরং আপনাদের আর কিছুদিন উপবাসে থাকা শ্রেয়ঃ। ···আফ্রিকা জাগো।"

এই ঘোষণার পর তিন বছরও যায় নি। ৯৩ বছরের নেতা ডু বয়েস মার্কিন কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছেন।

কার্যক্রমের দিক থেকেও ডু বয়েসের আন্দোলন ভিন্নমুখী ছিল, কারণ "ফিরে চল আফ্রিকা'র ডাকে ডু বয়েস ভোলেন নি। তাঁর আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকায় আফ্রিকানদের মুক্তি সংগ্রামে সকলের সমবেত সাহায্য দান।

এই উদ্দেশ্যে ডু বয়েসের নেতৃত্বে ১৯১৯ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে পাঁচটি প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। প্রথম কংগ্রেস বসে ১৯১৯ সালে পারী শহরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও আফ্রিকার বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে মোট ৫৭ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। সম্মেলন থেকে যেসব দাবি তোলা হয় তার মধ্যে এইগুলি ছিল প্রধান :

(অ) আফ্রিকার জার্মান উপনিবেশগুলিতে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে অছি শাসন প্রবর্তিত হোক। (পরবর্তীকালে লীগ অফ নেশন্স-এর ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থা)।

(আ) আফ্রিকার অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য মিত্রশক্তিরা কতকগুলি সাধারণ নীতি গ্রহণ করুক।

(ই) লীগ অফ নেশন্স কর্তৃক এই নিয়মগুলির বাস্তবে রূপায়ন তত্ত্বাবধানের জন্য এক স্থায়ী কার্যালয় স্থাপিত হোক।

প্রথম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস-প্রস্তাবিত ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থা লীগ অফ নেশন্স কর্তৃক গৃহীত হয়। এ ছাড়া সাধারণভাবে কংগ্রেস আফ্রিকার সমস্যা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক জনমত ও বিশেষ করে ভার্সাই সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। 'নিউ ইয়র্ক ইভনিং গ্লোব' পত্রিকার পারীর প্রতিনিধি লেখেন "ইতিহাসে এই ধরনের সম্মেলন এই প্রথম।" ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৯ সালে নিউইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকা মন্তব্য করে "প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস রচিত কর্মসূচীতে অযৌক্তিক কিছু নেই।"

প্রথম কংগ্রেসের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ডু বয়েস ও তাঁর বন্ধুরা ১৯২১ সালে দ্বিতীয় কংগ্রেসের আয়োজন করলেন। এই কংগ্রেসে সবসুদ্ধ ১১৩ জন প্রতিনিধি যোগ দেন তার মধ্যে ৪১ জন ছিলেন খোদ আফ্রিকা থেকে। লণ্ডন, ব্রাসেল্স ও পারী শহরে সম্মেলনের অধিবেশন বসে এবং স্থানীয় সমাজ-তন্ত্রী ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের অনেকে একে অভিনন্দন জানান। কংগ্রেস ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের দাবি ওঠে এবং ডু বয়েসের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল লীগ অফ নেশন্সের নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা

করতে যায়। দ্বিতীয় প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের আবেদনপত্রটি লীগের 'সরকারী দলিল' হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে।

এই সময় পারী শহরে প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের একটি স্থায়ী অফিস স্থাপন করার চেষ্টা হয়। কিন্তু কয়েক বছর কাজ করার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি লণ্ডন ও লিসবনে তৃতীয় প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। লণ্ডন সম্মেলনে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি, যোগদান করেন এইচ. জি. ওয়েলস এবং বাণী পাঠান ভাবী প্রধান মন্ত্রী শ্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

(১) স্বদেশ শাসনে ঔপনিবেশিক জনগণের অংশ গ্রহণের অধিকার।

(২) সকলের জন্য বিনা খরচে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা।

(৩) আফ্রিকানদের স্বার্থে আফ্রিকার উন্নয়ন দাবি।

(৪) পৃথিবীব্যাপী নিরস্ত্রীকরণ ও যুদ্ধ বেআইনী ঘোষণা। কিন্তু যদি এ লক্ষ্য বাস্তবে প্রয়োগ না করা যায়, তবে যতদিন শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, ততদিন আত্মরক্ষায় কৃষ্ণাঙ্গদের অস্ত্রধারণের অধিকার।

কংগ্রেসের লিসবন অধিবেশনে পর্তুগালের দুজন প্রাক্তন ঔপনিবেশিক মন্ত্রী বক্তৃতা করেন এবং পর্তুগীজ উপনিবেশ 'চুক্তিবদ্ধ শ্রম' (যা 'প্রায় দাসত্ব'-এর পর্যায়ে পড়ে) বিলোপ করতে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন।

ডু বয়েস চতুর্থ প্যান কংগ্রেসের পরিকল্পনা করেন ১৯২৫ সালে। তাঁর মতলব ছিল একটা জাহাজ ভাড়া করে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে প্রচার পর্যটন চালাবেন। এবং তারপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কোন এক শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। দুঃখের বিষয় জাহাজ কোম্পানীগুলির সহানুভূতির অভাবে তাঁর পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়।

এর দু'বছর বাদে ১৯২৭ সালে চতুর্থ প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন সম্ভবপর হয়। নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে গোল্ডকোস্ট, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন ও নাইজেরিয়া থেকে প্রতিনিধিরা যোগদান করেন।

ডু বয়েস লিখছেন "১৯২৯ সালে আমরা অনেক চেষ্টা করি আফ্রিকা মহাদেশে পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশন বসানোর জন্য। যাতায়াত সহজ বলে আমরা টিউনিস শহরটি নির্বাচন করি।...কিন্তু দু'টি দুরতিক্রম্য বাধা উপস্থিত হল। প্রথমতঃ ফরাসী সরকার খুব ভদ্র অথচ দৃঢ়ভাবে আমাদের জানালেন যে সম্মেলন ফ্রান্সের যে কোন শহরে অনুষ্ঠিত

হতে পারে। কিন্তু ফরাসী আফ্রিকায় নয়। আর দ্বিতীয় বাধা এল: দুনিয়া ব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা।" অর্থনৈতিক মন্দা শেষ হতে না হাতে যুদ্ধের বিপদ ঘনিয়ে এল। ফলে পঞ্চম কংগ্রেস ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের আগে অনুষ্ঠিত হতে পারে নি।

অবশ্য তার আগে পর্যন্ত আফ্রিকার ঐক্যকামী নেতারা যে নিষ্ক্রিয় ছিলেন তা নয়। ইতালী যখন ইথিওপিয়া আক্রমণ করে, তখন ইণ্টারন্যাশনাল আফ্রিকান ফ্রেণ্ডস অফ আবিসিনিয়া নামে এক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় যার উদ্দেশ্য ছিল ইথিওপিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করা। এই সংস্থার কিছু নেতৃস্থানীয় সদস্য অন্য কয়েকজন উৎসাহী লোকের সাহায্যে ১৯৩৭ সালে ইণ্টারন্যাশনাল আফ্রিকান সার্ভিস ব্যুরো নামে নতুন এক প্রতিষ্ঠান খাড়া করা হয়। নামে আফ্রিকান হলেও ব্যুরো অনাফ্রিকান জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামেও সমর্থন জানায়। এবং অনাফ্রিকানদের এতে 'সংশ্লিষ্ট' সদস্যপদ লাভ করার অধিকার দেওয়া হয়। ১৯৪৪ সালে ইণ্টারন্যাশনাল আফ্রিকান সার্ভিস ব্যুরো প্যান-আফ্রিকান ফেডারেশনের সঙ্গে মিশে যায়। প্যান-আফ্রিকান ফেডারেশনে বৃটেন ও বৃটিশ আফ্রিকার নানা সংগঠন সম্মিলিত হয়েছিল। সংগঠন ও আদর্শ উভয় দিক থেকে প্যান-আফ্রিকান ফেডারেশন প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস আন্দোলনের বৃটিশ শাখার রূপ নিল।

পরের বছর পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ২০০ প্রতিনিধি ম্যাঞ্চেস্টারে পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করে। এই প্রথম আফ্রিকা থেকে যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি প্যান-আফিকান কংগ্রেসে আসলেন। গোল্ডকোস্ট থেকে এলেন নক্রুমা। কেনিয়া থেকে জোমো কেনিয়াট্টা, সিয়েরা লিওন থেকে ওয়ালেস জনসন। আফ্রিকার জনগণের (বিশেষ করে পশ্চিম আফ্রিকার) স্বাধীনতার দাবি সমর্থন ছাড়া সম্মেলন দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের অশ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদ জানায় এবং রোডেশিয়া ও নায়াসাল্যাণ্ডের আফ্রিকানদের ওপর জোর করে যুক্তরাষ্ট্র চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টার নিন্দা করে সম্মেলন-শেষে কংগ্রেস ঔপনিবেশিক শক্তিদের আটলাণ্টিক সনদের নীতিগুলি মেনে চলতে আহ্বান জানায়।

পঞ্চম প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের পরবর্তী সার্ধদশকে আফ্রিকায় মুক্তি-কামীর জাতীয় আন্দোলন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। এবং ১৯৫৭ সালে গোল্ডকোস্ট স্বাধীনতা পাবার কয়েক বছরের মধ্যে মহাদেশের বিস্তৃত এলাকা

বিদেশী শাসন মুক্ত হয়। এতগুলি স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের নবপর্যায় শুরু হয়েছে। এই নবপর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি কী দেখা যাক।

তিন

এতদিন প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন বেসরকারী আন্দোলন হিসাবে পরিচালিত হচ্ছিল। আফ্রিকা মহাদেশে সংগঠন করা তো দূরের কথা, পাঁচটি কংগ্রেসের একটিও আফ্রিকার বুকে মিলিত হতে পারে নি। আফ্রিকায় এতগুলি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হবার পর প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন তার বাণী সোজাসুজি লক্ষ লক্ষ আফ্রিকাবাসীর কাছে পৌছে দেবার সুযোগ পেয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের অর্থ-সমস্যাও মিটেছে। অর্থাভাবে কোন আফ্রিকান ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারছে না একথা আজ ভাবনাতীত।

পক্ষান্তরে সারা দুনিয়াব্যাপী ঐক্যবদ্ধ নিগ্রো ফ্রন্ট গঠন করার প্রেরণাও বুঝি আর তেমন শক্তিশালী নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো অধিবাসীদের অবস্থা আগের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে উন্নততর হয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এ নিগ্রোরা আত্মস্বাতন্ত্র্যের পথে এগিয়ে গেছে। সর্বোপরি আফ্রিকার বহু উপনিবেশ শুধু যে স্বাধীনতা পেয়েছে তাই নয়। তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব এমন কি শত্রুতা পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। ইথিওপিয়া ও সোমালিয়া, শাদ প্রজাতন্ত্র ও সুদান, গিনি ও আইভরী কোস্ট, এবং মরক্কো ও মরিতানিয়ার বিবাদ, তার যথেষ্ট প্রমাণ। আমরা এ অধ্যায়ের প্রথমে বলেছিলাম প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের ভিত্তি হল অনুরূপ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। পরাধীন, শোষিত ও ঘৃণিত আফ্রিকানদের স্বাতন্ত্র্য চেতনা খুব স্বাভাবিক। আজ যখন আফ্রিকানরা স্বাধীন হয়ে বিশ্বসভায় নিজেদের সম্মানজনক স্থান আদায় করে নিতে পারছে, তখন তাদের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, উপজাতি ও সমাজাদর্শ অনুযায়ী বিভেদ জাগাটা খুব অভাবিত বলা যায় না। অথচ অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ও বিশ্বরাজনীতিতে নিজদের মতামত জোর দিয়ে বলার জন্য ঐক্যের প্রয়োজন আছে একথা আফ্রিকায় সাধারণভাবে স্বীকৃত। এবং সেই উদ্দেশ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও দ্বিপাক্ষিক

কি বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন যে দরকারী একথার যৌক্তিকতাও আজ সাধারণভাবে গ্রাহ্য।

১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে আফ্রিকার ইতিহাসে সর্বপ্রথম ৮টি স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্র [ইথিওপিয়া, ঘানা, টিউনিসিয়া, মরক্কো, লাইবেরিয়া, লিবিয়া সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও সুদান] পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আক্রায় মিলিত হয়। সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয় তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হল, (ক) আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলিকে স্বাধীনতা দেবার সময় নির্দিষ্ট করে ঘোষণার জন্য ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের প্রতি আহ্বান; (খ) আলজেরিয়ার জনমুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন; (গ) দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

এরপর একাধিক আন্তঃরাষ্ট্র সম্মেলন থেকে উর্ধ্বোক্ত প্রস্তাবের অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে: (১) নয়টি আফ্রিকান রাষ্ট্রের উদ্যোগে ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত মনরোভিয়া সম্মেলন; (২) ১৯৬০ সালের এপ্রিলে আক্রায় দক্ষিণ আফ্রিকা ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী "নিশ্চয়াত্মক কার্যক্রম" সম্মেলন; (৩) ১৯৬০ সালের জুনমাসে আদ্দিস আবাবায় দশটি আফ্রিকান রাষ্ট্রের সম্মেলন, (৪) ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত ছ'টি রাষ্ট্রের কাসাব্লাঙ্কা সম্মেলন।

আলাপ-আলোচনা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন শুধু রাষ্ট্রনেতাদের বৈঠকে সীমাবদ্ধ থাকে নি। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল আর জনসংগঠন-গুলির সোৎসাহ শক্তিও একাজে লাগানো হয়েছে।

১৯৫৮ সালের শেষে ৫০টি আফ্রিকান রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন, ছাত্রসঙ্ঘ ও অন্যান্য সংস্থা থেকে আগত প্রায় ২০০ প্রতিনিধি আক্রায় মিলিত হয়। সম্মেলনের এক কমিটি প্রস্তাব করে যে প্রথমে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় ৫টি যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং তারপর সারা আফ্রিকা জুড়ে একটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করা হবে। এরপর ১৯৬০ সালে টিউনিসে এবং ১৯৬১ সালে কায়রো শহরে সারা আফ্রিকান জন-সম্মেলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

কয়েকটি ক্ষেত্রে ঐক্যের আগ্রহ মাঝে মাঝে সম্মেলন অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। চেষ্টা হয়েছে বৃহত্তর রাজনৈতিক সত্তা গঠনের। অবশ্য এখন

পর্যন্ত এই স্তরে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায় নি। বরং ঐক্যকামীরা পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন মালি যুক্তরাষ্ট্র গঠন প্রচেষ্টার শোচনীয় পরিণতি এবং ঘানা-গিনি-মালি সংযুক্ত প্রস্তাবের বাস্তব রূপায়নে ব্যর্থতা।

মালি যুক্তরাষ্ট্র গঠন প্রচেষ্টার ইতিহাস আর একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাক।

দ্য গ্যলের পঞ্চম প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তনের পর একদিকে যেমন ফ্রান্সের চাপিয়ে দেওয়া বৃহত্তর রাজ্য ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা ভেঙে গিয়ে আটটি পৃথক দেশে (মরিতানিয়া, গিনি, সেনেগাল, সুদান, আইভরী কোস্ট উর্ধ্ব ভলতা, নাইজার, দাহোমে) পরিণত হল, অন্যদিকে তেমনি স্বেচ্ছায় স্ব-উদ্যোগে বৃহত্তর রাষ্ট্র গঠনের সুযোগও এল। এর প্রথম প্রকাশ দেখা দেয় সেনেগাল, সুদান (ভূতপূর্ব ফরাসী সুদান), উর্ধ্ব ভলতা ও দাহোমে'র মালি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টায় (ডিসেম্বর, ১৯৫৮)। এই সিদ্ধান্তের পর এক যুক্তরাষ্ট্রীয় গণপরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে মালি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করে যার আদর্শ ছিল চতুর্থ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান।

সরকারীভাবে মালি যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয় ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে। তার মধ্যে কিন্তু উর্ধ্ব ভলতা ও দাহোমে পশ্চাদপসরণ করেছে। অর্থাৎ মালি যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত গঠিত হয়েছে মাত্র, দুটি দেশ নিয়ে সুদান (পূর্বতন ফরাসী সুদান) ও সেনেগাল। সেপ্টেম্বর মাসে মালি যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের সঙ্গে শিথিল বন্ধন বজায় রেখে স্বাধীনতা চায়। পরের বছর (১৯৬০) এপ্রিল মাসে ফ্রাঙ্কো-মালি চুক্তিতে মালির পূর্ণ স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর জুনমাসে মালি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বাধীনতার পর মালি যুক্তরাষ্ট্র দু' মাসের বেশী টেঁকে নি। আগস্ট মাসের শেষার্ধে সুদানী ও সেনেগালী নেতৃত্বের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিয়। সেনেগালী নেতাদের অনেকে অভিযোগ করেন যে সুদানী নেতারা (বিশেষ করে শ্রী মোদিবো কেইতা) অন্যায়ভাবে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করতে চাইছেন। শ্রী কেইতা (যিনি সুদান ও মালি যুক্তরাষ্ট্রের উভয়ের প্রধান মন্ত্রী) সেনেগালী নেতাদের পদচ্যুত করলেন। অন্যদিকে সেনেগালী আইন পরিষদ পৃথকভাবে মিলিত হয়ে সেনেগালের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কেইতা ও অন্য অনেক সুদানী নেতাকে স্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হয়। কয়েকদিন পরে তাঁদের মুক্তি

দিয়ে সুদানের রাজধানী বামাকো শহরে পাঠানো হয়। সুদানের নেতারা অভিযোগ করেন সুদান-সেনেগাল সংঘর্ষের মূল কারণ মালিস্থ উচ্চপদস্থ ফরাসী কর্মচারীরা। সঙ্গে সঙ্গে দাবি করা হয় যে সংবিধানতঃ মালি যুক্তরাষ্ট্র এরকমভাবে ভেঙে দেওয়া যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে সুদামী আইন পরিষদ মালি যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যু ঘোষণা করে।

পশ্চিম আফ্রিকার রাজনীতিতে যাঁরা অপেক্ষাকৃত বামপন্থী কিংবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাঁরা পশ্চিমী নেতৃত্ব সরাসরি মেনে নিতে অনিচ্ছুক তাঁদের ঐক্য প্রচেষ্টা ঘানা-গিনি-মালি ইউনিয়ন ও মালি যুক্তরাষ্ট্র গঠন প্রচেষ্টায় প্রকাশ পেয়েছে বলা যায়। এঁরা ছাড়া পাশ্চাত্যপন্থী রাষ্ট্রনায়করাও নিজেদের ঐক্য গড়ার কাজে নেমেছেন। মালি যুক্তরাষ্ট্র উদ্বোধনের কিছুদিন বাদে কোৎ দিভোয়ার (হস্তিদন্ত উপকূল), উর্ধ্ব ভলতা, নাইজার ও দাহোমে মিলে 'সাহেল-বেনিন' ইউনিয়ন গঠন করে। এই চারটি দেশ, বিশেষ করে প্রথম দু'টির মধ্যে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্বন্ধ রয়েছে। জনসংখ্যার চাপের ফলে ভলতার বহু নাগরিককে কোৎ দিভোয়ারে গিয়ে জীবকার্জন করতে হয়। ভলতার আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের গতিপথ হল কোৎ দিভোয়ারের আবিজান বন্দর দিয়ে। অতএব এইসব রাষ্ট্রের পক্ষে ঘনিষ্ঠ সহযোগ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কোৎ দিভোয়ারের রাজধানী আবিজানে ১৯৫৯ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত এক সভায় মিলিত হয়ে এই চারটি দেশের নেতৃবৃন্দ সাহেল-বেনিন ইউনিয়ন গঠনের জন্য কয়েকটি বাস্তব বিধানের কথা ঘোষণা করেন :

(ক) উল্লিখিত চারটি দেশ নিয়ে এক শুল্ক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা ;

(খ) অর্থ, বিচারব্যবস্থা, শ্রম, পরিবহন, জনস্বাস্থ্য ও করব্যবস্থা সম্পর্কে এইসব দেশের আইনাবলীর সামঞ্জস্য বিধান ;

(গ) পারস্পরিক সাহায্যের জন্য সংহতি-তহবিল স্থাপন ;

(ঘ) ইউনিয়নের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসাবে এক 'কঁসেই দ্য ল'াতাৎ' (মৈত্রী পরিষদ) গঠন।

পরে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, মৈত্রীপরিষদে টোগো প্রজাতন্ত্রকে পূর্ণসদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়, যদিও ল'াতাৎ শক্তিবর্গের অন্যতম ঘোষিত লক্ষ্য, শুল্ক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা এখনও বাস্তবে রূপায়িত হয় নি।

সাহেল-বেলিন ইউনিয়ন বা কঁসেই দ্য ল'াতাৎ গঠনের প্রধান হোতা

আইভরী কোস্টের নেতা শ্রীহুফুয়ে-বোয়াঞি। মালি যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের পরিবর্তে তিনি যে অন্য এক রাষ্ট্রগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করবেন এতে অবাক হবার কী আছে? মৌলিক আদর্শের বিচারে মালির প্রধানতম সমর্থক সুদানের নেতৃবৃন্দের তুলনায় শ্রীহুফুয়ে বোয়াঞি অনেক বেশী দক্ষিণপন্থী। তাছাড়া ফরাসী 'কম্যুনিতে'র সঙ্গে স্বাধীন আফ্রিকান দেশগুলি কী ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করবে সে বিষয়েও মালির নেতাদের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেন নি। যেখানে মালির নেতারা ফরাসী 'কম্যুনিতে'কে কমনওয়েলথের আদর্শে গড়ে তুলতে চাইছিলেন, সেখানে ফ্রান্সের সঙ্গে আফ্রিকান দেশগুলিকে ঘনিষ্ঠতর বন্ধনে আবদ্ধ করাই হুফুয়ে-বোয়াঞির অভিপ্রায় ছিল।

কিন্তু মালি যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরে কঁসেই দ্য ল'াতাতের সদস্য রাষ্ট্রগুলি (উর্ধ্ব ভলতা, নাইজার, দাহোমে ও আইভরী কোস্ট) পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে এই চারটি দেশ স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়, যদিও স্বাধীনতা পাবার পরেও গিনি ও মালির তুলনায় এসব দেশে ফরাসী প্রভাব অনেক বেশী মাত্রায় বজায় থাকে।

পশ্চিমপন্থী রাষ্ট্রনেতাদের ঐক্য প্রচেষ্টা অন্যত্রও দেখা গেছে। মালি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অব্যবহিত পরে পূর্বতন ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকার চারটি দেশ, অর্থাৎ মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র (আগেকার নাম উবাগ্যাই-শারি), কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (আগেকার নাম মধ্য কঙ্গো) গাবোঁ প্রজাতন্ত্র ও শাদ প্রজাতন্ত্র, এক শুল্ক ইউনিয়ন ও 'অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্র' গঠন করল। এই রাষ্ট্রসঙ্ঘে পণ্য, সম্পত্তি ও মূলধনের অবাধ গতিবিধির অধিকার স্বীকৃত হয়। এছাড়া বন্দর, রেলপথ, নৌবাহন এবং টেলিকম্যুনিকেশন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এক যৌথ অধিকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তও গৃহীত হল। কিন্তু 'অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্র' স্থাপন করলেও প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা সমর্থন করেন নি।

এছাড়া ১৯৬১ সালে বারটি ফরাসীভাষী আফ্রিকান রাষ্ট্রের সমবেত প্রচেষ্টায় গঠিত হল 'যুনির্ঁ আফ্রিক্যান এ মালাগাশ (U.A.M.),। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিই ছিল এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। সারা আফ্রিকা ঐক্য সংস্থা (O A V) স্থাপনের পর এই প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য আফ্রিকান ও মালাগাশী সংগঠন (U A M C E)।

প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের পরোক্ষ ফল হিসাবে এসেছে আফ্রিকা উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও নিখিল আফ্রিকা ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা। এছাড়া আন্তর্জাতিক নদী ও হ্রদের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একাধিক আন্তঃরাষ্ট্র সংস্থা স্থাপিত হয়েছে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (১) শাদ হ্রদ অববাহিকা কমিশন (শাদ ক্যামেরুন, নাইজার ও নাইজেরিয়া ১৯৬৪ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠা করে); (২) নাইজার নদী কমিশন (উর্ধ্ব ভলতা শাদ, মালি, নাইজার, নাইজেরিয়া, গিনি, আইভরী কোস্ট, দাহোমে ও ক্যামেরুন ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে স্থাপন করে); (৩) সেনেগাল নদী কমিশন (সেনেগাল, মরিতানিয়া, মালি ও গিনি ১৯৬৫ সালের মে মাসে শুরু করে)।

গত কয়েক বছরে অবশ্য প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য সাফল্য হল আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার প্রতিষ্ঠা। ১৯৬৩ সালের মে মাসে আফ্রিকার ৩০ জন রাষ্ট্রপ্রধান ও কয়েকটি উপনিবেশের মুক্তি আন্দোলনের নেতারা আদ্দিস আবাবায় মিলিত হয়ে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার সনদ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন এবং এমনিভাবে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার গোড়াপত্তন হয় দুটি প্রধান লক্ষ্য নিয়ে (১) আফ্রিকার ঐক্য ও সংহতিরক্ষা এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন; এবং (২) আফ্রিকা থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিকতার পূর্ণ উচ্ছেদ। আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ:

(ক) রাষ্ট্রপ্রধান পরিষদ; (খ) বৈদেশিক মন্ত্রি-পরিষদ; (গ) সেক্রেটারিয়েট; (ঘ) সালিশী কমিশন; (ঙ) বিশেষ বিশেষ কমিশন (যথা, অর্থনৈতিক সামাজিক কমিশন, শিক্ষা সংস্কৃতি কমিশন, স্বাস্থ্য কমিশন ইত্যাদি)।

আজ আফ্রিকান ঐক্যসংস্থার আয়ু প্রায় চার বছর এবং এর সাফল্য আংশিকমাত্র। রোডেশিয়ার শ্বেতপ্রভুত্বের বিরুদ্ধে অনুরূপ নীতি গ্রহণ ও তার বাস্তব রূপায়নে ঐক্য সংস্থার শোচনীয় ব্যর্থতা বেদনাদায়ক। তেমনি বারংবার চেষ্টার পরও অনেক আন্তঃরাষ্ট্র বিবাদ সমাধানে এই প্রতিষ্ঠান অপারগ হয়েছে। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য বোধহয় পরাধীন অঞ্চল-গুলিতে মুক্তিসংগ্রামীদের সাহায্যদানে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আঙ্গোলা ও রোডেশিয়ায় মুক্তিসংগ্রামীদের অন্তর্বিরোধ মেটানো যায় নি। তবু অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা এখনও বেঁচে আছে এবং শুধু

তাই নয় সর্বস্তর ও ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিস্তারে এই প্রতিষ্ঠানটি সক্রিয় প্রচেষ্টারত।

চার

প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের রূপরেখা আমাদের সামনে স্পষ্ট। অতীতে গার্ভের নেতৃত্বে যে 'ফিরে চল আফ্রিকায়' আন্দোলন শুরু হয় আজ এ মহাদেশে বহু দেশ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও তার কোন অস্তিত্ব নেই। বরং ডু বয়েস প্রভৃতির পরিচালনায় প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন অন্ততঃ কিছু পরিমাণে সফল হয়েছে বলা যায় যেহেতু মহাদেশের এক বিস্তৃত অঞ্চল থেকে ঔপনিবেশিক শাসন লুপ্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগ বিস্তৃতিলাভ করছে। পক্ষান্তরে উপজাতি ভাষা, ধর্ম, সমাজ ও অর্থনীতির পার্থক্য ছাড়া আজ মৌলিক মতাদর্শ ও নীতির সংঘাতও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই আফ্রিকান ঐক্যের ক্ষেত্রে দেখতে পাই দুই বিপরীতধর্মী স্রোত। একদিকে গিনি মালি, টানজানিয়া ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি রাষ্ট্রের নেতৃত্বে কাসাব্লাঙ্কা গোষ্ঠী : পূর্ব-পশ্চিম বিবাদে নিরপেক্ষতা অবলম্বন ও আফ্রিকায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ যাদের লক্ষ্য। অন্যদিকে আইভরী কোস্ট, মরিতানিয়া, সেনেগাল ও কামেরুন প্রভৃতির নেতৃত্বে মনরোভিয়া গোষ্ঠী : যারা পূর্বোক্ত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশী পশ্চিমপন্থী। এই দুই গোষ্ঠী পৃথকভাবে অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অনুরূপ নীতি ও ব্যবস্থা অবলম্বনের দিকে কিছুটা এগিয়েছে। কিন্তু এই বিভেদ সত্ত্বেও তারা মিলিত হয়েছে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থায়।

দশম অধ্যায় : ফরাসীভাষী আফ্রিকার কথা

এক

আয়তনের দিক থেকে আফ্রিকায় সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য ছিল ফ্রান্সের। আফ্রিকা মহাদেশে ফ্রান্সের অধীনস্থ অঞ্চলগুলোকে একসঙ্গে জড় করলে ভারতবর্ষের প্রায় চারগুণ বড় হত। ম্যাডাগাস্কার বাদে সমস্ত ফরাসী উপনিবেশ আফ্রিকার উত্তরাংশে (অর্থাৎ বিষুবরেখার উত্তরে) অবস্থিত ছিল। কিন্তু এই বিরাট অঞ্চলে ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, অধিবাসী, ভাষা ও প্রাকৃতিক সম্পদ কোন দিক থেকেই মিল ছিল না। সাহারা থেকে বিষুবরৈখিক অঞ্চলে ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর অনেক প্রভেদ। উত্তর আফ্রিকার (মরক্কো, টিউনিসিয়া ও আলজেরিয়ার) অধিবাসীরা হল আরব ও বার্বার, তারা হ্যামিটিক ও সেমিটিক ভাষায় কথা বলে। ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকায় খাঁটি নিগ্রোদের বাস —তারা বিভিন্ন নিগ্রোভাষায় কথা বলে। প্রাকৃতিক সম্পদে পশ্চিম আফ্রিকার সমৃদ্ধির পাশে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার সোমালিল্যাণ্ড ম্লান।

এই সব বিসদৃশ বিভিন্নধর্মী অঞ্চল একসূত্রে গ্রথিত হয় এক ঐতিহাসিক কারণে: ফ্রান্স তাদের জয় করে।

উপনিবেশ ও অন্যান্য অধীনস্থ অঞ্চলগুলি স্বাধীনতা পাওয়ার আগে পর্যন্ত ফ্রান্স আফ্রিকার যে যে অঞ্চলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করত তাদের নাম ও পরিচয় নীচে দেওয়া হল :

দেশ	শাসনব্যবস্থার পরিচয়
ক) উত্তর আফ্রিকা	
আলজেরিয়া	ফরাসী সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ শাসিত ফ্রান্সের দেপার্ত্যমঁ বা জেলা
টিউনিসিয়া	আশ্রিত রাজ্য
মরক্কো	আশ্রিত রাজ্য

দেশ	শাসনব্যবস্থার পরিচয়
খ) **পশ্চিম আফ্রিকা**	
সেনেগাল সুদান গিনি নাইজার আইভরী কোস্ট উর্ধ্ব ভলতা দাহোমে মরিতানিয়া	ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ—ঔপনিবেশিক শাসন
ফরাসী টোগোল্যাণ্ড	সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে ফ্রান্স শাসিত অছি অঞ্চল
গ) **বিষুবরৈখিক আফ্রিকা**	
শাদ গাবোঁ উবাঙ্গুই শারি ফরাসী কঙ্গো	ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ—ঔপনিবেশিক শাসন
ফরাসী ক্যামেরুন্স	সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে ফ্রান্স শাসিত অছি অঞ্চল
ঘ) **উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা**	
ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড	উপনিবেশ
ঙ) **দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা**	
ম্যাডাগাস্কার	উপনিবেশ

দুই

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকায় ফ্রান্সের সাম্রাজ্য-বিস্তার শেষ হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকটি অরণ্যচারী উপজাতি বাদে সাম্রাজ্যের অন্য অধিবাসীরা সকলে ফ্রান্সের সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়। কিন্তু জয় করে ফ্রান্সের পক্ষে গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হল: কী করে এই বিরাট, বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসন

করা যায়। শাসনের সুবিধার জন্যে ১৯০৪ সালে পশ্চিম আফ্রিকার উপনিবেশ-গুলোকে এক করে যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন করা হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এই যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে সাতটি প্রদেশ ছিল : সেনেগাল, মরিতানিয়া, গিনি, সুদান, দাহোমে, নাইজার এবং আইভরী কোস্ট ('ওৎ ভল্‌তা' বা উর্ধ্ব ভল্‌তা বলে আর একটি প্রদেশকে ১৯৩২ সালে ভেঙে দেওয়া হয়। পরে অবশ্য 'ওৎ ভলতা' ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার অন্যতম অঙ্গপ্রদেশ বলে পরিগণিত হয়)। এই অঙ্গ প্রদেশগুলির প্রত্যেকটিতে ছিল একজন করে গভর্নর, যিনি দাকার (ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকার রাজধানী)-স্থিত গভর্নর-জেনারেলের কাছে দায়ী থাকতেন। এই গভর্নর-জেনারেল আবার ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক মন্ত্রীর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকতেন। আর ঔপনিবেশিক মন্ত্রী ছিলেন ফরাসী আইন সভার মারফত ফ্রান্সের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়িত্বশীল। সুতরাং পরোক্ষভাবে উপনিবেশের শাসনের ওপর ফ্রান্সের জনসাধারণের খানিকটা নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ছিল। যুক্তরাষ্ট্র প্রধানতঃ শাসনকাজের সুবিধার জন্য গঠিত হয়েছিল। অঙ্গ প্রদেশগুলির পৃথক সত্তা কখনও নষ্ট করা হয় নি (শুধু সাময়িক-ভাবে 'ওৎ ভল্‌তা' ছাড়া)। তাদের প্রত্যেকের পৃথক বাজেটও থাকত। অবশ্য কার্যতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার নানাভাবে অঙ্গ সরকারকে বঞ্চিত করে নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে চলত।

যুক্তরাষ্ট্রে হরেক রকমের শাসন-পরিষদের অস্তিত্ব ছিল : গভর্নরের শাসন-পরিষদ থেকে শুরু করে ছোট ছোট শহরের শাসন-পরিষদ পর্যন্ত। এই সব শাসন-পরিষদ প্রধানতঃ বড় বড় রাজকর্মচারী, সমসংখ্যক বেসরকারী ফরাসী নাগরিক (শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ) এবং কিছু স্থানীয় প্রজা (যারা 'সভ্য' হয়ে 'নাগরিক' শ্রেণীতে ওঠে নি) নিয়ে গঠিত ছিল। শাসন-পরিষদ নির্বাচনের জন্য এই ধরনের আফ্রিকানরা ভোট দিতে পারতেন : (১) যাঁরা সরকারী কর্মচারী; (২) যাঁরা একটা নিম্নতম শিক্ষার মান পার হয়েছেন; (৩) যাঁরা একটা নির্দিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী; এবং (৪) যাঁরা ফ্রান্সের প্রতি তাঁদের বিশেষ আনুগত্য প্রমাণ করেছেন। অবশ্য সেনেগাল ছাড়া অন্যত্রই এই শাসন-পরিষদের প্রধান কাজ ছিল গভর্নরকে পরামর্শ দেওয়া। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সেনেগালের শাসন-পরিষদ অন্য অঙ্গপ্রদেশের পরিষদের চেয়ে অনেক বেশী গণতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। একইভাবে সেনেগালের 'কম্যুন' গুলির অধিবাসীরা ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) ঐতিহ্য অনুযায়ী ফ্রান্সের নাগরিক

বলে গণ্য হতেন অর্থাৎ নাগরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁদের অবস্থা অন্য আফ্রিকানদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল।

তৃতীয় প্রজাতন্ত্রে ফরাসীকরণ নীতির চরম প্রয়োগ দেখা যায় কয়েকটি ক্ষুদ্র অঞ্চল শাসনে। সঁ্যা লুই, দাকার, গোরে এবং রুফিস্ক: এই চারিটি অঞ্চলের অধিবাসীদের ফরাসী নাগরিকের পদমর্যাদা দেওয়া হয়। পারীর আইনসভায় প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকারও এঁরা পান। অনেক ফরাসী মন্ত্রিসভায় সেনেগালের নির্বাচিত আফ্রিকান ডেপুটিকে উপনিবেশের আণ্ডার সেক্রেটারী করা হয়। আভ্যন্তরীণ শাসন এই কম্যুনগুলোকে স্থানীয় পরিষদ গঠনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল: যাদের ক্ষমতা ও কাজ ফ্রান্সের দেপার্ত্যমঁ বা জিলা পরিষদের অনুরূপ ছিল। এই পরিষদের সদস্যরা সার্বজনিক ভোটে নির্বাচিত হতেন। ইওরোপীয় এবং আফ্রিকান নাগরিকেরা যৌথভাবে এঁদের নির্বাচিত করতেন।

ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবার ছ' বছর বাদে (১৯১০) আফ্রিকার বিষুবরৈখিক অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত উপনিবেশগুলিকে এক করে দ্বিতীয় একটি যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন করা হল। আফ্রিকার অন্য অনেক দেশের মত এখানেও কিন্তু শাসনতান্ত্রিক বিভাগের সঙ্গে জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতিগত বিভাগের কোন মিল নেই। ফরাসী সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন প্রদেশ গঠন করা হয় যাতে শাসন সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে। সুতরাং প্রাদেশিক সীমানা অনেকাংশে কৃত্রিম ও অযৌক্তিক। ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৪টি অঙ্গপ্রদেশ ছিল:

প্রদেশ	আয়তন	লোকসংখ্যা	রাজধানী
শাদ	১,২৮০,০০০ বর্গ কি. মি.	২,২৪১,০০০	ফোর্ট-লামি = ২৪,০০০
উবাঙ্গ্যাই-শারি	৬১৭,০০০ " "	১,০৭০,০০০	বাঙ্গুই = ৪১,০০০
মোয়াইয়েন কঙ্গো (মধ্য কঙ্গো)	৩৪২,০০০ " "	৬৭৫,০০০	পোঁয়াৎ-বোয়ার = ২১,০০০
গাবোঁ	২৬৭,০০০ " "	৪০৫,০০০	লিব্র্-ভিল = ১০,০০০

ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ফরাসী বিষুবরৈখিক-আফ্রিকার আইনপ্রণয়ন করার কোন ক্ষমতা ছিল না। তবে ফরাসী ইউনিয়নের অন্তর্গত অন্য সব অঞ্চলের মত ফরাসী বিষুবরৈখিক-আফ্রিকার পারীতে প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা ছিল। ফরাসী আইনসভার নিম্নকক্ষে ৮জন, উচ্চকক্ষে ৪জন এবং ফরাসী ইউনিয়নের পরিষদে ৭জন প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা বিষুব-রৈখিক-আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া হয়। ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকার মত এখানেও প্রতি অঙ্গরাজ্যে একটি করে স্থানীয় পরিষদ এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি গ্রঁা কঁসেই (বৃহত্তর পরিষদ) স্থাপন করা হয়। এদের ক্ষমতাও পশ্চিম আফ্রিকার গ্রঁা কঁসেই এবং স্থানীয় পরিষদগুলোর ক্ষমতার অনুরূপ হয়। অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও দ্বৈত নির্বাচক মণ্ডলীর ব্যবস্থা ছিল। এক তালিকায় থাকত ইওরোপীয় এবং ফরাসী-সংস্কৃতি 'গ্রহণ' করা আফ্রিকানদের নাম, অন্যটাতে থাকতো অন্য আফ্রিকানরা যাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। তবু বিচ্ছিন্নভাবে যেখানে আফ্রিকানরা ইওরোপীয়দের সংস্পর্শে এসেছেন সেখানে তাঁরা অর্থনৈতিক অসাম্য ও বৈষম্যমূলক ব্যবহার লক্ষ্য করে ব্যথিত হয়েছেন। বৃটিশ উপনিবেশের মত কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ ও বর্ণ-বৈষম্য না থাকলেও ফরাসী সাম্রাজ্যে কোন কোন ব্যাপারে আফ্রিকানদের প্রতি বিভেদমূলক ব্যবহার করা হত। যেমন ১৯৫০ সাল পর্যন্ত আফ্রিকান সরকারী কর্মচারীরা ইওরোপীয় সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় কম পারিশ্রমিক পেতেন। এমন করে এক শ্রেণীর আফ্রিকানের জন্ম হয়েছে যাঁরা নিজেদের আফ্রিকানত্বে গর্ব অনুভব করতেন এবং যাঁরা ঔপনিবেশিক-শাসনের সংস্কারের জন্য আন্দোলন ও প্রচার চালান। তাঁদের মূল দাবি ছিল :

ক) বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে যোগদান বন্ধ করা।

খ) আফ্রিকান স্বেচ্ছাসেবকদের বিদেশে প্রেরণ বন্ধ করা।

গ) আঁাদিজেনা (Indigenat) প্রথার অবসান। *

* আঁাদিজেনা বা রেজিম্ দিসিপ্লিনেয়ার দ্য ল্যাঁদিজেনা নামে খ্যাত আইনের বলে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী আদালতের সাহায্য ছাড়াই কোন প্রজাকে স্থানীয় আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে কারাদণ্ড দিতে কিংবা জরিমানা করতে পারতেন।

ঘ) মেয়ে ও শিশুদের উপর যে মাথাপিছু কর বসানো হত, তা উঠিয়ে দেওয়া।

ঙ) সরকারী কাজে স্থানীয় ভাষার অধিকতর ব্যবহার।

চ) আফ্রিকানদের আরও দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করা।

ছ) আফ্রিকান ভূমিস্বত্ব অপরিবর্তিত রাখা।

তিন

এমনি অবস্থায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ফ্রান্সের বিপর্যয় ডেকে নিয়ে এল। ফ্রান্সের বহু গর্বের মাজিনো লাইন নাৎসী ব্লিসক্রীগের ধাক্কায় ভেঙে চুরমার হয়ে প্যারীর পতন হল। এ বিপর্যয়ের ধাক্কা আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশেও গিয়ে লাগে। উপনিবেশের বহির্বাণিজ্যের একটা বড় অংশ হত ফ্রান্সের সঙ্গে। ফ্রান্সের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ হওয়াতে উপনিবেশগুলোর অর্থনীতি প্রচণ্ড আঘাত খেল। যুদ্ধের প্রথম দিকে তাই আলজেরিয়ার সঙ্গে ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকাকে জুড়ে দেওয়া হয়। তাতে অবশ্য সমস্যার পুরো সমাধান হয় নি বা ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকার সাধারণ লোকের কষ্টের বিশেষ লাঘব হয় নি। আফ্রিকান শ্রমিকের কাছে যুদ্ধ মানে ছিল সামরিক ঘাঁটিতে কাজ করতে বাধ্য থাকা। আফ্রিকান কৃষকদের সরকারী হুকুমে নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য বা অন্য কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করতে বাধ্য করা হয়, যা সরকার স্ব নির্দিষ্ট দামে কিনে নিত।

১৯৪২ সালের শেষ পর্যন্ত ফরাসী পশ্চিম-আফিকার গভর্নর-জেনারেল পিয়ের বোয়াস ভিশি সরকারের প্রতি অনুগত থাকেন। নাৎসীবন্ধু ভিশি সরকারের আমলে বর্ণ-বৈষম্য তীব্রতর হল, সরকারের হাতে স্বৈরাচারী ক্ষমতা এবং যে কয়েকটি রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠন অবশিষ্ট ছিল তাদের ওপর চরম দমননীতি চালানো হল। অবশ্য আমেরিকানরা উত্তর আফ্রিকায় আক্রমণ শুরু করার কয়েক সপ্তাহ বাদে বোয়াস অনেক ইতস্তত করে অবশেষে ভিশি-পক্ষ ত্যাগ করলেন। ইতিমধ্যে ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকা ১৯৪০ সালের গোড়ার দিকে স্বাধীন ফরাসী সরকারের (দ্য গল পরিচালিত) পক্ষে যোগ দিয়েছে। (এখানে বলা দরকার যে, ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকাকে মিত্র-পক্ষে যুক্ত করার কাজে যাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি একজন বিশিষ্ট নিগ্রো রাজকর্মচারী ফেলিক্স এবুয়ে। ইনি পর্যায়ক্রমে ফরাসী সুদান,

গুয়াদালুপ ও শাদ প্রদেশের শাসক ছিলেন। ১৯৪৪ সালে ব্রাজাভিল সম্মেলনের নিমন্ত্রক ও অভ্যর্থনাকারী হিসেবেও ইনি কাজ করেন।) ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকার রাজনীতির মোড় ঘোরাবার পক্ষে তা কম সহায়ক হয় নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, হিটলারী আক্রমণ ও জাতীয় বিপর্যয়ের পর ফ্রান্সের রাষ্ট্রনায়কেরা আবার নতুন করে উপনিবেশ ও ফ্রান্সের পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা ভাবতে লাগলেন। ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে যে অনেক ত্রুটি রয়েছে এ সম্বন্ধে মোটামুটি ঐকমত্য ছিল। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে দেখা গিয়েছিল দীর্ঘদিন ফরাসী শাসনে থাকার পরও উপনিবেশের ৭ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ৪ লক্ষ (অশ্বেতাঙ্গ) লোক ফরাসী নাগরিকত্ব লাভ করেছে। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন তার শৈশবকাল উত্তীর্ণ হতে পারে নি। প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কিছু প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান কাজ চালাচ্ছে। অনেকে এমন অভিযোগও করতেন যে স্থানীয় লোকদের অর্থ ও পরিশ্রমে যেসব রাস্তাঘাট, সেতু ও বাঁধ নির্মিত হয়েছে তাতে তাদের নিজদের বিশেষ লাভ হয় নি। সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্র ফরাসী মূলধন প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। উপনিবেশগুলিতে শিল্পবিস্তারে উৎসাহ দেওয়া হয় নি এই যুক্তিতে যে তাহলে ফ্রান্সের সঙ্গে উপনিবেশের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা হবে এবং ফরাসী শিল্প তার পণ্যবিক্রয়ের বাজার হারাবে। এই সব অভিযোগের সঙ্গে উদারনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক সমালোচকেরা ফরাসী সাম্রাজ্যের স্বৈরাচারী কাঠামোকেও আক্রমণ করতেন।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সের পতন হয়েছে; এবং জেনারেল দ্য গলের নেতৃত্বে আল-জেরিয়াতে স্বাধীন ফরাসী সরকার স্থাপিত হয়েছে। ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত এবং আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত এই সরকার যে ঔপনিবেশিক সমস্যার প্রতি বেশী মনোযোগী হবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। এই সমগ্র ঔপনিবেশিক সমস্যা নানাদিক থেকে বিচার ও বিশ্লেষণ করার জন্যে এক সম্মেলন আহূত হল। সেই সম্মেলনের নাম ব্রাজাভিল সম্মেলন (১৯৪৪)। ব্রাজাভিল সম্মেলন অনেক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। ফরাসী সাম্রাজ্যের শাসনপদ্ধতি নিয়ে উপনিবেশের এক শহরে বসে এমন ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা, তাও আবার এক সর্বাত্মক যুদ্ধ শেষ না হতেই,—বোধ হয় এই প্রথম। যদিও আফ্রিকার জনপ্রিয় নেতাদের অনেকে এ সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নি তবু সামাজিক ও অর্থনৈতিক

ক্ষেত্রে ব্রাজাভিল সম্মেলন ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনে গুরুতপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করল। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

ক। বাধ্যতামূলক শ্রমদান বন্ধ করা হবে।

খ। অ্যাঁদিজেনা প্রথার অবসান ঘটানো দরকার।

গ। সমস্ত আফ্রিকানদের জন্য এক সার্বজনীন ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রণয়ন করা উচিত।

ঘ। উপনিবেশে দ্রুত শিক্ষা বিস্তার করা হবে।

রাজনৈতিক ও শাসন ক্ষেত্রে অবশ্য সম্মেলনে মতভেদের অভাব ছিল না। প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল: উপনিবেশগুলোকে কতখানি স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হবে। সম্মেলন শেষ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিপক্ষে মত প্রকাশ করল। অর্থাৎ স্থির হল যে প্রতি উপনিবেশ শাসনক্ষেত্রে আরো বেশী স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার পাবে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে তারা স্বরাজ বা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পাবে, কিংবা ফরাসী সাম্রাজ্যের বদলে যে নতুন সংগঠন খাড়া করার কথা হচ্ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। ফ্রান্স ও তার সাগরপারের উপনিবেশের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হোক—এমন কি শিথিল হোক—ব্রাজাভিল সম্মেলন তা চায় নি। সেই জন্যেই বোধ হয় সম্মেলন স্থির করল ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার কাজে উপনিবেশের প্রতিনিধিদেরও সাহায্য গ্রহণ করা হবে।

চার

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সে দুটি সংবিধান রচিত হয়। প্রথমটির সংকলন শুরু হয় ১৯৪৫ সালের শেষদিকে। কিন্তু ঔপনিবেশিক সমস্যার আলোচনা আরম্ভ হতে বেশ কয়েকমাস কেটে যায়। ফরাসী ঔপনিবেশিক মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে এই আলোচনা হল এক গুরুতপূর্ণ ঘটনা। এই প্রথম তথাকথিত 'নিগ্রো আফ্রিকা'র এতজন প্রতিনিধি একসঙ্গে পারীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন: লেওপোল্ড-সেদার-সেঙ্ঘর, ফেলিক্স হুফুয়ে-বোয়াঞি, লামিন গ্যুয়ে এবং আরও অনেকে। আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশের শোচনীয় অবস্থার কথা এঁরা ফ্রান্সের সাধারণ লোকের সামনে জোরালো ভাষায় তুলে ধরলেন। এঁদের প্রভাব এবং যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের বৈপ্লবিক চেতনা, দু'য়ে মিলে প্রথম গণ-

পরিষদের শেষ দুই মাসে বহুসংখ্যক বৈপ্লবিক প্রস্তাব গৃহীত হল। বাধ্যতামূলক শ্রমদান নিষিদ্ধ হল। উপনিবেশের অধিবাসীরা সভা-সমিতি করার স্বাধীনতা পেলেন। অ্যাঁদিজেনা বন্ধ করে দেওয়া হল। ঠিক হল লোকে নিজের সমাজের কিংবা উপজাতির আইন-কানুন এবং জীবন পদ্ধতি না ছেড়েও ফরাসী নাগরিক হতে পারবে। উপনিবেশের অধিবাসীদের জন্য এত সুদূরপ্রসারী সংস্কারের ব্যবস্থা ছিল যে সংবিধানে সে সংবিধান যে উপনিবেশে সংখ্যাধিক ভোট পাবে এতে আশ্চর্যবোধ করার কিছু নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফ্রান্সের জনসাধারণ গণভোটে (৬ই মে, ১৯৪৬) এই সংবিধান নাকচ করে দিল।

দ্বিতীয় সংবিধান রচনা করতে আরও কয়েকমাস কেটে গেল। ইতিমধ্যে প্রথম সংবিধানের ব্যর্থতার পর ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল দল ও চক্ররা কিছুটা শক্তি সংগ্রহ করেছে। দ্বিতীয় সংবিধান রচনার সময় এইসব লোকেরা ধুয়া তুলল যে প্রথম গণপরিষদ উপনিবেশগুলিকে ফ্রান্সের সঙ্গে এক করে এমন এক যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করছে যাতে 'ফ্রান্স তার উপনিবেশের উপনিবেশ হয়ে পড়বে।' দ্বিতীয় গণপরিষদ স্বভাবতঃই শাসনতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা (ব্রাজাভিল সম্মেলন যা প্রস্তাব করেছিল) অগ্রাহ্য করল। উপনিবেশগুলো আবার কেন্দ্রীকরণ ও ফরাসীকরণের নীতির শিকার হল।

আমরা অবশ্য একথা বলতে চাই না যে দ্বিতীয় সংবিধান পুরোপুরী প্রগতি বিরোধী। বরং প্রথম সংবিধানের বেশ কিছু প্রগতিশীল অংশ দ্বিতীয় সংবিধানেও রাখা হয়েছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ঘোষণাপত্র ও প্রথম সংবিধানের যে অংশে পরাধীন দেশগুলোর উন্নয়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে তার কিছু অংশ প্রায় হুবহু এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপনিবেশের প্রায় সর্বত্র নির্বাচিত পরিষদ স্থাপন করার ব্যবস্থা হল। এবং খোদ ফ্রান্সের দেপার্ত্যাম (জিলা) পরিষদের মত তাদের ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হয়। নির্বাচিত পরিষদের অন্যতম প্রধান কাজ হল বাজেট অনুমোদন (বা নাকচ) করা। আফসোসের কথা, এই সব পরিষদের হাতে আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয় নি,—সে ক্ষমতা প্রধানতঃ ফরাসী পার্লামেণ্টের হাতে রইল। কিন্তু সংবিধানে বলা হল শাসন কর্তৃপক্ষ ফরাসী ইউনিয়ন পরিষদের পরামর্শ নিয়ে উপনিবেশের জন্য ডিক্রী জারী করতে পারবেন।

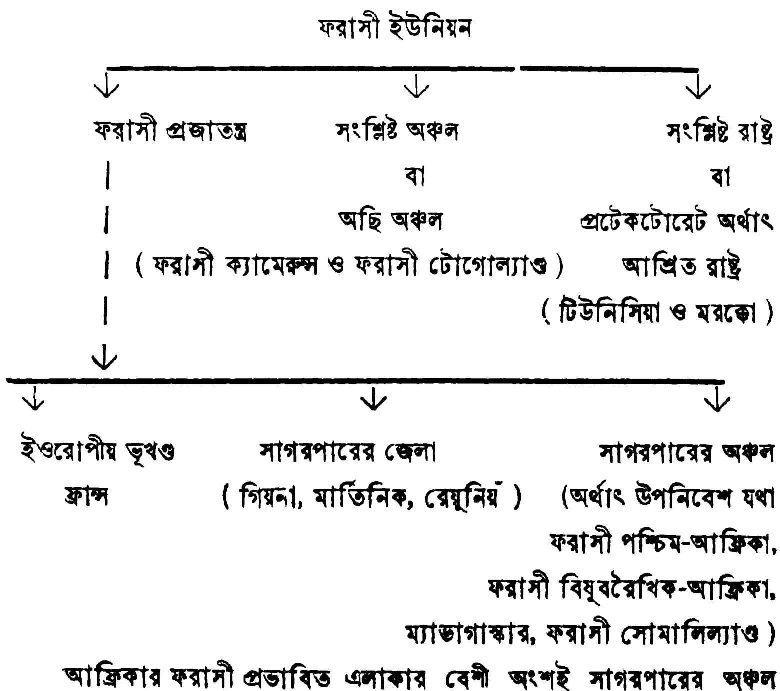
দ্বিতীয় সংবিধানে সবচেয়ে বড় কীর্তি হল ফরাসী সাম্রাজ্যের পরিবর্ত হিসাবে ফরাসী ইউনিয়ন স্থাপন করা। সংবিধানে বলা হল ফ্রান্স তার সাগরপারের অধীনস্থ এলাকাগুলো নিয়ে সমান অধিকার ও কর্তব্যের ওপর ভিত্তি করে এই ইউনিয়ন গঠন করবে। এই ইউনিয়নে তিন ধরনের দেশ থাকবে।

(ক) ফরাসী প্রজাতন্ত্র

(খ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চল অর্থাৎ অছি এলাকা, যেমন ফরাসী ক্যামেরুন্স, ফরাসী টোগোল্যাণ্ড।

(গ) সহযোগী রাষ্ট্র বা আশ্রিত এলাকা যেমন মরক্কো, টিউনিসিয়া।

ফরাসী প্রজাতন্ত্র আবার খোদ ফ্রান্স, সাগরপারের জেলা (যেমন মার্তিনিক, ফরাসী গিয়ানা, রেয়ুনিয়ঁ ইত্যাদি অঞ্চল) এবং সাগরপারের অঞ্চল (চলতি কথায় উপনিবেশ: যেমন ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকা, ফরাসী বিষুবরৈখিক-আফ্রিকা, ম্যাডাগাস্কার ও সোমালিল্যাণ্ড) নিয়ে গঠিত। সুতরাং ফরাসী ইউনিয়নের কাঠামোটা তাহলে এইরকমের দাঁড়াল :



আফ্রিকার ফরাসী প্রভাবিত এলাকার বেশী অংশই সাগরপারের অঞ্চল

বলে পরিচিত হল। মাত্র দুটি এলাকা,—ফরাসী টোগোল্যাণ্ড ও ফরাসী ক্যামেরুন্স,—আখ্যা পেল সংশ্লিষ্ট অঞ্চল; যদিও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভাষায় এদের বলা হত অছি অঞ্চল। এদের শাসক ফ্রান্স হলেও, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (বিশেষ করে অছি পরিষদের) তত্ত্বাবধান, সমালোচনা ও পরামর্শ দেবার ক্ষমতা ছিল। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র আফ্রিকায় ছিল দুটি—টিউনিসিয়া ও মরক্কো। আভ্যন্তরীণ শাসনক্ষেত্রে এদের খানিকটা ক্ষমতা থাকলেও পররাষ্ট্র-নীতি ও দেশরক্ষার ব্যাপারে এরা ফ্রান্সের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফরাসী ইউনিয়নের সর্বোচ্চ পদ হল প্রেসিডেণ্টের। এছাড়া হাই কাউন্সিল এবং অ্যাসেম্বলী নামে দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যবস্থা হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফরাসী শাসিত ও প্রভাবিত এলাকার শাসনভার প্রধানতঃ ফ্রান্সের সরকার ও আসাম্বলে নাসিওনালের হাতে রয়ে গেল। ফরাসী ইউনিয়ন না হল যুক্তরাষ্ট্র, না হল কমনওয়েলথের ফরাসী সংস্করণ।

পাঁচ

ফরাসী ইউনিয়ন ও চতুর্থ প্রজাতন্ত্র ১৫ বছরও টেকেনি। নানা কারণে চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের পতন হল। সংবিধান পরিবর্তনের মারফত সরকারের কার্য-নির্বাহী অংশকে অনেক বেশী শক্তিশালী করে জেনারেল দ্য গল্ ফ্রান্সের একচ্ছত্র রাষ্ট্রনায়ক হয়ে বসলেন। ফরাসী ইউনিয়ন ভেঙে দেওয়া হল; এবং প্রতিটি উপনিবেশকে স্বাধীনতা দাবি করার এবং পাবার অধিকার দেওয়া হল। এই অধিকারবলে আফ্রিকার প্রায় সমস্ত ফরাসী উপনিবেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের পতন অবশ্যই ফরাসী সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু চতুর্থ প্রজাতন্ত্র অটুট থাকলেও হয়তো আফ্রিকায় ফরাসী সাম্রাজ্য বজায় রাখা যেত না।

আসলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অন্য দেশের মত ফরাসী ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থায়ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন শুরু হয়। আর তারই ফলস্বরূপ ধীরে ধীরে বাড়ছিল অশান্ত বিক্ষোভ। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে অন্ততঃপক্ষে ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকায় ব্যাপক আন্দোলনের ভিত্তি খুব দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। তার প্রমাণ মেলে আন্দোলনের তীব্রতায় অর্থাৎ—(ক) আন্দোলনের বাহক, রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য সংগঠনের

প্রতিষ্ঠায় ও শক্তিসংগ্রহে এবং (খ) ধর্মঘট, হরতাল, মিছিল ও রক্তাক্ত সংগ্রাম প্রভৃতির সংখ্যা ও উগ্রতা বৃদ্ধিতে।

ফরাসী আফ্রিকান সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে শুরু করে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে। রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা ও শক্তিবৃদ্ধিতে প্রেরণা যুগিয়েছিল সেনেগাল প্রদেশের প্রগতিশীল 'কম্যুন'গুলো। কিন্তু খোদ ফ্রান্স থেকেও উৎসাহ ও সমর্থনের অভাব হয় নি। এই শতকের চতুর্থ দশকে ফ্রান্সের ফ্রঁ পপ্যুলেয়ার সরকার সাম্যবাদী ও সমাজবাদী দলের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। উপনিবেশের মুক্তিসংগ্রামে অধিকতর সহানুভূতিশীল এই সরকারের আমলে ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকায়, প্রধানতঃ সেনেগাল ও সুদানে শ্রমিক সংগঠন স্থাপিত হল। এবং প্রথম রাজনৈতিক দলও প্রতিষ্ঠিত হল সেনেগালে—ফরাসী এস. এফ. আই. ও.-এর শাখাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভিশি সরকারের প্রতিষ্ঠা অবশ্য ফরাসী উপনিবেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। শ্রমিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর দমননীতি চালানোর ফলে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কাজ চালানো দুরূহ হয়ে পড়ে। অনেক আফ্রিকান নেতা এই সময়ে ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ভিশি ও হিটলারী সরকারের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করেন। তারপর ১৯৪২ সালের শেষে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা সরকারী-ভাবে মিত্রপক্ষে যোগদান করার পর আবার রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠন-গুলো তাদের স্বাভাবিক কার্যকলাপ শুরু করে। ১৯৪৫ সালের শেষদিকে গণপরিষদের জন্য নির্বাচন শুরু হওয়ায় (উপনিবেশের অধিবাসীদেরও গণ-পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ করার অধিকার ছিল) তারা আরো বেশী সক্রিয় হয়ে উঠল এবং কিছু কিছু নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হল। এদের অধিকাংশ অবশ্য প্রদেশ বা জাতিভিত্তিক ছিল। কয়েকটি সংস্থা আবার ফ্রান্সের রাজনৈতিক সংগঠনের শাখা হিসেবে সংগঠিত হয়।

যখন বোঝা গেল চতুর্থ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রথম সংবিধানের জায়গায় এমন এক সংবিধান গৃহীত হতে চলেছে যেখানে ঔপনিবেশিক অধিবাসীদের সুযোগ সুবিধা সঙ্কুচিত হবে, তখন সারা পশ্চিম আফ্রিকা জুড়ে এক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা হল। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাতন্ত্র্য অর্জন না করে ফরাসী ইউনিয়নের মধ্যে থেকে ইওরোপীয়দের সঙ্গে সমান রাজনৈতিক অধিকার আদায় এবং

আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহার বন্ধ করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পশ্চিম আফ্রিকার জননেতাদের স্বাক্ষরিত এক ইস্তাহার প্রচার করা হল। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন লামিন গুয়ে (দাকার শহরের পৌরপ্রধান এবং গণপরিষদের সদস্য), হুফুয়ে-বোয়াঞি (গণপরিষদের সদস্য) এবং গাব্রিয়েল দার্বুসিয়ের (এক সময়কার গণপরিষদের। সদস্য এবং ভূতপূর্ব ফরাসী ঔপনিবেশিক কর্মচারী)। ফরাসী আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এই ইস্তাহারের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রদেশ, ধর্ম ও উপজাতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডী কাটিয়ে ইস্তাহার ডাক দিল "সমস্ত শ্রমিক সংগঠন, সমস্ত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনকে" এক সাধারণ ফ্রণ্টে ঐক্যবদ্ধ হতে।

এই সংযুক্ত ফ্রণ্ট গঠনের জন্য ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে ফরাসী সুদানের (বর্তমান মালি) বামাকো শহরে এক সম্মেলন ডাকা হল। সংযুক্ত ফ্রণ্ট অবশ্য সমস্ত রাজনৈতিক দল ও আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে নি। লামিন গুয়ে, সেঙ্ঘর এবং ইয়াসিন দিয়াল্লোর মত সমাজবাদী নেতারা সম্মেলনে যোগ দিলেন না। বোঝা গেল তাঁদের রাজনৈতিক দল প্রস্তাবিত সংযুক্ত ফ্রণ্টে সরিক হবে না।

যাই হোক, এই সম্মেলন থেকে যে সংগঠন জন্ম নিল তার নাম হল রাসঁবল্যাম দেমোক্রাতিক আফ্রিকঁ্যা (অর্থাৎ আফ্রিকান গণতান্ত্রিক সম্মেলন— আর. ডি. এ.)। ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকা ছাড়াও, ফরাসী বিষুবরৈখিক-আফ্রিকা এবং অছি অঞ্চল—টোগোল্যাণ্ড ও ক্যামেরুন্সে এর শাখাপ্রশাখা বিস্তারিত হল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে আর. ডি. এ. ফ্রান্সের আসঁবলে নাসিওনালের ৬টি, সেনেটের ৫টি ও ফরাসী ইউনিয়ন পরিষদের ৭টি আসন দখল করে তার শক্তি ও জনপ্রিয়তার প্রমাণ দিল। এর পর থেকে অন্ততঃপক্ষে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার রাজনৈতিক ইতিহাস আর. ডি. এ.'র উত্থান-পতন, সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিহাস বললেই হয় (যদিও সমাজতান্ত্রিক এবং আর দু' একটি দলেরও তাতে কিছুটা অবদান আছে)।

আর. ডি, এ. কে একটা দল না বলে ফ্রণ্ট বলাই ঠিক হবে—যার ভেতরে বিভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠী সমবেত হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক দলের নেতারা (যথা সেনেগালের লামিন গুয়ে এবং গিনির ইয়াসিন দিয়াল্লো) অবশ্য গোড়া থেকেই এ ফ্রণ্টকে বয়কট করেছিলেন। দাহোমে'র এক নেতা, ডক্টর জ্যাঁসু বামাকো সম্মেলনে 'ফ্রণ্টে কম্যুনিস্ট প্রভাবের' নিন্দা করেন। রাসঁবল্যামঁতে

কম্যুনিস্টেরা যে ছিল এটা অবশ্য ডক্টর জ্যাস্থর মৌলিক আবিষ্কার নয়। ফ্রান্সের কম্যুনিস্টরা চিরদিন উপনিবেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহানুভূতি দেখিয়ে আসছে। বামাকো সম্মেলনের আগেই গ্রুপ দেত্যুদ্ কম্যুনিস্ত বলে এক সাম্যবাদী সংগঠন ফরাসী আফ্রিকান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক আন্দোলন পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য কাজ করছিল। বামাকো সম্মেলনে ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি রেমঁ বার্বে প্রকাশ্যে যোগদান করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা দরকার যে রাসঁম্বল্যমঁতে অনেক অকম্যুনিস্টও ছিল, এবং তাদের মধ্যে অনেকের হাতে ছিল ফ্রণ্টের নেতৃত্ব। এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত নাম হল আইভরী কোস্টের হুফুয়ে-বোয়াঞি। নিজের প্রদেশে অবিসম্বাদিত নেতা হুফুয়ে-বোয়াঞিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি কম্যুনিস্ট কিনা। উত্তরে তিনি বলেন :

"কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমরা সংযুক্ত আছি তা ঠিক। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা কম্যুনিস্ট। আমি,—হুফুয়ে-বোয়াঞি, আমি হলুম আমার নিজের এলাকার গোষ্ঠীপতি, আফ্রিকান ডাক্তার, বড় জমিদার, ক্যাথলিক। আমি কম্যুনিস্ট হব এও কি সম্ভব? কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ আমাদের পক্ষে লাভজনক। কারণ এঁদের মধ্যে আমরা পার্লামেন্টের একটা অংশকে পাই যারা বন্ধুর মত আমাদের স্বাগত জানায়, যেখানে অন্যরা আমাদের প্রতি কোন মনোযোগই দেয় নি।"

এককথায় ফেলিক্স হুফুয়ে-বোয়াঞি নিজে কম্যুনিস্ট না হয়েও ফরাসী কম্যুনিস্টদের সাহায্য নিতে রাজী ছিলেন। স্বভাবতঃ হুফুয়ের মত আরো বহু লোক এমনিভাবে আর. ডি. এ.তে সামিল হয়েছেন এবং নেতৃত্বও দিয়েছেন।

তবে একথা সত্যি যে এদের সঙ্গে কম্যুনিস্টরাও কাজে নেমেছিলেন। রাসঁম্বল্যমঁ'র সেক্রেটারী দার্বুসিয়ের একসময়ে ছিলেন সরকারী কর্মচারী। পরে তিনি ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। আফ্রিকার ফরাসী সাম্রাজ্য আর. ডি. এ.'র ভিত্তি শক্ত করে গাঁথতে দার্বুসিয়ের যেমন পরিশ্রম করেছেন, তেমনি অনলসভাবে ফরাসী ইউনিয়ন পরিষদে উপনিবেশের অধিবাসীদের হয়ে জনমত সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন।

হুফুয়ে-দার্বুসিয়ের দ্বৈত নেতৃত্ব আর. ডি. এ.'র প্রাণ ছিল। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই এই নেতৃত্বে ভাঙন ধরে। এই ভাঙনের জন্য দায়ী কে সে হিসাব আমরা করতে চাই না। তবে ১৯৪৬ সালের পর ফ্রান্স ও

ফরাসী ইউনিয়নের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোন কোন দিকে পরিবর্তন হয়েছে তা জানলে এই ভাঙনের তাৎপর্য বোঝার সুবিধা হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টি যত শক্তিশালী ছিল, কয়েক বছরের মধ্যে সে শক্তি অনেকাংশে কমে যায়। যুদ্ধের পর থেকে ১৯৪৭ সালের মে পর্যন্ত অন্যান্য পার্টির সঙ্গে ও সহযোগিতায় কম্যুনিস্টরা মন্ত্রি-সভায় অংশ গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালের মে মাসের পর থেকে অন্য রাজনৈতিক দলগুলো মন্ত্রিসভা গঠনে কম্যুনিস্টদের সযত্নে এড়িয়ে গেছে। পার্লামেন্টেরও কম্যুনিস্ট সদস্যের সংখ্যা আগের তুলনায় কমে গেছে।

অর্থাৎ কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা আগের মত লাভজনক নয়।

ইতিমধ্যে অন্যদেশের কম্যুনিস্টদের মত ফরাসী সাম্যবাদীদের কর্মকৌশল পরিবর্তিত হয়েছে। বিনাযুদ্ধে ক্ষমতা পাবার স্বপ্ন মরীচিকার মত দূরে সরে যাচ্ছে। ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টি আর সরকারের অংশীদার নয়। বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও জটিল হয়ে উঠেছে। বের্লিন-অবরোধ (১৯৪৮) ও উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংগঠনের জন্ম (১৯৪৯) ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা ঘোষণা করেছে। ফরাসী সাম্যবাদীরা আরো বেশী আক্রমণাত্মক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। আর. ডি. এ'.র কর্মসূচীও পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৪৯ সালে ফরাসী সরকার উর্ধ্ব (বা ওৎ) ভলতায় এর দ্বিতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করায় রাসঁম্বল্যমঁ আবিজানে সম্মেলন করেন। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আবিজানের শহরতলী ত্রাইশভিলে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়। পরের বছর আইভরী কোস্টের বুয়াফ্লে শহরে গুরুতর দাঙ্গা হয়। ফরাসী সরকারের সঙ্গে এই প্রায়-প্রকাশ্য শক্তি পরীক্ষায় আর. ডি. এ.'র অনেক নেতা (এঁদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ছিলেন) দলত্যাগ করলেন। ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে আর. ডি. এ.'র প্রভাব এত কমে গেল যে হুফুয়ে ও তাঁর বন্ধুরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে এখন ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির সহযোগিতা তাঁদের স্বার্থ সিদ্ধির সহায়ক না হয়ে বরং প্রতিবন্ধক হবে। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে হুফুয়েগোষ্ঠী দার্বুসিয়েরকে রাসঁম্বল্যমঁ থেকে বহিষ্কৃত করলেন।

দার্বুসিয়ের বিরোধী অভিযানে হুফুয়ে-বোয়াঞি দলের অধিকাংশের সমর্থন পেয়েছিলেন বলে শোনা যায়। হুফুয়ের পরামর্শানুসারে স্থির করা হল যে ফরাসী পার্লামেন্টে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে শ্রীপ্লেভঁর য়ুনিওঁ

দেমোক্রাতিক এ সোসিয়াল দ্য লা রেজিস্‌তাঁস্‌ (ইউ. ডি. এস. আর) এর সঙ্গে সহযোগিতামূলক মৈত্রী স্থাপিত হবে।

এমনি করে অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটবার পর রাসঁম্বল্যমঁ তার পুরোনো শক্তি ফিরে পাবার প্রচেষ্টায় নামলো; এবং আইভরী কোস্ট ও সুদানের শহর অঞ্চলে অনেকাংশে সক্ষমও হল। ১৯৫৬ সালের নির্বাচনে আর. ডি. এ. আসাঁম্বলে নাসিওনালের নয়টি আসন দখল করল। মোলে মন্ত্রিসভায় হুফুয়ে মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন।

কিন্তু ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সঙ্কট, আলজেরিয়ার যুদ্ধ ও সুয়েজ আক্রমণ এবং এইসব পরিস্থিতিতে হুফুয়ের নেতৃত্বে দলের মধ্যেকার তরুণ ও বামপন্থীদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। হুফুয়ের মোলে-মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ এঁরা অপছন্দ করেছেন। উত্তর আফ্রিকা ও সুয়েজ পশ্চিম আফ্রিকান সৈন্য ব্যবহারে এঁরা তীব্র প্রতিবাদ জনিয়েছেন। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে আইভরী কোস্ট এবং গিনিতে হুফুয়ে যে সব ইওরোপীয় প্রার্থীকে আর. ডি. এ'র. মনোনয়ন দিয়েছিলেন তাঁদের এঁরা নাচক করেন। এই তরুণ বামপন্থীদলের প্রিয় নেতা হলেন সেকু তুরে (বর্তমানে গিনির রাষ্ট্রনেতা) যিনি গিনির শ্রমিক সংগঠন করেছেন, যিনি হুফুয়ের মত অতটা ফরাসী ভাবাপন্ন নন এবং ফরাসী কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের প্রতি হুফুয়ের মত যিনি অতটা প্রসন্ন নন। দলের এই বর্ধমান বামপন্থী গোষ্ঠীকে খুশী করার জন্যই বোধ হয় হুফুয়ে দার্বুসিয়রকে আবার দলে ফিরিয়ে নিলেন।

তবু বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয়, সুসংবদ্ধ ফ্রন্ট হিসাবে আর. ডি. এ. টিকে থাকতে পারে নি। দ্য গলের পঞ্চম প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ বা বর্জন সম্পর্কে তার নেতারা বিভক্ত ছিলেন। সংবিধান বর্জন করে গিনি স্বাধীনতা পায়। অন্যদিকে রাসঁম্বল্যমঁর দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব অন্ততঃ সাময়িকভাবে ফরাসী যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। স্বাধীনতা ছাড়াও অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফ্রন্টের আঞ্চলিক সংগঠনগুলো এত বিভিন্নধর্মী যে তাদের পৃথক রাজনৈতিক দল আখ্যা দিলেই ভাল হয়।

রাসঁম্বল্যমঁ দেমোক্রাতিক আফ্রিকাঁ ছাড়া অন্য যেসব রাজনৈতিক দল ফরাসী আফ্রিকায় সক্রিয় ছিল তার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দলের নাম উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সে একসময় এর নেতা ছিলেন জাঁ জরে। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিরোধী জরেসের দল যে আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠালাভ করবে এবং তাও

আবার সবচেয়ে প্রগতিশীল আফ্রিকান উপনিবেশ সেনেগালে তা খুব। স্বাভাবিক। এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে (১৯৩০-১৯৩৯) দাকার সহরের নামকরা আইনজীবী লামিন-গুয়ে 'সেনেগালিজ ফেডারেশন' নামে এক সমাজতন্ত্রী সংস্থার পত্তন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে গিয়েও সমাজতান্ত্রিক দল অন্য উপনিবেশে শাখা-সংগঠন বিস্তার করে। গিনিতে ইয়াসিন দিয়াল্লো এবং সুদানে ফিলি দাবো সিসোকো'র নেতৃত্বে সমাজবাদী শক্তি সংগঠিত হয়।

১৯৪৬ সালে সমাজতান্ত্রিক দল জনপ্রিয়তার চরমসীমায় পৌছায়। সে বছরে অনুষ্ঠিত আসঁম্বলে নাসিওনালের নির্বাচনে সমাজতন্ত্রীরা সেনেগাল, মরিতানিয়া ও সুদানে বিশেষ সাফল্যলাভ করে। জনচক্ষে দলের মর্যাদা আরও বেড়ে যায় যখন লামিন-গুয়েের নাম এক নতুন আইনের সঙ্গে যুক্ত হয়—যার ফলে উপনিবেশের সমস্ত অধিবাসীদের নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়।

সমাজতন্ত্রীদের এমন সৌভাগ্য কিন্তু বেশীদিন থাকে না। প্রথমত: আফ্রিকার রঙ্গমঞ্চে রাসঁম্বল্যম্ব'র আবির্ভাব এবং তার বামপন্থী কর্মসূচী সমাজতান্ত্রিক দলকে ম্লান করে দেয়। দ্বিতীয়ত: বিভিন্ন প্রদেশে দলের আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিভেদ এবং নামকরা সভ্যদের দলত্যাগ দলকে দুর্বল করে। শেষোক্তদের মধ্যে লেওপোল্ড-সেদার সেঙ্ঘর ১৯৪৮ সালে ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে স্ব-পরিচালিত "ব্লক দেমোক্রাতিক সেনেগালেজ" গড়ে তুললেন। গিনিতে ইয়াসিন দিয়াল্লোর মৃত্যু (১৯৫৪) এবং সেকু তুরের নেতৃত্বে জঙ্গী শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন সমাজতন্ত্রীদের বিপর্যস্ত করল। সুদানেও রাসঁম্বল্যম'র কাছে সমাজতন্ত্রীরা নির্বাচনে (১৯৫২ ও ১৯৫৬) পরাস্ত হল। অবশ্য সেঙ্ঘর নতুন দল গড়ার পরও সেনেগালের শহর এলাকায় অফিস-কর্মচারী, উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের মধ্যে সমাজতন্ত্রীদলের প্রভাব শক্তিশালী ছিল। তবু পরবর্তী পৌরনির্বাচনগুলিতে দেখা গেল, সেঙ্ঘর চালিত ব্লক দেমোক্রাতিক সেনেগালেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্রীরা ক্রমশঃ হটে যাচ্ছে।

ক্ষীয়মান জনপ্রিয়তা ও নির্বাচনী বিপর্যয়ের ফলে অবশেষে ১৯৫৭ সালে সারা ফরাসী আফ্রিকার সমাজতন্ত্রী নেতারা এক হয়ে মুভমঁ সোসিয়ালিস্ত আফ্রিক্যাঁ বলে এক নতুন সংগঠন গড়ে তুললেন। তবু নাইজার ছাড়া অন্য

কোথাও এই সংযুক্ত ফ্রণ্ট সমাজতন্ত্রী শক্তির পতন রোধ করতে পারেনি। অবশ্য এই নতুন ফ্রণ্টকে ফরাসী আফ্রিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম দল বলা হত। কিন্তু নির্বাচনে এই দল মাত্র ১০% ভোট পায় এবং স্থানীয় পরিষদগুলির ৪৭৪টি আসনের মধ্যে মাত্র ৬২টি আসন দখল করতে পারে।

সমাজতন্ত্রীদল ও রাসঁবল্যম ছাড়া ১৯৪৮ সাল থেকে "অ্যাঁদেপদাঁ দুত্র মেয়ার" নামে আর একটি সংগঠন ফ্রান্সের তথা ফরাসী ইউনিয়নের পার্লামেণ্টারী রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। একে অবশ্য রাজনৈতিক দল বলা ঠিক হবে না—কারণ, এতে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের সমাবেশ হয়েছে। তবু এক সংগঠন বজায় রাখতে গিয়ে "অ্যাঁদেপদাঁ দুত্র মেয়ার"কে কয়েকটি মূল বিষয়ে মোটামুটি একটা মতৈক্যে আসতে হয়েছে। ফরাসী ইউনিয়ন সম্পর্কে এই সংগঠনের মনোভাবের কথা ধরা যাক। ফ্রণ্টের অল্পসংখ্যক সদস্য চেয়েছিলেন উপনিবেশগুলি ফরাসী ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাক। দ্বিতীয় একদল ফরাসী ইউনিয়ন রাখতে চান কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা ব্যাপকভাবে বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেন। অন্য একদল সমস্ত আফ্রিকান উপনিবেশ নিয়ে (ফরাসী ও অফরাসী) অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার কথা বলেন (প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের ছায়া)। সেঙ্ঘরের নেতৃত্বে চতুর্থ এক গোষ্ঠী প্রস্তাব করেন. ফরাসী ইউনিয়নের পরিবর্তে প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এরকম মতভেদের ক্ষেত্রে যা হয় তাই হল। সংগঠনের অন্যতম নেতা (ইনি পরে সম্পাদক নির্বাচিত হন) মামাদু দিয়া উত্থাপিত এক আপোষ প্রস্তাব গৃহীত হল: এই মুহূর্তে ঔপনিবেশিক শাসনের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে: তবে, যুক্তরাষ্ট্রের উপযুক্ত সংবিধানিক খসড়া না পাওয়া পর্যন্ত ফরাসী ইউনিয়নের বর্তমানে প্রচলিত কাঠামোকে চালু রাখা হবে।

অ্যাঁদেপদাঁ দুত্র মেয়ারের জীবনে এমন গুরুতর মতপার্থক্য কয়েকবার এসেছে। কিন্তু বিশেষ এক রাজনৈতিক দলে পরিণত হতে চায়নি বলে অ্যাঁদেপদাঁ দুত্র মেয়ার সর্বাঙ্গীন ঐক্যের চেষ্টা কখনও করেনি। ফলে এর সংগঠন কখনও শক্তিশালী হয়নি এবং নানা ধরণের লোক এমনকি সুবিধাবাদীরাও একে অবলম্বন করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা করেছে। আফ্রিকার রাজনীতিতে তাই এর অবদান সীমিত। তবু এই সংগঠনে কয়েকজন বিশিষ্ট জননেতা মিলিত হয়েছিলেন (যার মধ্যে সেঙ্ঘর অন্যতম) আর তার ফলেই

ফ্রান্সের পার্লামেণ্টারী রাজনীতিতে তুত্র মেয়ারের কিছুটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

ছয়

চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের যুগ (১৯৪৬—১৯৫৯) আফ্রিকার ফরাসী সাম্রাজ্যের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বায়ত্তশাসনবর্জিত উপনিবেশ থেকে এই ১৪ বছরে আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশগুলি স্বাধীনতার দুয়ারপ্রান্তে এসে পৌছায়। ১৯৪৬ সালে উপনিবেশের সমস্ত অধিবাসীরা ফরাসী নাগরিকত্ব পায়; যদিও তখন পর্যন্ত সার্বজনিক ভোটাধিকার গ্রাহ্য হয়নি। সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে উপনিবেশের অধিবাসীদের ফ্রান্সের পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। একই সময় প্রতি প্রদেশে স্থানীয় পরিষদ গঠিত হয়, যার প্রধান কাজ ছিল অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে। এ ছাড়া আটটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে এবং চারটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত ফরাসী বিষুবরৈখিক-আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে একটি করে গ্রাঁ কঁসেই বা যুক্তরাষ্ট্রীক পরিষদ গঠন করা হল। এই যুক্তরাষ্ট্রীক পরিষদের ক্ষমতা কয়েকটি ক্ষেত্রে (যথা সরকারী জমি, খনির পারমিট, সেভিংস ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান, কৃষি ঋণ ইত্যাদি পরিচালনা) সীমাবদ্ধ ছিল। তার ওপর এর অধিবেশন আহ্বান করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল গভর্নর জেনারেলের হাতে। এবং সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম করা হয় যে এর আলোচ্য বিষয়ের তালিকা আগে থেকে সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া দরকার। এসব দিক বিচার করলে, এই যুক্তরাষ্ট্রীক পরিষদ যে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বহু আফ্রিকানকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি তা পরিষ্কার।

কিন্তু চতুর্থ প্রজাতান্ত্রিক যুগের মজা হচ্ছে: এখানে শাসনকাঠামো বেশীদিন অপরিবর্তিত থাকেনি। গতিশীল ঘটনাস্রোতে একের পর এক নতুন আইন গৃহীত হয়েছে এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা তদনুরূপ বদলে গেছে। নীচের উদাহরণ থেকে এ কথা পরিষ্কার হবে।

১৯৫০ সালে নতুন এক আইনের মারফত আফ্রিকান সরকারী কর্মচারীদের ইওরোপীয় কর্মচারীদের সমান পারিশ্রমিক ও অন্য সুবিধা দেওয়া হয়। এরপর ফ্রান্সের অনুরূপ শ্রম-আইন উপনিবেশেও চালু করা হয়। ১৯৫৬

সালে এল সুপ্রসিদ্ধ লোয়া কাদ্‌র। এই আইনের বলে ফরাসী সরকার শুধু ডিক্রী জারী করে ঔপনিবেশিক-শাসন সংস্কার করার ক্ষমতা পেলেন। স্থির হল: উপনিবেশে প্রত্যক্ষ ও সার্বজনিক ভোটাধিকার চালু করা হবে এবং ফরাসী পার্লামেণ্ট ও স্থানীয় পরিষদের জন্য একটিমাত্র ভোটারতালিকা থাকবে (অর্থাৎ ইওরোপীয় ও আফ্রিকান ভোটাররা আগের মত পৃথকভাবে ভোট দেবেন না)। স্থানীয় পরিষদগুলোর ক্ষমতা বাড়ানো হবে এবং দায়িত্বশীল শাসন পরিষদ গঠন করা হবে।

লোয়া কাদ্‌র-কে ভিত্তি করে যে সব ডিক্রী জারী করা হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলি নীচে দেওয়া হল:

(ক) কতকগুলি ডিক্রীর মারফত আঞ্চলিক পরিষদগুলোর ক্ষমতা বাড়ানো হয়। নতুন যেসব ক্ষমতা এদের দেওয়া হল তার মধ্যে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রধান। সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন কাজ করার খরচ চালানোর জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংস্থানও করা হল। তারও ওপর ঠিক করা হল যে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যরা অতঃপর সার্বজনিক ভোটে নির্বাচিত হবেন।

(খ) গ্রঁা কঁসেই-এর (যুক্তরাষ্ট্রীক পরিষদ) ক্ষমতা কমিয়ে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা বাড়ানো হল। বিকেন্দ্রীকরণের নীতি এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল যে সেঙ্ঘরের মত আফ্রিকান নেতারা ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকার এই 'বলকানীকরণে' ক্ষুব্ধ হলেন।

(গ) আর একদফা ডিক্রী জারী করে শাসনপরিষদের প্রবর্তন করা হল। শাসনপরিষদের সদস্যরা কীভাবে নিযুক্ত হবেন তা নিয়ে কিছুটা তর্কবিতর্কের পর অবশেষে ঠিক হল যে, পরিষদের সমস্ত সদস্য আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন এবং 'মন্ত্রী' আখ্যা পাবেন।

এই নতুন ব্যবস্থাকে অবশ্য মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত ব্যবস্থা বা ক্যাবিনেট-ব্যবস্থা বলা উচিত হবে না। ক্যাবিনেটের মধ্যে যে আদর্শগত ও দলীয় ঐক্য থাকে ফরাসী উপনিবেশের শাসন-পরিষদে তার অভাব থাকার সম্ভাবনা ছিল। তার ওপর আইনতঃ এ ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী বলে কেউ ছিলেন না। শাসনপরিষদের যে সদস্য সর্বাধিক ভোট পেতেন তাঁকে সহ-সভাপতি বলা হত (সভাপতি ছিলেন প্রদেশের সর্বোচ্চ শাসক বা গভর্নর)। কার্যতঃ এই সহ-সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর কাজ করতেন। এছাড়া এই নতুন ব্যবস্থাকে

ক্যাবিনেট ব্যবস্থা বলা যায়না এইজন্যে যে, শাসনপরিষদ আঞ্চলিক পরিষদের কাছে আইনতঃ দায়িত্বশীল ছিল না ; যদিও শাসনপরিষদ আঞ্চলিক পরিষদের কাছে দায়িত্বের হাত থেকে কার্যত নিস্তার পেত না।

পরবর্তী ঘটনাবলীর তাৎপর্য পুরোপুরি বোঝার জন্য লোয়া কাদ্র এবং তার ওপর ভিত্তি করে যেসব ডিক্রী জারী করা হয় সেগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমতঃ আমাদের মনে রাখা দরকার যে, চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের পতন হবার আগেই আফ্রিকার অধিকাংশ ফরাসী উপনিবেশগুলি আইনতঃ না হোক কার্যতঃ আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন পেয়েছিল। এই স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি ছিল সার্বজনিক ভোটাধিকার, প্রতিনিধিত্বমূলক ও দায়িত্বশীল সরকার এবং ফরাসী ও আফ্রিকান অধিবাসীর সমান অধিকার। চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের জন্মসময়ে যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তার তুলনায় ১৯৫৬ সালের ব্যবস্থা অনেক উন্নততর ছিল এবং রাজনৈতিক বিবর্তনের সে স্তর থেকে স্বাধীনতা পাওয়া আর একটি পদক্ষেপ মাত্র ছিল। এটা ঠিক যে, খুব সম্ভবতঃ চতুর্থ প্রজাতন্ত্র বজায় থাকলে এই 'একটি পদক্ষেপেই' দুঃসাধ্য হত। সাম্রাজ্যের তল্পিতল্পা না গুটিয়ে প্রচণ্ড চেষ্টা হত ফরাসী ইউনিয়নকে যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করার। অর্থাৎ উপনিবেশ গুলিকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে দিয়ে ফরাসী যুক্তরাষ্ট্রে তাদের সরিক বানাবার চেষ্টা হত। অবশ্য তার যে বিপদ ছিল না তা নয়। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে যদি অন্য সব যুক্তরাষ্ট্রের মত দ্বিকক্ষ-পরিষদ থাকতো এবং তার নিম্ন পরিষদের সদস্যরা যদি অন্যসব যুক্তরাষ্ট্রের মত জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন, তবে দেখা যেত খোদ ফ্রান্স থেকে নির্বাচিত সদস্যদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী হচ্ছেন উপনিবেশ থেকে আসা সদস্যরা। সে অবস্থায় সুকুমার রায়ের 'গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি'র মত ফ্রান্সের হাতে উপনিবেশ থাকার বদলে ফ্রান্সই হত উপনিবেশের কতৃত্বাধীন। অবশ্য এ বিপদ এড়াবার জন্য শাসন-তান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবন করা হয়তো অসাধ্য হত না। কিন্তু তাহলে ফরাসী ইউনিয়নের প্রচলিত ব্যবস্থাকে সংশোধন করতে হতই।

সে যাই হোক, মূল কথা হচ্ছে চতুর্থ ইউনিয়নের অন্তিম দশায় আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশগুলি স্বাধীনতার কিনারায় এসে পড়েছিল। তাই চার বছর বাদে তাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তিতে অবাক হবার কিছু নেই।

লোয়া কাদ্র এবং পরবর্তী ডিক্রীগুলো অনুধাবন অন্য আর এক কারণে প্রয়োজনীয়। আফ্রিকার বাইরের লোক বুঝতে পারে না স্বাধীনতা পাবার

সঙ্গে সঙ্গে কেন ৬০ বছরের যুক্তরাষ্ট্র (পশ্চিম আফ্রিকার) ভেঙে যায়, বিশেষ করে যখন পৃথিবীর অন্যত্র বহুরাষ্ট্রীক আঞ্চলিক ঐক্যসংগঠন (পশ্চিম ইওরোপ, আরব রাষ্ট্রসমূহ ইত্যাদি) গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এই অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি ব্যাখ্যার চেষ্টা হতে পারে এই বলে যে, ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকা আয়তনে, সোভিয়েট ইউনিয়ন বাদে, সারা ইওরোপের সমান। এই বিরাট ভূখণ্ডে বহু উপজাতির বাস। তাদের বাসভূমি, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভাষা, ধর্ম, সামাজিক সংগঠন, ইতিহাস সবই ভিন্ন। ফ্রান্সের চাপিয়ে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্র তাদের এক শাসনকাঠামোর অধীনে রেখেছিল। কিন্তু লোয়া কাদ্র ও তৎপরবর্তী ডিক্রী মারফত যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি অনেকটা দুর্বল করে প্রদেশগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করে দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এক কথায় চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের শেষ যুগে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রকে নয়, প্রদেশগুলিকেই পৃথকভাবে স্বাধীনতার জন্য তৈরি করা হয়। অর্থাৎ ভবিষ্যতের অসম্বদ্ধতার বীজ এখানেই বপন করা হয়েছিল।

সাত

যুদ্ধোত্তর যুগে মন্ত্রিসভার ক্ষণস্থায়িত্ব, ইন্দোচীনের ঔপনিবেশিক সংগ্রামে ফ্রান্সের বিপর্যয়, 'সার'-এর জার্মানী-অন্তর্ভুক্তি, মরক্কো ও টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা প্রাপ্তি, আলজেরিয়ার রক্তক্ষয়ী ঔপনিবেশিক সংগ্রাম, ফ্রান্সের অভ্যন্তরে মুদ্রা-স্ফীতি, বেকারী ও সাধারণ অর্থনৈতিক দুর্যোগ চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের পতন ঘনিয়ে নিয়ে এল। এক গুরুতর জাতীয় সংকটের মধ্যে দ্য গল ক্ষমতায় এলেন এবং পঞ্চম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

১৯৫৮ সালে পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের নতুন সংবিধানে 'সাগরপারের প্রদেশগুলি'কে চারটি বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়:

(ক) 'দেপার্ত্যম দ্যুত্র মেয়ার' বা সাগরপারের জেলার পদমর্যাদা লাভ। যা কোন ফরাসী উপনিবেশ হতে চায় নি।

(খ) 'তেরিতোয়ার দ্যুত্রমেয়ার' বা উপনিবেশের পদমর্যাদা বজায় রাখা। ৫টি ছোট ছোট দেশ (আফ্রিকায় সোমালিল্যাণ্ড ও কোমোরো দ্বীপপুঞ্জ) এই ব্যবস্থার পক্ষে ভোট দেয়।

(গ) ফরাসী 'কম্যুনিতে'র সদস্যরাষ্ট্র হয়ে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা-

ভোগ করা। এমন সদস্যরাষ্ট্রদের ভাবী রাজনৈতিক বিবর্তনের পথ সুগম ছিল এমন কি ভবিষ্যতে স্বাধীনতা দাবি ও অর্জন করার অধিকারও ছিল স্বীকৃত। আফ্রিকার যে সমস্ত ফরাসী শাসিত অঞ্চল 'কম্যুনিতে'র সদস্যরাষ্ট্র হতে চায় তাদের নাম: (১) মরিতানিয়া (২) সেনেগাল (৩) সুদান (৪) আইভরী কোস্ট (৫) উর্ধ্ব ভলতা (৬) নাইজার (৭) দাহোমে (৮) টোগো (৯) ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্র (১০) শাদ (১১) উবাঙ্গুই-শারি (১২) গাবোঁ (১৩) মধ্য কঙ্গো (১৪) ম্যাডাগাস্কার।

(ঘ) পূর্বোক্ত তিনটি পন্থার সবগুলিকে বর্জন করে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেওয়া। একমাত্র গিনি এই বিকল্পের পক্ষে ছিল। নতুন সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার প্রয়োগ করে গিনি স্বাধীন হয়। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সরকার সমস্ত রকমের সাহায্য বন্ধ করে এবং গিনি থেকে সব ফরাসী কর্মচারীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তার কিছুদিন বাদে গিনির প্রধানমন্ত্রী সেকু তুরে ঘানার প্রধান মন্ত্রী নক্রুমার সঙ্গে এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, ভবিষ্যতে এই দুইদেশ এক রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হবে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা হয় যে, গিনির অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য ঘানা গিনিকে এককোটি পাউণ্ড ঋণ দেবে।

গিনি ছাড়া অন্য সর্বত্র পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধান বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। অর্থাৎ সমস্ত উপনিবেশই ফরাসী যুক্তরাষ্ট্রীয় 'কম্যুনিতে'র মধ্যে থাকতে চায়, যদিও ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে পুরো-পুরি স্বাধীনতা লাভ করার অধিকার তাদের রইল। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থেকে তারা আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে চায়, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারী শাসনে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতাও তাদের থাকে।

আফ্রিকান নেতারা ও রাজনৈতিক দলগুলি পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের নতুন সংবিধান সম্বন্ধে একমত হতে পারেন নি। আর. ডি. এ'র দক্ষিণপন্থী অংশের নেতা হুফুয়ে-বোয়াঞি ইতিমধ্যে জেনারেল দ্য গলের মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন। গিনি ছাড়া অন্য উপনিবেশগুলি ফরাসী যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থাকার সিদ্ধান্ত করায় তিনি বিশেষ খুশী হন। আসলে সেঙ্ঘরের নেতৃত্বে একটি বড় দল এই নতুন সংবিধান সমর্থন করেন অনাফ্রিকান ঐক্য বজায় রাখার জন্য। তাঁদের মত ছিল ফরাসী পশ্চিম ও বিষুবরৈখিক আফ্রিকায় দুটি যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন করা হবে। এবং ফরাসী উপনিবেশগুলির ফরাসী যুক্তরাষ্ট্রের

অন্তর্ভুক্তি ক্ষণস্থায়ী হবে—যে সময়টা স্বাধীনতার প্রস্তুতির কাজে লাগানো হবে।

এই উদ্দেশ্যে কিছু কিছু চেষ্টাও আফ্রিকান নেতারা করেছিলেন। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকার ৪টি প্রদেশ, সেনেগাল, সুদান, দাহোমে এবং উর্ধ্ব ভলতা মিলে "মালি যুক্তরাষ্ট্রের" পত্তন করে। অন্যদিকে বিষুবরৈখিক-আফ্রিকার ৪টি প্রদেশের (গাবোঁ, কঙ্গো, শাদ ও উবাঙ্গুই-শারি) প্রতিনিধিরা এক কাস্টমস ইউনিয়ন গঠন করে। আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মালি যুক্তরাষ্ট্র টেকেনি। স্বাধীনতা পাবার আগেই দাহোমে এবং উর্ধ্ব ভলতা মালি যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে। সেনেগাল ও সুদান এই দুই প্রদেশ নিয়ে গঠিত মালি যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু তার কিছুদিন বাদে সেনেগালের আপত্তিতে মালি যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে দেওয়া হয়। সেনেগাল পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সুদান অবশ্য 'মালি' এই নামটা বজায় রেখেছে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র আর নেই।

ফ্রান্সের আফ্রিকান উপনিবেশগুলির মধ্যে গিনির সাম্প্রতিক ইতিহাস বিশেষ ও পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। পঞ্চম ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান প্রত্যাখ্যান করে স্বাধীনতালাভের আগে গিনির নাম বাইরের পৃথিবীর লোক খুব কম শুনেছিল। অথচ যাঁরা গিনির রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করেছিলেন তাঁরা জানতেন গিনির ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো বেশীদিন টিকে থাকতে পারবে না।

সেনেগালের মত গিনিতেও সমাজতন্ত্রীরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সংগঠন শুরু করে। সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীইয়াসিন দিয়াল্লো যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন গিনির প্রতিনিধি হিসাবে ফরাসী পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হয়েছেন। ফরাসী কর্তৃপক্ষ তাঁকে সক্রিয় সমর্থন যুগিয়ে গেছে। কারণ, সমাজতন্ত্রী হলেও দিয়াল্লোর নেতৃত্বে গিনি চরম বৈপ্লবিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে।

কিন্তু দশবছর যেতে না যেতে গিনির রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে স্পষ্ট বিবর্তন দেখা দেয়। রাজধানী কোনাক্রির সংলগ্ন অঞ্চলে কিছু কিছু খনিজ দ্রব্যের আবিষ্কার গিনির অর্থনীতিকে দ্রুত প্রগতির পথে নিয়ে গেল। এর পরে একদিকে যেমন বেশ কিছু ইওরোপীয় কারিগর, দক্ষ শ্রমিক, ইঞ্জিনীয়ার ও ম্যানেজার এলেন, অন্যদিকে তেমনি গিনির অধিবাসীদের মধ্য থেকে এক

শহরে শ্রমজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি হল। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে সংগঠিত হল আক্‌সিওঁ দেমোক্রাতিক এ সোসিয়াল, ফ্রান্সের স্থ গলের আর. পি. এফ.-এর সহযোগী রাজনৈতিক দল। একই সঙ্গে আফ্রিকান শ্রমজীবী শ্রেণী শ্রমিক ইউনিয়নে সংগঠিত হল—যে শ্রমিক ইউনিয়নগুলো পরে স্থানীয় রাসঁম্বল্যমঁ দেমোক্রাতিক আফ্রিকঁ্যার প্রধান অবলম্বন হয়। অর্থাৎ একদিকে দক্ষিণপন্থী ইওরোপীয় সংগঠন, অন্যদিকে প্রধান বামপন্থী আফ্রিকান সংগঠন—এ দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের সম্ভাবনা বিশেষ রইল না। যেটুকু ছিল তাও নষ্ট হল ইয়াসিন দিয়াল্লোর মৃত্যুতে (এপ্রিল, ১৯৪৪)।

এরপর আফ্রিকান শ্রমিক সংগঠন সমর্থিত রাসঁম্বল্যমঁর স্থানীয় শাখা প্রতিষ্ঠান ব্লক আফ্রিকঁ্যা স্থ গিনে ক্রমশঃ আরো বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। অন্যদিকে ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে ইওরোপীয় বাসিন্দাদের চরম দক্ষিণপন্থী অংশ উত্তর আফ্রিকার ইওরোপীয় অধিবাসীদের অনুকরণে "প্রেসন্স ফ্রঁাসেজ" বলে এক সংগঠের ভিত্তি স্থাপন করল। এক বছর বাদে চরম বামপন্থীরা গ্রপ্‌ দেতুদ্‌ কম্যুনিস্ত বলে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল,—যা পরে স্থানীয় আর. ডি. এ'র সঙ্গে সংযুক্ত হল।

গিনির শ্রমিক সংগঠনের শক্তিতে স্থানীয় আর. ডি. এ. সামান্য অবস্থা থেকে শুরু কয়েক বছরের মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে। কয়েক বছরের আগেকার হিসেবে দেখা যায় যে এর সভ্যসংখ্যা ৩০০,০০০। এর মধ্যে শিশুরাও আছে, কারণ অনেক ক্ষেত্রে সারা পরিবার একসঙ্গে আর. ডি. এ'র সভ্য হয়েছে। এই হিসাবমত সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১৩ জন এই দলের সদস্য। আর. ডি. এ'র এই সাফল্যের মূলে অন্য নানা কারণের মধ্যে একটা কারণ হল সেকু তুরের নেতৃত্ব। আফ্রিকার জন-নেতাদের মধ্যে সেকু তুরে অনেক দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য। গিনির বিখ্যাত ফরাসীবিরোধী যোদ্ধা সামোরীর পৌত্র হলেন সেকু তুরে। ফরাসী উপনিবেশের অন্য নেতাদের তুলনায় সেকু তুরে অনেক বেশী দেশের মাটির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। উচ্চ শিক্ষা তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। ফরাসী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বে মুগ্ধ হয়ে তিনি ফরাসী হবার চেষ্টা করেন নি। এমনকি ১৯৫৬ সালে ডেপুটি নির্বাচিত হবার আগে তিনি ফ্রান্সে যান নি। কিন্তু অনলস পরিশ্রমে তিনি শ্রমিক সংগঠন গড়েছেন এবং পুরস্কার স্বরূপ বহু উপজাতি অধ্যুষিত দেশ গিনির স্থানীয় পরিষদে ৬০টি আসনের মধ্যে ৫৬টি আসন তাঁর পরিচালিত দল

দখল করেছে। সেকু তুরে নিজে বামপন্থী। কিন্তু তাঁর দলে তাঁর চেয়ে আরো বামপন্থী আছে। এবং তাদের প্রভাব সেকু তুরের ওপর স্বাভাবিক নিয়মেই পড়ে। খনি শিল্পের দ্রুত বিস্তার, শহর এলাকার আয়তন ও লোক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বেকার যুবকদের সংখ্যা বৃদ্ধি—এই সব নিয়ে গিনির পরিস্থিতি বামপন্থী রাজনীতির পক্ষে অনুকূল। তাই আর. ডি. এ'র দক্ষিণ-পন্থী নেতৃত্বের (হুফুয়ে-বোয়াঞি ও তাঁর সহযোগীরা) সঙ্গে যে গিনির আর. ডি. এ'র বিচ্ছেদ ঘটবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সেইজন্য গিনি যে সকলের আগে পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধান প্রত্যাখ্যান করে স্বাধীন হবে এটা আমাদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয় নি।

আট

ফরাসী-আফ্রিকান মুক্তি আন্দোলনের যে বৈশিষ্ট্য সব থেকে আগে চোখে পড়ে তা হচ্ছে এই যে উপনিবেশের রাজনৈতিক দলগুলি ফ্রান্স থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে স্বাধীন হবার দাবি বিশেষ করে নি। ছোট-বড়, নরম-গরম প্রায় সব রকম দল ও চক্রের মূল দাবি ছিল—ইওরোপীয় নাগরিকের সঙ্গে সমান অধিকার পাওয়া। এমন কি, অতিবড় বামপন্থী দলও ফরাসী ইউনিয়ন ত্যাগের কথা চিন্তা করত না। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ঔপ-নিবেশিক দলগুলি ফ্রান্সের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারত যেহেতু ফ্রান্সের আইন পরিষদে ঔপনিবেশগুলির প্রতিনিধিত্ব ছিল। এই অংশ গ্রহণ শুধু বিতর্কেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ফ্রান্সে বহু দল প্রথা থাকায় অনেক সময় মন্ত্রিসভা ভাঙা-গড়ার ব্যাপারে ঔপনিবেশিক দলগুলির ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষমতা ছিল। এই ক্ষমতা সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করে ঔপনিবেশিক দলগুলি কখনও কখনও নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ উপনিবেশের একাধিক প্রভাবশালী আন্দোলন ফ্রান্সের অনুরূপ আন্দোলনের উদ্যোগে গঠিত ও অনেক ক্ষেত্রে পরিচালিতও হয়েছে। লামিন গুয়েের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রী দল ফরাসী সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে এবং আর. ডি. এ'র সঙ্গে (অন্ততঃপক্ষে গোড়ার দিকে) কম্যুনিস্ট দলের যোগাযোগ খুব স্পষ্ট। তাই যতদিন পর্যন্ত এমন যোগাযোগ ছিল ততদিন ফরাসী ইউনিয়ন ছেড়ে যাবার দাবি ওঠেনি।

এ ছাড়া বৃটিশ উপনিবেশের তুলনায় ফরাসী উপনিবেশে বৈষম্যমূলক নীতি ও ব্যবহার অনেক কম ছিল। ফরাসী সংস্কৃতি গ্রহণ করলে তাকে ফরাসী বলে ধরা হত ; এবং তাকে ফরাসীদের সমান নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হত। সুতরাং, যে বর্ণবিদ্বেষ অন্য সর্বত্র পৃথকীকরণের প্রেরণা যুগিয়েছে, তার প্রকোপ ফরাসী আফ্রিকায় কম বলে, পৃথক হয়ে স্বাধীনতা পাবার দাবিও অপেক্ষাকৃত কম দেখা গেছে। অবশ্য পৃথক হয়ে স্বাধীনতা পাবার দাবি হঠাৎ একদিনে জন্মায় নি বা এর জন্য শুধুমাত্র একটি ঘটনা অথবা একটি কারণকে দায়ী করা যায় না। আমরা আগেই বলেছি, লোয়া কাদ্র-কে ভিত্তি করে যে সব শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রবর্তন করা হয় তাতে উপনিবেশগুলো স্বাধীনতার দুয়ার প্রান্তে এসে পৌছায়। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে ঔপনিবেশিক জনগণের স্বরাজের অনুকুলে যেতে থাকে। ১৯৫৭ সালে বৃটিশ শাসিত গোল্ডকোস্ট উপনিবেশের স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্তি ফরাসী আফ্রিকার মুক্তির পথে প্রেরণা যোগায়। আলজেরিয়ার বীরত্বপূর্ণ মুক্তি সংগ্রাম এবং ফ্রান্সের নৃশংস দমননীতি তথাকথিত ফরাসী, 'অভিভাবকত্ব', সম্পর্কে অনেকের মোহমুক্তি ঘটায়। ফরাসী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনায় ভীত না হয়ে গিনির বলিষ্ঠ স্বাধীনতা ঘোষণা সারা ফরাসী সাম্রাজ্যের মুক্তি আন্দোলনের আপোসহীন নেতৃত্বকে আরও বেশী শক্তিশালী করে। তারপর ১৯৬০ সালে আবো কয়েকটি আফ্রিকান দেশ স্বাধীন হবে বলে কথা হয়। এর পরও যদি ফরাসী আফ্রিকান উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা না পেতে চাইত তবে সেটাই হত খুব অস্বাভাবিক।

নয়

১৯৫৮ সালে গিনির স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দু'বছরের মধ্যে পশ্চিম আফ্রিকায় ফরাসী শাসনের অবসানে আরও নয়টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে ; মরিতানিয়া, মালি, সেনেগাল, কোৎ দিভোয়ার বা হস্তিদন্ত উপকূল, ওৎ ভলতা বা উর্ধ্ব ভলতা, টোগো, দাহোমে, নাইজার ও কামেরুন। একই বছরে আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের অনতিদূরে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপ ম্যাডাগাস্কার স্বাধীনতা পেয়ে মালাগাসী প্রজাতন্ত্র নাম নিয়েছে এবং পূর্বতন ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকার চারটি প্রদেশ চার পৃথক রাষ্ট্রে

পরিণত হয়েছে। স্বরাজলাভের পর এই সব দেশ নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়েছে। কোৎ দিভোয়ার, ওৎ ভলতা, দাহোমে ও নাইজার প্রজাতন্ত্রের মিলিত সংস্থা কঁসেই দ্য লাঁতাৎ বা মৈত্রী পরিষদ এবং ১৪টি আফ্রিকান রাষ্ট্রের সহযোগিতায় গঠিত অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য আফ্রিকান ও মালাগাসী সংগঠনের (UAMCE) কথা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

ফরাসীভাষী দেশগুলির সামর্থ্য সমান নয়। কোৎ দিভোয়ার ও গাবোঁর সম্পদের পাশে উধ্ব´ ভলতা ও নাইজার প্রজাতন্ত্রের দারিদ্র্য বড়ই স্পষ্ট। লোকবসতির ঘনত্বে কামেরুনের উপকূল অঞ্চল ও মরিতানিয়ার প্রায় মরুভূমি এলাকায় আকাশ-পাতাল তফাত। শিক্ষার বিস্তারে কামেরুন, গাবোঁ ও কঙ্গো (ব্রাজাভিল) প্রজাতন্ত্রের তুলনায় মরিতানিয়া ও মালি অনেক পশ্চাৎপদ। এসব কারণে উধ্বোক্ত দেশগুলির উন্নয়নের হার এমনকি তার উপায়ও তুলনীয় নয়।

তবু অনেকগুলি বিষয়ে এদের সাদৃশ্য আছে। এরা সকলে 'ফরাসী' জাতীয়ভাষা হিসাবে বজায় রেখেছে। গিনি বাদে এরা সবাই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের সঙ্গে নানা বন্ধনে যুক্ত এবং ফ্রাঙ্ক মুদ্রা এলাকা ও ইওরোপীয় বারোয়ারী বাজারের অংশীদার। আর এখানেই এদের কথা একসঙ্গে আলোচনা করার সার্থকতা।

একাদশ অধ্যায়ঃ ইংরেজীভাষী পশ্চিম আফ্রিকা

এক

১৯১৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিম আফ্রিকার বিশাল ফরাসী সাম্রাজ্যের ফাঁকে ফাঁকে চারটি বৃটিশ উপনিবেশ টিকে ছিল ; ঘানা, নাইজেরিয়া, সিয়েরা লিওন ও গ্যাম্বিয়া। উনবিংশ শতাব্দীতে কেমন করে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিযোগিতায় ফ্রান্স পশ্চিম আফ্রিকার বৃহত্তর অংশ গ্রাস করে ও বৃটেন উপরি-উক্ত চারটি দেশে নিজ অধিকার বিস্তৃত করে, সেকথা আমরা অন্যত্র বর্ণনা করেছি। বৃটিশ শাসনাধীন হওয়ার পর এ চারটি দেশের ভাগ্য নানাভাবে একসূত্রে গ্রথিত হয় এবং এদের নাগরিকদের মধ্যে (বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী মহলে) পারস্পরিক আদান প্রদানের সুযোগ মেলে।

১৯২০ সালে এই সব দেশের জাতীয়তাবাদী নেতারা মিলে (ওয়েস্ট আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা পশ্চিম আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস স্থাপন করেন। নাইজেরিয়ার সংগ্রামী জননেতা আজিকিওয়ে ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ঘানায় তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালান। সিয়েরা লিওনের বাঙ্কোলে টিমথি ঘানায় বেশ কিছু দিন বাস করেন ও শ্রীনক্রুমার প্রামাণিক জীবনী রচনা করেন। শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে গ্যাম্বিয়া ১৮২১ থেকে ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত এবং আবার ১৮৬৬ থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত সিয়েরা লিওনের সঙ্গে যৌথভাবে শাসিত হয়। ঐতিহাসিক কারণে এইসব দেশের (গ্যাম্বিয়া ছাড়া) স্বাধীনতার পথ হয়েছে অনুরূপ। কোন ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক বাসিন্দাদের স্বার্থ এদের রাজনৈতিক প্রগতি বিঘ্নিত করতে পারে নি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বনিয়াদ বলিষ্ঠ করেছে। তাছাড়া, সমস্ত দেশেই রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্ততঃ প্রথম দিকে উপকূলবাসী জনগণ নেতৃত্ব দিয়েছে।

এই সব কারণে আমরা এদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও তার পরবর্তী ইতিহাস একটি প্রবন্ধে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছি।

'কৃষ্ণ' আফ্রিকার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী দেশ ঘানা। এর ৮০লক্ষ অধিবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক আয় প্রায় ৭০ পাউণ্ড, অন্য অনেক আফ্রিকান দেশের এমন আয়ের তিনগুণ বেশি। সমৃদ্ধি ও শিক্ষাবিস্তার এ দেশের রাজনৈতিক প্রগতিকে দ্রুততর করেছে। লাইবেরিয়া বাদ দিলে কৃষ্ণ আফ্রিকায় সবচেয়ে আগে স্বাধীনতা পেয়েছে ঘানা (১৯৫৭)।

পূর্বেকার গোল্ডকোস্ট উপনিবেশ (আটলান্টিক উপকূলের ৫০ থেকে ১৫০ মাইল প্রস্থ ভূমিখণ্ড) আসান্তে, উত্তর প্রদেশ এবং বৃটিশ শাসিত অছি অঞ্চল টোগোল্যাণ্ড, নিয়ে ঘানা গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সর্বাপেক্ষা উন্নত হল প্রাক্তন গোল্ডকোস্ট উপনিবেশ ও আসান্তে।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে আসান্তে উপজাতির এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বহুবার এরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে নিজদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল। শেষ ইঙ্গ-আসান্তে যুদ্ধ হয় উনবিংশ শতকের শেষে এবং ১৯০১ সালে আসান্তে বৃটিশ উপনিবেশে পরিণত হল।

ঘানার অর্থনৈতিক উন্নয়ন অন্যান্য আফ্রিকান দেশের চেয়ে দ্রুততর হয়েছে। এর মূলে আছে কোকো। ঘানা পৃথিবীর বৃহত্তম কোকো উৎপাদক। কোকো রপ্তানী ১৯১০ সালে ছিল ১০,০০০ টন। ১৯৫৭ সালে তা বেড়ে হয় ২,৫০,০০০ টন। সারাদেশের রপ্তানীর দুই তৃতীয়াংশ আসে কোকো থেকে। কোকো ছাড়া সোনা, হীরা, ম্যাঙ্গানিজ ও বক্সাইটও রপ্তানী হয়ে থাকে। টেমার নতুন অ্যালুমিনিয়ম স্মেলটিং কারখানায় কাঁচামাল যোগায় দেশের বক্সাইট খনি। ভল্টানদী পরিকল্পনা বিদ্যুৎ ও মৎস্য উৎপাদনকে সাহায্য করবে।

অর্থনৈতিক প্রগতি এবং ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের অনুপস্থিতি জনিত বর্ণবৈষম্যের অভাব ঘানার রাজনৈতিক প্রগতির পথ অপেক্ষাকৃত মসৃণ করেছে। উনবিংশ শতকের শেষে উপকূল অঞ্চলে গোল্ডকোস্ট অ্যাবরিজিনেস রাইট্স প্রোটেকশ্যন সোসাইটিই বোধহয় প্রথম প্রতিবাদ আন্দোলন। এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ সরকারের প্রস্তাবিত জমি সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। উল্লিখিত আইন মারফত বৃটিশ সরকার

উপজাতীয় প্রধানদের জমির ওপর সনাতন অধিকার খর্ব করতে চেয়েছিল। অ্যাবরিজিনেস রাইট্স প্রোটেকশন সোসাইটি গোল্ডকোস্টের প্রথম ব্যারিস্টার জন মেনসা সার্বার নেতৃত্বে এমন প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে। এবং যদিও এ আন্দেলন তার লক্ষ্যে পৌছোতে পারে নি, তবু শিক্ষিত সম্প্রদায় ও উপজাতীয় প্রধানদের সঙ্ঘবদ্ধ এই আন্দোলন গোল্ডকোস্টের জাতীয়তাবাদীদের প্রেরণা যোগায়।

১৯২০ সালে আর এক ব্যারিস্টার কেসলে হেফোর্ড উদ্যোগী হয়ে আক্রায় এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। এই সম্মেলনে বৃটিশ পশ্চিম আফ্রিকার চারটি উপনিবেশ থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেয়। এবং এর থেকে জন্ম নিল বৃটিশ পশ্চিম আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এক পশ্চিম আফ্রিকান ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করা। অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে থাকে (১) প্রতি উপনিবেশে আইন পরিষদের প্রতিষ্ঠা যার অর্ধেক সদস্য হবে জননির্বাচিত; (২) এই সদস্যদের কর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দান; (৩) উপজাতীয় প্রধান ও রাজাদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রজাদের হাতে দেওয়া; (৪) জাতিবর্ণনির্বিশেষে ব্যক্তিগত গুণের ভিত্তিতে সরকারী কর্মচারীদের কর্মে নিয়োগ; এবং (৫) পশ্চিম আফ্রিকার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। পশ্চিম আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে অ্যাবরিজিনেস রাইট্স প্রোটেকশন সোসাইটির বনিবনা বিশেষ হয় নি। এবং ১৯৩০ সালে কেসলে হেফোর্ডের মৃত্যুর পর জাতীয় কংগ্রেস বেশিদিন টিকে থাকে নি।

ঔপনিবেশিক আমলে শাসনক্ষমতা থাকে গভর্নরের হাতে। গভর্নরকে সাহায্য করত এক কার্যনির্বাহী পরিষদ ও এক আইন পরিষদ। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্য শহরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় উনবিংশ শতকের শেষে।

১৯১৬ সালে আইন পরিষদে ১১ জন সরকারী ও ১০ জন বেসরকারী সদস্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। বেসরকারী সভ্যদের মধ্যে কেসলে হেফোর্ড ও ই. জে. পি. ব্রাউনের মত বিখ্যাত জননেতারা ছিলেন। শিক্ষিত ও চেতনা-সম্পন্ন আফ্রিকানরা কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হয় নি। পশ্চিম আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস ও অ্যাবরিজিনেস রাইট্স প্রোটেকশন সোসাইটি আইন পরিষদে নির্বাচিত আফ্রিকান সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি দাবি করে। ১৯২৫ সালের গুগিসবার্গ সংবিধান এদের দাবি অংশতঃ মেনে নিলেও আফ্রিকান জাতীয়তাবাদীরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয় নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে এক নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হল। গোল্ডকোস্টের আইন পরিষদে এই প্রথম নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাধিক্য স্বীকৃত হয়। আইন পরিষদে ৬ জন সরকারী সদস্য, ৬ জন মনোনীত বেসরকারী সদস্য এবং ১৮ জন নির্বাচিত সদস্য থাকে। ৬ জন মনোনীত বেসরকারী সদস্যদের মধ্যে তিন জন ছিল আফ্রিকান। অর্থ কমিটি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রধানতঃ আফ্রিকানদের হাতেই থাকে।

যুদ্ধোত্তর গোল্ডকোস্টে কিন্তু জন-অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছিল। জিনিস-পত্রের দাম হুহু করে বেড়ে যায় এবং একচেটিয়া ইওরোপীয় ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। 'সোলেন শুট' নামক রোগে বহু কোকো গাছ আক্রান্ত হয়। যারা বৃটেনের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয় তারা ফিরে আসে বেকার হয়ে। এমন অবস্থায় ডক্টর জে. বি. ডাঙ্কোয়ার নেতৃত্বে ইউনাইটেড গোল্ডকোস্ট কনভেনশন বা ইউ. জি. সি. সি. নামে এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হল। এই দলের আমন্ত্রণে কোয়ামে নক্রুমা দেশে ফিরে এর সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলেন।

ঘানার আধুনিক ইতিহাসে নক্রুমার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য এইখানে তাঁর জীবন কাহিনী সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। নক্রুমার জন্ম ১৯০৯ সালে ঘানার পশ্চিম প্রদেশে। বাল্যকালে রোমান ক্যাথলিক মিশন স্কুলে শিক্ষা পেয়ে তিনি কিছুদিন একাধিক জায়গায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৩৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিয়ে নক্রুমা ১৯৩৯ সালে লিঙ্কন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাস করেন। তারপর পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও দর্শনশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী পান। এই সময় নক্রুমা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় আফ্রিকান ছাত্রসমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সালে আমেরিকা ছেড়ে তিনি ইংল্যাণ্ডে আসেন। ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য লণ্ডনে এলেও নক্রুমা শীঘ্র সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পশ্চিম আফ্রিকান ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এবং এইভাবে জর্জ প্যাডমোর ও অন্যান্য নিগ্রো নেতাদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করতে থাকেন। একই সময় লেওপোল্ড সেঙ্ঘর, হুফুয়ে-বোয়াঞ্ঞি, কেনিয়াট্টা প্রভৃতি আফ্রিকান নেতাদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

১৯৪৭ সালে ঘানায় ফিরে নক্রুমা ইউ. জি. সি. সি. কে এক শক্তিশালী পার্টিতে পরিণত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৪৮ সালের শুরুতে

ইওরোপীয় ও সিরিয়ান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বয়কট শুরু হয়। পরের মাসে প্রাক্তন সৈনিকদের বিক্ষোভ মিছিলে গুলি চলে। এর ফলে আক্রা, কুমাসী ও অন্যান্য শহরের গুরুতর দাঙ্গাহাঙ্গামায় বহু লোক হতাহত হয়। ইউ. জি. সি. সি.র নেতারা কারারুদ্ধ হলেন।

বৃটিশ সরকার ওয়াটসন কমিশনকে ফেব্রুয়ারী জনবিক্ষোভের কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত করে। ওয়াটসন কমিশনের অন্যতম প্রস্তাব ছিল শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ও আফ্রিকানদের রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারণ। এই উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার কয়েকটি প্রস্তাব করে। কিন্তু নক্রুমা ও তাঁর বন্ধুরা এতে সন্তুষ্ট হন না। ইতিমধ্যে অবশ্য ইউ. জি. সি. সি.র অন্য নেতাদের সঙ্গে নক্রুমার বিভেদ শুরু হয়েছে। এবং নক্রুমা কনভেনশন পিপল্‌স পার্টি (সি. পি. পি.) নামে এক নতুন দল গড়েছেন। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে সরকারের সংবিধানিক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সি. পি. পি. সাধারণ ধর্মঘট ও বৃটিশ পণ্য বয়কটের ডাক দেয়। আবার দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়। এবং বৃটিশ সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে নক্রুমা ও অন্যান্য সি. পি. পি. নেতাদের গ্রেপ্তার করে। নক্রুমা কারাগারে থাকাকালীন নতুন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘোষিত হল। এবং ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সি. পি. পি. ৩৮টি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত আসনের মধ্যে ৩৪টিতে জেতে। নক্রুমা নিজে জেলে থেকে মধ্য আক্রা নির্বাচনকেন্দ্রে ২৩,১২২টি প্রদত্ত ভোটের মধ্যে ২২,৭৮০ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। এরপর ১২ই ফেব্রুয়ারী নক্রুমাকে মুক্তি দেওয়া হল। সি. পি. পি. নেতারা এবার কার্য-নির্বাহী পরিষদে সদস্য হলেন এবং ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে নক্রুমাকে প্রধানমন্ত্রী ও কার্যনির্বাহী পরিষদকে ক্যাবিনেট আখ্যা দেওয়া হল।

গোল্ডকোস্টের জাতীয়তাবাদীরা তারপর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলে। এবং তার চাপে ১৯৫৪ সালে আর একবার দফা সংবিধানিক পরিবর্তন ঘোষিত হয়। নতুন আইন পরিষদ স্পীকার ছাড়া ১০৪ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গঠিত হবে বলে ঠিক হল। জুনমাসে আসে নতুন নির্বাচন। সি. পি. পি. জেতে ৭৯টি আসনে। নবগঠিত নর্দার্ণ পিপল্‌স পার্টি পায় ১২টি আসন। নির্বাচন শেষে নক্রুমা শুধুমাত্র আফ্রিকান সদস্যদের নিয়ে নতুন ক্যাবিনেট গঠন করলেন।

এই অবস্থা থেকে পূর্ণস্বরাজ বেশীদূরে থাকার কথা নয়। কিন্তু এমন সময়

সি. পি. পি. বিরোধীরা হাত মেলাল। আসান্তেকে কেন্দ্র করে গঠিত হল ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেণ্ট (এন. এল. এম.)। এই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গ্রহণ, যেখানে ন্‌ক্রুমা কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার পক্ষে প্রচার চালাচ্ছিলেন। অতঃপর সমস্ত ব্যাপারটি বিস্তৃতভাবে আলোচনার জন্য ন্‌ক্রুমা এক সিলেক্ট কমিটি গঠন করলেন। কিন্তু বিরোধী দল এর অধিবেশনে যোগ দিল না। কমিটি অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত দেয়। এমন অবস্থায় বৃটিশ সরকার প্রেরিত সংবিধানিক উপদেষ্টা স্যর ফ্রেডারিক বোর্ণ দুই বিরোধী পক্ষকে এক মতে আনতে সচেষ্ট হলেন। প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলেও স্যর ফ্রেডারিক যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে এমন কয়েকটি প্রস্তাব করেন যেগুলি পরে এক প্রতিনিধিমূলক শাসনতান্ত্রিক সম্মেলনে গৃহীত হয়।

১৯৫৬-এর জুলাই স্বাধীনতা-পূর্ব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এতে সি. পি. পি. ১০৪টির মধ্যে ৭২টি আসন পায়। এবং এইভাবে ন্‌ক্রুমা ও তাঁর দলের জনপ্রিয়তা আবার প্রমাণিত হওয়ায় বৃটিশ সরকার ১৯৫৭ সালের ৬ই মার্চ গোল্ডকোস্টকে স্বাধীনতাদানে প্রতিশ্রুত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত গণভোটের সিদ্ধান্ত অনুসারে অছি অঞ্চল বৃটিশ টোগো-ল্যাণ্ডও স্বাধীন গোল্ডকোস্ট বা ঘানার অন্যতম প্রদেশে পরিণত হল।

স্বাধীনতার পর আফ্রিকাকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টায় ন্‌ক্রুমার ভূমিকা উল্লেখনীয়। ১৯৫৮ সালে আক্রায় প্রথমে স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রনেতাদের এবং পরে সারা আফ্রিকান জন সম্মেলনের অধিবেশন বসে। সে বছরের সেপ্টেম্বরে গিনি যখন ফরাসীবন্ধন ছিন্ন করে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয়, তখন ন্‌ক্রুমার নেতৃত্বে ঘানা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। পরে ঘানা গিনি ও মালির ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনা করা হয়, যদিও এই পরিকল্পনার বাস্তবে রূপায়ন আমরা কখনও দেখি নি। এছাড়া ন্‌ক্রুমা সর্বদা আফ্রিকার দেশগুলির একীকরণের ওপর জোর দিয়েছেন। কঙ্গো ও রোডেশীয় সঙ্কটে ন্‌ক্রুমার নীতি তার অন্যতম উদাহরণ।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ন্‌ক্রুমা পরিকল্পিত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের মালিকানা ও পরিচালনায় শিল্পোন্নয়নে প্রযত্ন হয়েছেন। রাষ্ট্রোদ্যোগের কয়েকটি নমুনা দিই ; রাষ্ট্রীয় খনি কর্পোরেশন, ঘানা এয়ারওয়েজ, ব্ল্যাকস্টারলাইন (জাহাজ কোম্পানী) রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্র কর্পোরেশন, কোকো বিক্রয় বোর্ড, হীরক বিক্রয়

বোর্ড। পরে সরকারী উদ্যোগ পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্যেও হাত লাগায়। ঘানা জাতীয় ব্যবসায় কর্পোরেশন (জি. এন. টি. সি.) এর অন্যতম প্রমাণ। ১৯৬১ সালের অক্টোবরে রাষ্ট্রীয় যোজনা পরিষদ স্থাপিত হল। এর লক্ষ্য ছিল সরকারী উন্নয়ন প্রচেষ্টা এবং বিদেশী পুঁজি লগ্নীকরণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান।

আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আসে। ১৯৬০ সালে ঘানার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নক্রুমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন ইউ. জি. সি. সি.'র প্রতিষ্ঠাতা ডঃ জে. বি. ডাঙ্কোয়া। নক্রুমা তাঁকে সহজেই পরাস্ত করেন। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে এক গণভোটের আয়োজন হয়। এতে দুটি প্রশ্ন ছিল: (১) ঘানা একদলীয় রাষ্ট্রে রূপায়িত হবে কিনা; আর (২) বিচারকদের পদচ্যুত করার অধিকার রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হবে কিনা। গণভোট বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি গ্রহণ করে।

কিন্তু ইতিমধ্যে নক্রুমার বিরোধীরা শক্তিসঞ্চয়ে নেমেছে এবং তাদের সমবেত প্রচেষ্টায় ইউনাইটেড পার্টি গঠিত হয়েছে ১৯৫৭ সালের শেষার্ধে। নক্রুমা সরকারও উত্তরোত্তর বেশী ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। ১৯৫৭ সালে ডিপোর্টেশন অ্যাক্ট যে কোন বিদেশীকে ঘানা থেকে বিতাড়নের ক্ষমতা সরকারের হাতে দেয়। তারপর এল প্রিভেনটিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট যার মারফত যে কোন লোককে বিনাবিচারে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারারুদ্ধ করার অধিকার সরকার পায়। এই সব ক্ষমতা অন্য পার্টির নেতাদের এমনকি সি. পি. পি.র নক্রুমা বিরোধীদের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা হয়েছে। ১৯৬১এর অক্টোবরে ডক্টর ডাঙ্কোয়া ও অন্য একজন বিরোধী নেতা জো আপ্পিয়াকে কারারুদ্ধ করা হয়। তারপর একাধিকবার নক্রুমাকে হত্যার প্রচেষ্টা হলে কয়েকজন ক্যাবিনেট নেতাদেরও গ্রেপ্তার করা হল।

১৯৬৫ সালের জুনমাসে সাধারণ নির্বাচনে ১৯৮ জন সি. পি. পি. প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হল এবং নক্রুমাও আবার রাষ্ট্রপতি হলেন। তাঁর বিরুদ্ধেও কোন প্রার্থী দাঁড়ায় নি।

১৯৬৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী নক্রুমার অনুপস্থিতির সুযোগে সেনাদল ও পুলিসবাহিনীর অফিসারদের এক দল এক সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত করে। ফলে সংবিধান নাকচ করা হয়। এবং মন্ত্রিগণ ও আইনসভার সব সদস্য বরখাস্ত হল। পার্লামেণ্ট ও সি. পি. পি. ভেঙে দেওয়া হয়। সামরিক অভ্যুত্থানের নেতারা ন্যাশনাল লিবারেশন কাউন্সিল (এন. এল. সি.) বা

জাতীয় মুক্তি পরিষদ গঠন করে। জাতীয় মুক্তি পরিষদের অন্যতম প্রধান কাজ হল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান এবং নক্রুমা আমলের দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার সম্পর্কে তদন্তের জন্য একাধিক কমিশন গঠন। এন. এল. সি, বৃটেনের সঙ্গে রোডেশীয় সঙ্কটকালে ছিন্ন কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করে। এবং জনগণতন্ত্রী চীন (কম্যুনিস্ট) ও কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। নক্রুমা পরে গিনি প্রজাতন্ত্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

তিন

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর নাইজেরিয়া ছিল সবার বড় বৃটিশ উপনিবেশ, আয়তন এবং লোকসংখ্যা উভয়তঃই। (আয়তন: ৩৭৩,২৫০ বর্গমাইল; তৎকালীন লোকসংখ্যা: ৩২,০০০,০০০) স্বাধীনতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিন্তু নাইজেরিয়া ঘানার পেছনে পড়েছিল। ঘানা স্বাধীন হয়েছে ১৯৫৭ সালে, নাইজেরিয়ার স্বাধীনতা পেতে লেগেছে আরও তিনবছর।

নাইজেরিয়ার পেছিয়ে পড়ার কারণ পাওয়া যাবে সে দেশের অনতিপূর্ব ইতিহাসে।

পশ্চিম আফ্রিকার আধিপত্য নিয়ে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা উনবিংশ শতকের শেষভাগে হয় তার প্রধান কেন্দ্র ছিল নাইজার নদীর অববাহিকা ও মোহানা। ১৮৮৪-৮৫ সালে বেলিন কংগ্রেসে বোঝাপড়া হওয়ার পর ইংল্যাণ্ড ধীরে ধীরে বর্তমান নাইজেরিয়ায় ক্ষমতা বিস্তার করে। কিন্তু ১৯১৪ সালের আগে পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অংশ এক শাসন প্রতিষ্ঠানের অধীনে আনা হয় নি। এর ফলে নাইজেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যবোধ দুর্বল থেকে গেছে। অবশ্য নাইজেরিয়ার মত ঘানার বিভিন্ন অঞ্চলও বহুদিন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু ঘানার প্রগতিশীল দক্ষিণ (উপকূল) অঞ্চলের দেশের প্রায় অর্ধেক লোকের বাস। তাই এই অঞ্চলের পক্ষে পশ্চাৎপদ উত্তর প্রদেশকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। নাইজেরিয়ায় কিন্তু অর্ধেকের বেশী লোক বাস করে উত্তর অঞ্চলে। ঘানার উত্তর প্রদেশের তুলনায় নাইজেরিয়ার উত্তর অঞ্চলের লোকেরা অধিকতর সংগঠিত। সেখানকার অধিকাংশ লোক মুসলমান। অতীতে তাদের পূর্বপুরুষেরা একাধিক শক্তিশালী হৌসা রাজ্যের মালিক ছিল—

অথচ বর্তমানে দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় তারা পেছিয়ে আছে। দক্ষিণের লোকদের স্বাধীনতার দাবিকে তাই তারা সন্দেহের চোখে দেখেছে, ভেবেছে স্বাধীনতা এলে ইংরেজের বদলে দক্ষিণের লোকেরা শাসন চালাবে। উত্তর-দক্ষিণের এই বিভেদ নাইজেরিয়ার স্বাধীনতার পথে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অবশ্য আসল সমস্যা এর চেয়ে জটিলতর ছিল। উত্তরের হাউসা অধিবাসীদের কথা বলা হয়েছে। দক্ষিণে আছে দুটি প্রদেশ, পশ্চিম প্রদেশ ও পূর্ব প্রদেশ। পশ্চিম প্রদেশে যে উপজাতি প্রধান তার নাম 'য়োরুবা' আর পূর্ব প্রদেশ প্রধানতঃ 'ইবো', উপজাতি অধ্যুষিত। এ ছাড়া দেশের সব অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট অনেক উপজাতি। এই সব উপজাতির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস নাইজেরিয়ান জাতীয়তাবাদের পথরোধ করে আছে, যদিও দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল কী করে উল্লিখিত তিনটি প্রধান উপজাতির মধ্যে যথা হাউসা য়োরুবা ও ইবো,—ঐক্য গড়ে তোলা যায়। আর এদের মতৈক্য আনতে আনতে নাইজেরিয়ার স্বাধীনতা বিলম্বিত হয়েছে।

যেখানে উপজাতির প্রভাব এতবেশী সেখানে রাজনৈতিক দলও যে উপজাতিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে তাতে আশ্চর্যবোধ করার কারণ নেই। উত্তরাঞ্চলের মুসলমান প্রধান হাউসাদের রাজনৈতিক সংগঠন হল নর্দার্ন পিপল্‌স কংগ্রেস। পশ্চিমে অ্যাকশন গ্রুপ প্রধানতঃ য়োরুবাদের সমর্থন পায়। পূর্বাঞ্চল হল ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ্‌ নাইজেরিয়া অ্যাণ্ড দি ক্যামেরুন্স (এন. সি. এন. সি.) নামে রাজনৈতিক দলের ঘাঁটি। যদিও শেষোক্ত দলটি 'ইবো' উপজাতি-সমর্থিত, তবু পশ্চিম অঞ্চলেও এর কিছু প্রভাব আছে এবং উত্তরাঞ্চলে এর প্রতি সহানুভূতিশীল দল, নর্দার্ন এলিমেণ্টস প্রোগ্রেসিভ ইউনিয়ন, সামন্ততান্ত্রিক নর্দার্ন পিপল্‌স কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছে।

এন. সি. এন. সি. আজকের সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো প্রতিষ্ঠান। অবশ্য এর প্রতিষ্ঠার পূর্বে ওয়েস্ট আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও নাইজেরিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ওয়েস্ট আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস,—নামেই প্রকাশ—সমস্ত বৃটিশ পশ্চিম আফ্রিকার দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। পক্ষান্তরে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কার্যকলাপ

প্রধানতঃ লাগোস ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ সমগ্র নাইজেরিয়ার রাজনৈতিক প্রগতি নিয়ে আন্দোলন করার উদ্দেশ্যে কোন রাজনৈতিক দল তখনও গড়ে ওঠে নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার কিছু আগে থেকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণী ও পেশার স্বার্থরক্ষার জন্য একাধিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এদের কতকগুলি ট্রেড ইউনিয়ন ও বাকীগুলি গিল্ডের সঙ্গে তুলনীয়। এইসব সংগঠনের মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল : (ক) লাগোস মৎস্যজীবী সংঘ (১৯৩৭); (খ) আলাকোরো ইউনিয়ন মহিলাদের বাণিজ্য সংগঠন (১৯৩৯); (গ) ট্যাক্সি-চালক সমিতি (১৯৩৮); (ঘ) লাগোস কশাই সমিতি(১৯৩৯) ইত্যাদি, ইত্যাদি। এরও আগে ১৯৩১ সালে নাইজেরিয়ান শিক্ষকদের ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে। এই সব সংগঠন হয়তো প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে সাহায্য করে নি। কিন্তু নিজেদের ছোটখাট দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই এবং অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এদের সভ্য ও সমর্থকদের রাজনৈতিক চেতনাদান করেছে। বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড আন্দোলন থেকে অনেকে বুঝেছে ব্যাপক আন্দোলনের প্রয়োজন কতখানি।

এই ব্যাপক, দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজন কিছুটা মেটাতে সমর্থ হয় নাইজেরিয়ান যুব আন্দোলন। এ আন্দোলনের জন্ম শিক্ষাপ্রসার ও শিক্ষণক্ষেত্রে বৈষম্য অবসানের দাবি নিয়ে। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত যুব আন্দোলনের পরিধি লাগোস শহরের সীমানা পার হয়ে বেশীদূর বিস্তৃত হয় নি। ১৯৩৭ সালে আজিকিওয়ে গোল্ডকোস্ট থেকে নাইজেরিয়ায় ফেরেন এবং 'ওয়েস্ট আফ্রিকান পাইলট' নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এইসঙ্গে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে যুব আন্দোলনেও যোগ দিলেন। ১৯৩৮ সালে লাগোস পৌরসভার নির্বাচনে নাইজেরিয়ান ইয়ুথ মুভমেণ্ট জয়ী হল এবং তারপর আইন পরিষদের নির্বাচনে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে পরাস্ত করে।

এন. ওয়াই. এম. (নাইজেরিয়ান ইয়ুথ মুভমেণ্ট) প্রায় একই সময়ে নাইজেরিয়ান যুব সনদ প্রণয়ন ও প্রচার করে, যার মূল কথা ছিল দেশের বিভিন্ন উপজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে এই সনদ দাবি জানাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের।

বিভিন্ন উপজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টায় এন. ওয়াই. এম. দেশের

বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা সংগঠন বিস্তার করে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে এন. ওয়াই. এম. বেশীদিন কাজ চালাতে পারে নি। ১৯৪১ সালে আজিকিওয়ে ও ইবো উপজাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে য়োরুবা নেতাদের প্রকাশ্য বিভেদ দেখা দিল। এর পর থেকে এন. ওয়াই. এম. প্রধানতঃ য়োরুবাদের সংগঠন হিসাবে টিকে থাকে। ১৯৪৪ সালে আজিকিওয়ে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব নাইজেরিয়া অ্যাণ্ড দি ক্যামেরুন নামে নতুন এক রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপন করলেন।

এন. সি. এন. সি. কে রাজনৈতিক দল বলা ভুল হবে। বলা উচিত এটি একটি প্ল্যাটফর্ম। ব্যক্তি হিসাবে নয়, সংগঠন মারফত এর সদস্যপদ লাভ করার ব্যবস্থা হল। জন্মকালে এন. সি. এন. সি. নিম্নলিখিত সংগঠনগুলি নিয়ে গঠিত হয়: ২টি ট্রেড ইউনিয়ন, ২টি রাজনৈতিক দল (ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও ইয়ং ডেমোক্র্যাট্স), ৪টি সাহিত্য সমিতি (যথা, দি ইয়ুথ্স লিটারারী ইমপ্রুভমেণ্ট সার্কল), ৮টি বিশেষ পেশাদারী সঙ্ঘ (যেমন, ন্যাশনাল হার্বাল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিসিন), ১১টি ক্লাব (যথা আজিকিওয়ের অ্যাথলেটিক ক্লাব এবং মেরী রোস ক্লাব), এবং ১০১টি উপজাতীয় সংগঠন (উদাহরণ: ইবো ইউনিয়ন ও ইজেবু ন্যাশনাল ইউনিয়ন)।

১৯৪৪ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এন. সি. এন. সি. নাইজেরিয়ার সর্বপ্রধান রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে কাজ করেছে। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে এর অবদান এত বেশী হওয়ায় এই সংগঠনের ও তার নেতা শ্রীআজিকিওয়ের আদর্শ ও মতবাদ সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

আজিকিওয়ে লাগোস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা পান। ১৯৩৪ সালে আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি নাইজেরিয়ায় স্বল্পকাল থাকার পর গোল্ডকোস্ট উপনিবেশে সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯৩৭ সাল থেকে তিনি নাইজেরিয়ার রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। আজিকিওয়ের জন্ম উপজাতীয় বন্ধনমুক্ত পরিবারে। ন'বছর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়েছেন। সেখানকার নিগ্রো নেতাদের সঙ্গে মিশেছেন। সেখানকার সাংবাদিকতার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করেছেন। দেশে ফিরে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মসূচী ও দাবিদাওয়া এবং প্রচারকার্য উভয় দিকেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলেন। বর্ণবৈষম্য ও আফ্রিকানদের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি ক্ষমাহীন আক্রমণ চালান। রাজনৈতিক চেতনা প্রচারে তাঁর

সংবাদপত্রের (প্রধানতঃ ওয়েস্ট আফ্রিকান পাইলট) নির্ভীক মন্তব্য ও সমালোচনা প্রচুর সাহায্য করল।

যুদ্ধোত্তর যুগে আজিকিওয়ের জনপ্রিয়তা ও সমর্থন প্রধানতঃ নীচের গোষ্ঠীসমূহ থেকে আসে :

(ক) সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক। ১৯৪০ সালে নাইজেরিয়ায় মাত্র ১২টি ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব ছিল এবং তাদের সভ্য সংখ্যা ছিল ৪,৩৩৭। ১৯৫৪-৫৫ সালে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৭ এবং সংগঠিত শ্রমিক সংখ্যা ১,৬৫,১৩০। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, প্ল্যাটফর্ম হিসাবে এন. সি. এন. সি. খুব বেশী ট্রেড ইউনিয়কে সংগঠনে টানতে পারে নি। কিন্তু বহু সাধারণ মজুর অন্যান্য সংস্থার (যেমন উপজাতীয় ইউনিয়ন) সদস্য হিসাবে এন. সি. এন. সি. কে সমর্থন করেছে। এই সমর্থন অনেকাংশে বেড়ে যায় ১৯৪৫ সালের সাধারণ ধর্মঘটের পর। মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি ও বর্ণবৈষম্য অবসানের দাবি নিয়ে এই সাধারণ ধর্মঘটে নাইজেরিয়ান ট্রেড্‌স ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতারা নির্ভীক নেতৃত্ব দিতে পারেন নি, যেখানে আজিকিওয়ে এবং তাঁর সংবাদপত্র একে সোৎসাহ সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালের সাধারণ ধর্মঘট অনুৎসাহী নাইজেরিয়ানদের এবং ইওরোপীয় কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে দিল যে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনে দেশের স্বাভাবিক শাসন অচল করা যেতে পারে। এ উপলব্ধি নাইজেরিয়ার জনসাধারণকে অনেক বেশী রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে। এমনকি এতদিন পর্যন্ত শান্ত উত্তর প্রদেশেও এ চেতনা পরিব্যাপ্ত হয়। স্বভাবতঃ এ ধর্মঘটে যাঁরা সমর্থন জানান তাঁদের জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে যায়, বিশেষ করে শ্রমিক মহলে।

(খ) কেরানী, শিক্ষক ও কারিগর শ্রেণীর কাছে আজিকিওয়ে তাঁর মত প্রচার করলেন কাগজ মারফত। এতদিন পর্যন্ত নাইজেরিয়ার সংবাদপত্রে অভিজাত সমাজের কথা ছাপা হত। আজিকিওয়ে সাধারণ লোকের খবর ও সমস্যাকে বেশী করে স্থান দিতে লাগলেন।

(গ) আজিকিওয়ের পাণ্ডিত্য, খেলাধূলার উন্নতি বিধানে তাঁর উৎসাহ, শিক্ষাবিস্তারে তাঁর আগ্রহ, তাঁর নির্ভীক সাংবাদিকতা যুবকদের একটা বড় অংশকে তাঁর আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট করে।

(ঘ) আজিকিওয়ে নিজে ইবো বলে ইবো উপজাতির মধ্যে তাঁর প্রভাব স্বাভাবিক। কিন্তু ইবো ছাড়া অন্য উপজাতির মধ্যেও তিনি কিছুটা জনপ্রিয়।

এমন কি উত্তর প্রদেশের হাউসা, ফুলানি ও কানুরি উপজাতির যুবসম্প্রদায়ের এক বর্ধমান অংশ আজিকিওয়েকে জাতীয় নেতা হিসাবে গ্রহণ করে।

এন. সি. এন.সি. ছাড়া-ও আজিকিওয়ের মতাদর্শ প্রচার করার জন্য ১৯৪৬ সালে আর একটি সংগঠন খাড়া করা হয় যার নাম ছিল 'জিকিস্ট মুভ্‌মেণ্ট' (পরে এর নাম দেওয়া হয় ফ্রীডম মুভমেণ্ট)। জাতীয় আন্দোলনে চরমপন্থী অংশের মধ্যে যাঁরা আজিকিওয়ের গুণগ্রাহী ছিলেন তাঁরা এ আন্দোলনের পত্তন করেন। এর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল বিরূপ সমালোচনার বিরুদ্ধে আজিকিওয়েকে সমর্থন করা। বীরপূজার চরম উদাহরণ হল এই 'জিকিস্ট মুভমেণ্ট'। আজিকিওয়ের জন্মদিন এর সমস্ত শাখা সংগঠন পালন করত। সভাসমিতিতে জিকবাদী পতাকা উত্তোলিত হত এবং সম্মিলিতকণ্ঠে জিকীয় সংগীত ('জীবন আমার কাছে আনন্দরস') গাওয়া হত।

জিকিস্ট মুভমেণ্টের উদ্দেশ্য সন্ধান করতে হবে জিকবাদী দর্শনে। শেয়াফর ওরিজু নামে আজিকিওয়ের এক অনুরাগী ভক্ত 'জিকীয় দর্শন' এমন-ভাবে ব্যাখ্যা করেন :

"আমার আত্মার অচেতন তৃষ্ণাকে প্রকাশের জন্য আমি 'জিকবাদ' দর্শনের নামকরণ করেছি। —'জিকবাদ' হল পরাধীন দেশ স্বাধীন করার ভাবাদর্শ। জিকবাদ ঈশ্বর-সম্মত পরিকল্পনা। এ হল পুনরুজ্জীবিত বিশ্বজনীন দর্শন। আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ এ নয়, নয় বর্ণবিদ্বেষবাদ, নৈরাজ্যবাদ, কিংবা অদ্বৈতবাদ। জিকবাদ বিদ্রূপাত্মক কিংবা ক্ষমাভীরু আদর্শের কোনটাই নয়। এ হল জীবনে বিশ্বাস ও সৃজনাত্মক প্রেরণা। জিকবাদ একটি সামাজিক অতিকথার ওপর নির্ভর করে বিকশিত ও প্রসারিত হবে, তা হল আফ্রিকার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের মতবাদ, যার মানে হল সামাজিক ধ্বংস, রাজনৈতিক দাসত্ব ও অর্থনৈতিক শক্তিহীনতার হাত থেকে আফ্রিকার মুক্তি।"

১৯৪৮ সালের শেষভাগ পর্যন্ত 'জিকবাদী আন্দোলন' আসলে এন. সি. এন. সি.'র যুবফ্রণ্ট হিসাবে কাজ করে। ১৯৪৮ সালের শেষে যখন এন. সি. এন. সি.র প্রভাব কমতে শুরু করে, তখন জিকবাদী আন্দোলন আরো উগ্র আকার ধারণ করে। অক্টোবর মাসে এক জনসভায় একজন নেতৃস্থানীয় জিকবাদী ওসিটা সি. আগউনা 'বিপ্লবের ডাক' নামে এক বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে জিকবাদ ছাড়া অন্য এক দর্শনের প্রয়োজন হয়েছে। প্রয়োজন হয়েছে নতুন কর্মপন্থার। তাঁর প্রস্তাবিত কর্মপন্থার মধ্যে

ছিল: সারা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট, করবন্ধ আন্দোলন, বিদেশী পণ্য বয়কট, এবং বিদেশযাত্রী ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান। এর কিছুদিন পরে 'জিকবাদী আন্দোলনের' সভাপতি মল্লম আবদাল্লা এক বক্তৃতায় বলেন, "সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি ইউনিয়ন জ্যাককে ঘৃণা করি। কারণ যেখানেই সে গেছে, সেখানেই জনসাধারণকে বিভক্ত করেছে। অত্যাচার প্রভুত্ব, শোষণ ও পাশবিকতার প্রতীক হল এই পতাকা।"

জাতীয় আন্দোলনের এই সংগ্রামাত্মক ধারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেরি করে না। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১০ জন জিকবাদী নেতাকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হল। এই সব নেতাদের অধিকাংশকে কঠোর শাস্তি দেওয়ায়, জিকবাদী আন্দোলনে সাময়িক ভাঁটা পড়ে।

কিন্তু পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করে এই থিতিয়ে পড়াটা সাময়িক মাত্র। ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে পূর্বপ্রদেশের এনুগু কলিয়ারীতে দাঙ্গাহাঙ্গামায় পুলিসের গুলিতে ২১ জন খনি শ্রমিক নিহত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জিকবাদীরা প্রতিবাদ আন্দোলনকে জঙ্গী রূপ দেয়। জনতার বিক্ষোভ সংগঠিত হয় বিভিন্ন শহরে, পুলিসের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ চলে। পুলিস সারা নাইজেরিয়ায় জিকবাদীদের বাড়ি খানাতল্লাস করে এবং প্রচুর রাজ-দ্রোহমূলক লেখা পায় বলে দাবি করে। জিকবাদীদের আপসহীন মনোভাবের প্রশস্ত পরিচয় মেলে আন্দোলনের সম্পাদকের বক্তৃতায়। এই ২৪ বছরের যুবককে যখন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার করা হচ্ছিল, তখন তিনি বিচারকের উদ্দেশ্যে বলেন:

"আপনার ও যে সরকারের প্রতিনিধি আপনি, তার পেছনে অজস্র সম্পদ ও বলপ্রয়োগকারী রাষ্ট্রযন্ত্র থাকা সত্ত্বেও জিকবাদী হিসাবে আমি এ আদালতের বর্তমান মামলা বিচার করার অধিকার অস্বীকার করি...... আমি ও আমার সহকর্মীরা যে সাম্রাজ্যবাদী শাসন যন্ত্রকে ঘৃণা করি, আপনি তার প্রতীক। তাই আমি এই আদালতের সামনে স্বপক্ষ সমর্থন করছি না।"

১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে জিকবাদী আন্দোলনকে বেআইনী ঘোষণা করা হল। পরের মাসে জিকবাদীরা 'ফ্রীডম মুভমেন্ট' বা 'স্বাধীনতা আন্দোলন' নামে এক নতুন সংগঠন তৈরি করলেন। বলা হল এই সংগঠন সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসসাধন ও এক স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক নাইজেরীয়

প্রজাতন্ত্র গঠনে চেষ্টিত হবে। এর জন্য আন্দোলন পার্লামেণ্টের ভিতরে ও বাইরে অহিংস ও বৈপ্লবিক সংগ্রাম কৌশল প্রয়োগ করবে।

'ফ্রীডম মুভমেণ্ট'-এর আয়ু বেশীদিন থাকে নি। প্রথম থেকে এর মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে দলাদলি হয়। তারপর ১৯৫১ সালে এন. সি. এন. সি.তে ব্যক্তি হিসাবে সদস্যপদ পাওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং পরের বছর এন. সি. এন. সি. যুব সঙ্ঘ গঠিত হল। ইতিমধ্যে আজিকিওয়ে চরমপন্থীদের পূর্ণ সমর্থন দিতে ইতস্তত করছিলেন। বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর নিজের বিশ্বাসেও বোধহয় ভাঙন ধরেছিল। তার একটা কারণ হয়তো এই যে এর মধ্যে শাসনব্যবস্থার সংস্কার আরম্ভ হয়েছে। ১৯৪৬ সালের রিচার্ডস সংবিধান জাতীয়তাবাদী নেতাদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি, কারণ তার মারফত প্রকৃতপক্ষে বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যাধিক্য পাওয়া যায় নি। বেসরকারী সদস্যদের এক অংশ গভর্নর কতৃক আইনসভার সদস্যপদে নিযুক্ত হতেন। তাছাড়া উপজাতীয় প্রধান ও আমীরদের ও বেসরকারী সদস্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়, যদিও অধিকাংশ সময় তাঁরা সরকারের সঙ্গে কাজ করতেন। তার ওপর এ সংবিধানে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয় নি। এই সব কারণে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কিছুটা আশাহত হয়। কিন্তু ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে রিচার্ডস সংবিধান পর্যালোচনা করার জন্য সম্মেলন আহুত হয়।

বলতে গেলে সারা ১৯৪৯ সাল ধরে ছোটবড় নানা সভায় নতুন সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা হয়। যার পরিসমাপ্তি হয় ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে ইবাদান শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে। ১৯৫১ সালের জুন মাসে নাইজেরিয়ায় ম্যাকফার্সন সংবিধান প্রবর্তিত করা হয়। এক বছর যেতে না যেতে এ সংবিধান ও পরিবর্তন করার দাবি তোলা হয় এবং ১৯৫৩ সালের লণ্ডন সম্মেলনে জাতীয়তাবাদী নেতারা বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভাবী সংবিধান সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন যার পরিণতি হয় ১৯৫৪ সালের সংবিধানে। তার তিন বছর বাদে আরো কতকগুলি সংবিধানিক পরিবর্তন করা হয়।

এত দ্রুত ও মোটামুটি সুদূরপ্রসারী শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন যে অনেকাংশে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে আবহাওয়া অনুকূল করে এতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং জঙ্গী জিকবাদী আন্দোলন এই পরিস্থিতিতে এবং আজিকিওয়ের বলিষ্ঠ সমর্থন ছাড়া বিশেষ শক্তি অর্জন করতে পারে নি।

সংগ্রামী আন্দোলনে মন্দগতির অন্য এক কারণ ও দেওয়া যেতে পারে। যুদ্ধের পরে ক্রমশঃ ও বিশেষ করে ১৯৪৮ সালের পর থেকে আঞ্চলিক আন্দোলন যথেষ্ট বলশালী হয়ে ওঠে। এর কারণ কী তা আমরা পরে বিশ্লেষণ করব। এখানে শুধু এর ফলের ওপর জোর দেওয়া যাক। আঞ্চলিক রেষারেষি ও কয়েক ক্ষেত্রে প্রকাশ্য শত্রুতার দরুন জঙ্গী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিত্তি সঙ্কীর্ণতর হয়ে যায় বিশেষতঃ যখন জিকবাদী সংগঠনের সমর্থন প্রধানতঃ পূর্ব প্রদেশের ইবো কৌমের কাছ থেকে আসে।

তাই, অনিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামী আন্দোলনের প্রাবল্য বেশীদিন চলা কঠিন ছিল।

এবার সেই আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের কথায় আসা যাক। আগেই বলা হয়েছে নাইজেরিয়ায় প্রধান তিনটি প্রদেশে [উত্তর, (এবং দক্ষিণে) পূর্ব ও পশ্চিম] তিনটি বৃহৎ উপজাতির আধিপত্য, সংখ্যা ও সংগঠন উভয় দিক থেকে উত্তরে হাউসা, পূর্বে ইবো ও পশ্চিমে য়োরুবা। এতক্ষণ আমরা প্রধানতঃ ইবোদের রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা আলোচনা করেছিলুম, যদিও এইসব আন্দোলনে অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের কিছু কিছু অবদান আছে। আর এন. সি. এন. সি.কে আইনতঃ ইবো প্রতিষ্ঠান আখ্যা না দেওয়া গেলেও কার্যতঃ অন্য উপজাতির চোখে এন. সি. এন. সি. এক বিশেষ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতীয়মান হত।

ইবোদের মত পশ্চিম প্রদেশের য়োরুবা উপজাতি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক নানা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এর মধ্যে ১৯৪৫ সালে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত এগ্‌বে ওমো ওডুডুয়া (ওডুডুয়ার বংশধরদের সঙ্ঘ-ওডুডুয়া হলেন য়োরুবাদের উপকথা-বর্ণিত পূর্বপুরুষ) এবং ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত অ্যাকশন গ্রুপ। এই দুই প্রতিষ্ঠান য়োরুবাদের উপজাতীয় চেতনা প্রবলতর করে। তাছাড়া ১৯৫১ সালে প্রবর্তিত ম্যাকফার্সন সংবিধান আঞ্চলিক বিভাগ বজায় রাখে এমনকি বোধ হয় কিছু পরিমাণে আঞ্চলিক ও উপজাতীয় আন্দোলনকে প্রকারান্তরে সমর্থনও জানায়। পশ্চিম প্রদেশে ১৯৫১ সালের নির্বাচনে এন. সি. এন. সি.-কে অনেক ব্যবধানে হারিয়ে বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসাবে অ্যাকশন গ্রুপের আবির্ভাব প্রকারান্তরে আঞ্চলিকতার জয়লাভের সূচনা করে।

অ্যাকশন গ্রুপ নীতিগতভাবে য়োরুবাদের সংগঠন ছিল না। এর উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল :

(ক) পশ্চিম প্রদেশের সমস্ত উপজাতীয় সংগঠনগুলিকে জোরদার করা ; এবং (খ) নাইজেরিয়ার অন্য জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে সারা দেশব্যাপী এক সম্মিলিত সংস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।

কার্যতঃ, অবশ্য অ্যাকশন গ্রুপ য়োরুবা-প্রধান সংগঠনে দাঁড়িয়ে যায়। এবং এন. সি. এন. সি.র সঙ্গে এর বিরোধ ইবো-য়োরুবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাংগঠনিক প্রতিফলন বলা যেতে পারে।

পশ্চিম প্রদেশের মত উত্তর প্রদেশেও আঞ্চলিক সংগঠন ক্রমশঃ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এতদিন এ অঞ্চলে রাজনৈতিক আন্দোলন পেছিয়ে থাকার কারণ একাধিক : (অ) প্রথমতঃ দক্ষিণাংশের মত উত্তরাংশে আধুনিক শিক্ষা-প্রাপ্ত শ্রেণীর জন্ম অনেক পরে হয়েছে। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত নাকি মাত্র একজন উত্তর প্রদেশের অধিবাসী উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যায়। (আ) দ্বিতীয়তঃ অন্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে ছোট ও মাঝারি বণিকশ্রেণীর উৎপত্তি হয় নি। (ই) উত্তরাংশে বৃটিশ সরকার প্রবর্তিত নেটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা পরোক্ষ শাসন শক্তিশালী হওয়ায় যারা পরে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হতে পারত এমন অনেকের কর্ম সংস্থান হয়ে যায়। (ঈ) উত্তর প্রদেশের সামন্ততন্ত্র ও পরোক্ষ শাসন যা এই সামন্ততন্ত্রকে অধিকতর শক্তিশালী করে রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে খানিকটা বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

অবশ্য, তার মানে এই নয় যে দক্ষিণ অঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলনের ছোঁয়াচ উত্তরাংশকে অস্পৃষ্ট রেখেছিল। মল্লম সা'দ জুঙ্গুর আজিকিওয়ের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণী রাজনৈতিক আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মল্লম সা'দ অন্য কয়েকজন উৎসাহী বন্ধুর সহযোগিতায় ১৯৪৩ সালে 'বাউচি সাধারণ উন্নয়ন ইউনিয়ন' নামে এক প্রতিষ্ঠান খাড়া করলেন। কিন্তু বাউচির আমীরের সক্রিয় শত্রুতায় ইউনিয়ন কাজ চালাতে অক্ষম হয়। ১৯৪৫ সালে কয়েকজন জিকবাদী মিলে কানো শহরে নর্দার্ন এলিমেণ্টস' প্রোগ্রেসিভ অ্যাসোসিয়েশন গঠন করলেন। কিন্তু বাউচি ইউনিয়নের মত এই সংগঠনটিও কাজ চালাতে অসমর্থ হল। সবশেষে ১৯৫০ সালে দক্ষিণের আন্দোলন এন. সি. এন. সি.র সমর্থকেরা আবার কানো শহরে মিলিত হয়ে নর্দার্ন এলিমেণ্টস' প্রোগেসিভ ইউনিয়ন নামে নতুন এক প্রতিষ্ঠার স্থাপন করলেন।

ইতিমধ্যে উত্তর প্রদেশের গোঁড়া দক্ষিণ-বিরোধীরা মিলে ১৯৪৯ সালে নর্দার্ন পিপল্‌স' কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছেন। নর্দার্ন পিপল্‌স কংগ্রেসের পরবর্তী

নির্বাচনী সাফল্য উত্তর-দক্ষিণ বিরোধের তীব্রতা তথা আঞ্চলিক আনুগত্যের শক্তির পরিচায়ক। এবার এই উত্তর-দক্ষিণ বিরোধের কারণগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

(১) উত্তর অঞ্চল মুসলিম প্রধান, দক্ষিণ অঞ্চল প্রধানতঃ অমুসলিম এবং বেশ কিছু খৃষ্টান সেখানে আছে।

(২) উত্তর অঞ্চলে সামন্ততন্ত্র প্রবল, দক্ষিণ অঞ্চলে ধনতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি স্থাপন হচ্ছে।

(৩) উত্তর অঞ্চল শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চেতনায় পশ্চাৎপদ।

(৪) এর ফলে দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা এসে উত্তর অঞ্চলের অফিস, আদালত, স্কুল, পরিবহনব্যবস্থা ইত্যাদিতে কাজ করে। উত্তরে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিতশ্রেণীর অগ্রগতির পক্ষে এ অবস্থা বাধাস্বরূপ।

নর্দার্ন পিপল্‌স কংগ্রেস (এন. সি. সি.) উত্তর প্রদেশের অধিবাসীদের এই দক্ষিণ বিরোধিতাকে রাজনৈতিক মূলধন হিসাবে ব্যবহার করেছে। এবং তাই নর্দার্ন এলিমেণ্টস প্রোগ্রেসিভ ইউনিয়নের চেয়ে তারা অনেক বেশী শক্তিশালী। উত্তর প্রদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতে এবং স্বাধীনতার পর নাইজেরীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী হন এন. সি. সি.'র নেতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সুপ্ত থেকে যুদ্ধোত্তর যুগে নাইজেরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে যেন হঠাৎ বিস্ফোরণ দেখা দিয়েছে। তার ফলে ১৫ বছরের মধ্যে পাঁচবার সংবিধানিক পরিবর্তন করতে হয়েছে: ১৯৪৬, ১৯৫১, ১৯৫৪, ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালে। রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতা বারে বারে শাসনকাঠামোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। ফলে মুক্তিচেতনাকে সন্তুষ্ট করার জন্ত বৃটিশ সরকারকে দ্রুতগতিতে নাইজেরিয়ার স্বাধীনতার পথে এগোতে হয়েছে।

১৯৫৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম প্রদেশকে (অর্থাৎ সারা দক্ষিণ অঞ্চলকে) আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। উত্তর অঞ্চল প্রস্তুতির জন্ত সময় চায় এবং ১৯৫৯ সালে স্বায়ত্তশাসন পায়।

পরের বছর ১৯৬০ সালে নাইজেরিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। নর্দার্ন পিপল্‌স কংগ্রেস ও ন্তাশনাল কাউন্সিল অফ নাইজেরিয়া অ্যাণ্ড দি ক্যামেরুন্সের মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে আজিকিওয়ে দেশের গভর্নর জেনারেল ও নর্দার্ন

পিপল্‌স কংগ্রেসের নেতা জনাব আলহাজী আবুবাকার তাফাওয়া বালেওয়া প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন।

স্বাধীনতার পর নাইজেরিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বহু পরিবর্তন ঘটেছে।

প্রথমতঃ ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে শাসিত অছি অঞ্চল বৃটিশ ক্যামেরুন্সে গণভোট নেওয়া হয়। তার ফলে বৃটিশ ক্যামেরুন্সের উত্তরাংশ সরদাউনা প্রদেশ নামে উত্তর নাইজেরিয়ার এবং দক্ষিণাংশ ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হল। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন মধ্য-পশ্চিম প্রদেশ গঠন। কিছুদিন ধরে এই এলাকার অধিবাসীরা পশ্চিম প্রদেশ থেকে পৃথক হয়ে নতুন এক প্রদেশ গঠনের দাবি জানাচ্ছিল। ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নাইজেরিয়ার সমস্ত রাজনৈতিক দল কর্তৃক এমন দাবি সমর্থনের পর মধ্য-পশ্চিম প্রদেশ গঠিত হল। ১৯৬৩ সালেই নাইজেরিয়া প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয় এবং ডক্টর আজিকিওয়ে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলেন।

ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন উপজাতি ও প্রদেশের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হয়েছে। পশ্চিম প্রদেশের প্রধান রাজনৈতিক দল অ্যাকশান গ্রুপে ফাটল ধরে ১৯৬২ সালে। এক উপদলের নেতা শ্রীআকিন্তোলা এন. সি. এন. সি.'র সমর্থনে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে অ্যাকশান গ্রুপের আদি নেতা শ্রীআওলোও দেশদ্রোহের অভিযোগে দশ বছরের কারাদণ্ড পেলেন।

১৯৬৪-এর ডিসেম্বর মাসে নাইজেরিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচন শুরু হয়। দুটি প্রধান মোর্চার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। একদিকে নর্দার্ন পিপল্‌স কংগ্রেস (নেতা আহমাদু বেলো ও তাফাওয়া বালেয়া), নাইজেরিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (নেতা আকিন্তোলা) এবং আরো দু'একটি রাজনৈতিক দল নাইজেরিয়ান ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স (এন. এন. এ.) সংগঠন করে। অন্যদিকে এন. সি. এন. সি, আওলোওর অ্যাকশন গ্রুপ এবং নর্দার্ন এলিমেণ্টস প্রোগ্রেসিভ ইউনিয়ন সামিল হয় ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ গ্র্যাণ্ড অ্যালায়েন্সে (ইউ. পি. জি. এ.)। রক্তপাত ও দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হতে পারে নি। এবং ইউ. পি. জি. এ. নির্বাচন বয়কট করে। উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশে এন. এন. এ. অধিকাংশ

আসনে জেতে। পূর্ব প্রদেশে বয়কটের ফলে বলতে গেলে কোন নির্বাচন হতেই পারে নি।

বিবদমান দুই পক্ষের অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে নাইজেরিয়ান যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে পড়ার উপক্রম হলে রাষ্ট্রপতি ডক্টর আজিকিওয়ের হস্তক্ষেপে মিটমাট হয়। পূর্ব প্রদেশ ও লেগস (যেখানে নির্বাচন হতে পারে নি) শহরে আবার নির্বাচন হয়। শেষপর্যন্ত এন. এন. এ. পায় ১৯৮টি এবং ইউ. পি. জি. এ. পায় ১০৮টি আসন। পরে স্যর আবুবকর দু' মোর্চা থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এক নয়া সরকার গঠন করলেন।

কিন্তু নতুন সরকার এক বছরও টেকেনি। ১৯৬৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী সেনাদলের অফিসারেরা ক্ষমতা দখল করে। উত্তর প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী স্যর আহমাদু বেলো, পশ্চিম প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী চীফ আকিন্তোলা এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী স্যর আবুবকর স্বয়ং নিহত হলেন। পুরোনো সংবিধান খারিজ করে প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল ইরোনসি নিজ হস্তে সমস্ত ক্ষমতা তুলে নিলেন। এবং চারটি প্রদেশে চারজন সামরিক গভর্নর ইরোনসির প্রতিনিধি হিসাবে শাসন করতে থাকে। কিন্তু উপজাতীয় দ্বন্দ্বের ছোঁয়াচ সেনাদলেও এসে লাগে। জুলাই মাসে হাউসা সৈন্যরা বিদ্রোহী ইবোদের পাইকারীভাবে হত্যা করে। ইরোনসিও নিহত হন। এবং উত্তর প্রদেশের অফিসার কর্নেল গাওয়ান সারা দেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। গাওয়ানের ক্ষমতা কিন্তু পূর্ব প্রদেশে পৌঁছোয় নি। সেখানে লেফটেনাণ্ট কর্নেল ওজুকু সামরিক শাসনের পরিচালক। দু'একবার চেষ্টা করেও গাওয়ান ও ওজুকু অনেক ব্যাপারে একমত হতে পারেন নি। নাইজেরিয়ার ঐক্য আজ ভাঙনের মুখে। অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব নাইজেরিয়া হয়ত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

চার

পশ্চিম আফ্রিকায় ঘানা, নাইজেরিয়া, গিনি, মালি, আইভরী কোস্ট প্রভৃতি দেশের পাশে সিয়েরা লিওনকে নিতান্ত নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর লাগে। কারণ আয়তন ও লোকসংখ্যা উভয়তঃই সিয়েরা লিওন এদের সবার চেয়ে ছোট। কিন্তু সিয়েরা লিওনের ইতিহাস বোধকরি সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর।

সিয়েরা লিওন হল বৃটেনের প্রাচীনতম আফ্রিকার উপনিবেশ।

আফ্রিকার অন্য দেশের মত (উত্তর আফ্রিকা ছাড়া) এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় পর্তুগীজ নাবিকদের লেখায়। ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে পোড্রা ডা সিণ্ট্রা এ দেশের নামকরণ করেন সিয়েরা লিওন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে পর্তুগীজরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। নদীর মোহানা এবং পানীয় জলের সরবরাহের সুবিধার জন্য অনেক দূরগামী জাহাজ সিয়েরা লিওনে থামত। তার ওপর সন্নিহিত অঞ্চল থেকে গোলাম সংগ্রহ করার সুযোগ ছিল। অতএব, পর্তুগীজদের পর অন্য ইওরোপীয় অ্যাডভেঞ্চারাররাও এখানে আসে।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে আধুনিক সিয়েরা লিওনের পত্তন হয় দাস-ব্যবসায় বিরোধী আন্দোলন থেকে। ১৭৭২ সালে লর্ড চীফ জাস্টিস ম্যাক্সফিল্ডের এক যুগান্তকারী রায়ে বলা হয় যে কোন ক্রীতদাস ইংল্যাণ্ডে পদার্পণ করা মাত্র তার হৃত স্বাধীনতা ফিরে পাবে। ওই রায়ের ফলে ইংল্যাণ্ডে হাজার হাজার গোলাম মুক্তি পেল। কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের দুর্ভাগ্য শেষ হয় না। কারণ এদের জন্য কোন চাকরির ব্যবস্থা ছিল না। মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের শোচনীয় অবস্থা দেখে দাসপ্রথা-অবসান সমিতির নেতারা স্থির করলেন যে আফ্রিকায় জমি কিনে এদের উপনিবেশ স্থাপন করলে হয়তো এদের সমস্যার সুরাহা হবে। এই উদ্দেশ্যে গ্রেনভিল শার্প (দাসপ্রথা বিরোধী নেতা) সিয়েরা লিওনকে নির্বাচিত করলেন। এই নির্বাচনের কারণ হিসাবে আমরা শার্পকে লেখা জনৈক ইংরাজ বিজ্ঞানীর (যিনি সিয়েরা লিওনে কিছুদিন কাটিয়ে ছিলেন) চিঠি থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি:

"এদেশের জলবায়ু এত ফলপ্রসূ ও শীতাতপের তীব্রতা এত কম যে দুখানা কাপড়, একটা কাঠের কুড়ুল এবং একটা পকেট ছুরি নিয়ে একজন মানুষ অনায়াসে দিন কাটাতে পারে।"

গ্রেনভিল শার্পের পরিকল্পনা বৃটিশ সরকার ও সেবা প্রতিষ্ঠানের সমর্থন পায়। বেসরকারীভাবে কয়েক হাজার পাউণ্ড সংগ্রহ করা হয়; এবং বৃটিশ সরকার পাথেয় ও ছ' মাসের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী ৩১৫ জন মুক্তিপ্রাপ্ত নিগ্রো ক্রীতদাস ও ৬০ জন 'শ্বেত' রমণী (গুরুতর অপরাধের জন্য বৃটিশ সরকার

যাদের নির্বাসন দিতে চেয়েছিল) সিয়েরা লিওনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। মে মাসের মাঝামাঝি তারা অকুস্থলে পৌছোয়। এবং কিছুদিনের মধ্যে স্থানীয় উপজাতীয় সর্দারের কাছ থেকে বসতি করার জন্য কিছু জমি পাওয়া যায়। এই হল সিয়েরা লিওনের জন্ম।

এরপর ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে এক হাজারের-ও বেশী স্কোশিয়ানরা (অর্থাৎ আমেরিকার বৈপ্লবিক যুদ্ধে যে সব নিগ্রো ক্রীতদাসরা তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইংলণ্ডের হয়ে যুদ্ধ করেছিল এবং যাদের পরে নোভা স্কোশিয়াতে পাঠান হয়) সিয়েরা লিওনে বসতি স্থাপন করতে এল। নানা দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসেরা ধীরে ধীরে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলে। স্থানীয় টেমনে উপজাতির সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। নাপোলেওনিক যুদ্ধে ফরাসী নৌবহর সিয়েরা লিওনের প্রধান উপনিবেশ ফ্রি টাউন বিধ্বস্ত করে। কিন্তু ঔপনিবেশিকরা তাদের বসতি ত্যাগ করে নি। এতদিন পর্যন্ত সিয়েরা লিওন কোম্পানী উপনিবেশ শাসন করছিল। ১৮০৭ সালে বৃটেন 'ক্রাউন কলোনী' হিসাবে সিয়েরা লিওনের শাসনভার গ্রহণ করে।

সিয়েরা লিওন উপনিবেশের শাসনভার বৃটিশ সহকার স্বহস্তে গ্রহণ করার প্রায় ৯০ বছর পরে আভ্যন্তরীণ অঞ্চল বৃটিশ 'আশ্রিত' অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়। আদি উপনিবেশ (ক্রাউন কলোনী) যার আয়তন মাত্র ৪,০০০ বর্গ মাইল এভাবে যুক্ত হল ২৬,০০০ বর্গ মাইল আয়তনের এক 'আশ্রিত' অঞ্চলের সঙ্গে। এই দুই এলাকা নিয়ে আজকের সিয়েরা লিওন গঠিত।

সিয়েরা লিওনের ইতিহাস এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়ার জন্য এর জনসংখ্যাও হয়েছে বহু মিশ্রিত। আজ ফ্রি টাউন শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাস করে ৪০,০০০ ক্রেওল (ইওরো-আফ্রিকান) যাদের পূর্বপুরুষেরা মুক্ত ক্রীতদাস হিসাবে সিয়েরা লিওন উপনিবেশের পত্তন করে। এরা সকলে খৃষ্টান এবং ইওরোপীয় আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত। এক ধরনের বিকৃত ইংরাজী এদের মাতৃভাষা।

চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক, পাদ্রী, কেরানী ও অফিস কর্মচারী ইত্যাদি পেসার অধিকাংশ আসে ক্রেওল সম্প্রদায় থেকে। এদের মধ্যে আবার অনেকে পশ্চিম আফ্রিকার অন্যত্র কর্ম ব্যপদেশে গিয়ে বসতি করেছে। মোট কথা শিক্ষাদীক্ষা এবং ইওরোপীয় জীবনযাত্রা পদ্ধতি গ্রহণের দিক থেকে ক্রেওলরা হল সিয়েরা লিওনের সবচেয়ে অগ্রসর সম্প্রদায়।

অবশ্য ক্রেওলরা দেশের সমগ্র জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। এমন কি পূর্বতন সিয়েরা লিওন ক্রাউন কলোনীতেও তাদের চেয়ে 'স্থানীয়' আফ্রিকানরা সংখ্যায় বেশী। আর সমগ্র দেশ ধরলে তো ক্রেওলরা বোধহয় ২২-৩% এর বেশী হবে না। কিন্তু তাদের উন্নত অবস্থার জন্যে সিয়েরা লিওনের রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্রেওলরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করেছে।

'আশ্রিত' অঞ্চলের অধিবাসীরা অবশ্য পেছিয়ে থাকে নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে সেখানে লোহা ও হীরার খনি আবিষ্কৃত হয়। এর ফলে 'আশ্রিত' অঞ্চলের গুরুত্ব বাড়ে। পরবর্তী যুগে সিয়েরা লিওনের শাসক দল, সিয়েরা লিওন পিপল্‌স পার্টি প্রধানতঃ পূর্বতন 'আশ্রিত' অঞ্চলের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল। ক্রেওলদের রাজনৈতিক আধিপত্য অনেকাংশে খর্ব করা হয়েছে। কিন্তু তারা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়েছে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সিয়েরা লিওন নামক রাজনৈতিক দলের মারফত। ন্যাশনাল কাউন্সিলের মূল দাবি হল পূর্বতন 'কলোনী' অঞ্চল থেকে জনসংখ্যানুপাতে যা হওয়া উচিত তার থেকে বেশী প্রতিনিধিত্ব।

১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে সিয়েরা লিওন স্বাধীনতা লাভ করে। দু'বছর বাদে আর একটি সাধারণ নির্বাচনেও সিয়েরা লিওন পিপল্‌স পার্টি অধিকাংশ আসন জেতে। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত পরবর্তী নির্বাচনে এ দলটি শক্তিশালী বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। কিন্তু নির্বাচন শেষ হতে না হতেই একদল সামরিক অফিসার ক্ষমতা দখল করে।

পাঁচ

পশ্চিম আফ্রিকায় ক্ষুদ্রতম বৃটিশ উপনিবেশ ছিল গ্যাম্বিয়া। এর আয়তন মাত্র ৪,০০৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। গ্যাম্বিয়ার প্রথম ইওরোপীয় পর্যটক হলেন দুজন ইতালীয় যাঁদের পর্তুগীজ রাজা আফ্রিকার উপকূল আবিষ্কারে পাঠান (১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে)। প্রথম প্রথম পর্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা হলেও তা বিশেষ সফলতা লাভ করে নি। পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলের অন্য অনেক ঘাঁটির মত গ্যাম্বিয়া নদীর মোহানাও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে পর্তুগাল, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের মধ্যে বহুবার হাতবদল হয় এবং

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্থানীয় উপজাতীয় প্রধানদের সঙ্গে সন্ধি স্বাক্ষরের পর বৃটিশ সরকার গ্যাম্বিয়া নদীর দু'পাশে নিজ অধিকার বিস্তৃত করে।

১৮২১ সাল পর্যন্ত আফ্রিকান কোম্পানী নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গ্যাম্বিয়ার শাসন চালায়। সে বছর বৃটিশ সরকার গ্যাম্বিয়াকে সিয়েরা লিওনের শাসনাধীনে আনে। তারপর ১৮৪৩ থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত গ্যাম্বিয়া পৃথকভাবে শাসিত হয়। আবার ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ থেকে গ্যাম্বিয়া ও সিয়েরা লিওনের যৌথ শাসন চলে। অবশেষে ১৮৮৮ সালে গ্যাম্বিয়াকে সিয়েরা লিওন থেকে শেষবারের মত বিচ্ছিন্ন করে এক পৃথক উপনিবেশে পরিণত করা হয়।

আইনতঃ অবশ্য অন্য অনেক বৃটিশ শাসিত অঞ্চলের মত গ্যাম্বিয়ারও দুই ভাগ: উপকূলস্থ উপনিবেশ ও অভ্যন্তরের 'আশ্রিত' অঞ্চল। উপনিবেশে যে অল্প কিছু অধিবাসী আছে তাদের সঙ্গে দেশাভ্যন্তরের অধিবাসীদের সাদৃশ্য কম। কারণ উপকূলের অধিবাসীরা উপজাতীয় বন্ধনহীন। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ হল মুক্ত ক্রীতদাসদের কিংবা দাসব্যবসায় চলাকালীন পলাতক দাসদের সন্তান। অতীতে উপকূল থেকে 'আশ্রিত' অঞ্চলে যাতায়াত দুঃসাধ্য ছিল। রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রেও 'আশ্রিত' অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে, উপনিবেশ ও 'আশ্রিত' অঞ্চলের পারস্পরিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয় নি।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম গ্যাম্বিয়ার আইন পরিষদে 'আশ্রিত' অঞ্চলের প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। একই সময় আইন পরিষদে বেসরকারী প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য প্রবর্তিত হল (যদিও অধিকাংশ বেসরকারী প্রতিনিধি তখন পর্যন্ত নির্বাচিত হতেন না)। এরপর ১৯৫১ ও ১৯৫৪ সালে গ্যাম্বিয়ার সংবিধান আবার পরিবর্তিত হয়। কিন্তু দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছুটা অগ্রসর হলেও আয়তনের ক্ষুদ্রতা ও অধিবাসীদের সংখ্যাল্পতার জন্য গ্যাম্বিয়ার পৃথক দেশ হিসাবে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি বিলম্বিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্যাম্বিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলির রাজনৈতিক ঐতিহ্য ভিন্ন। সেনেগাল ও গিনি ছিল ফরাসী অধিকারে। এদের সঙ্গে গ্যাম্বিয়ার পার্থক্য সুস্পষ্ট। তবু ১৯৬৩ সালের অক্টোবরে গ্যাম্বিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায়। এবং পরের বছর গ্যাম্বিয়ার নেতারা সেনেগালের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সহযোগিতার সমঝোতায় আসেন। ১৯৬৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী গ্যাম্বিয়া স্বাধীন হয়। অবশ্য অর্থনৈতিকভাবে এ দেশটি এখনও বৃটিশ দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল।

ছয়

একটি প্রবন্ধে ঘানা, নাইজেরিয়া সিয়েরা লিওন ও গ্যাম্বিয়ার কথা আলোচনা করার সার্থকতা কী? আয়তন ও লোকসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম নাইজেরিয়া, তারপর যথাক্রমে ঘানা, সিয়েরা লিওন ও গ্যাম্বিয়া। ভাষা ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এদের অধিবাসীদের মধ্যে সাদৃশ্য বেশী নেই।

এত পার্থক্য সত্ত্বেও এদের কথা আমরা একসঙ্গে আলোচনা করেছি, তার কারণ উল্লিখিত সব দেশগুলি বৃটিশ শাসনাধীন ছিল। তাই, মোটের ওপর এক ধরনের নীতি এই সব দেশে প্রযুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া এদের স্বাধীনতা ও স্বাধীনোত্তর উপজাতি ও আন্তঃউপজাতি সংহতির পথে কিছুটা প্রতিবন্ধক এসেছে আন্তঃসাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব থেকে। সেদিক থেকেও এদের মধ্যে সাদৃশ্য কিছুটা আছে।

কিন্তু স্পষ্টতঃ এদের ভবিষ্যৎ ভিন্নমুখী। সর্বপ্রথমে স্বাধীনতা লাভ এবং যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য পশ্চিম আফ্রিকায় ঘানার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। বৃহদায়তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে নাইজেরিয়ার গুরুত্ব স্বীকৃত। অন্য আফ্রিকান দেশগুলিকে নেতৃত্ব দেবার যে শক্তি আছে এই দুই রাষ্ট্রের সিয়েরা লিওন ও গ্যাম্বিয়ায় সেই শক্তি আশা করা অনুচিত। সিয়েরা লিওনের লোকসংখ্যা কলকাতার চেয়ে কম, তার আয়তন আনুমানিক ৩০,০০০ বর্গমাইল। অতএব, সিয়েরা লিওনের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখাই একটি সমস্যা। আর গ্যাম্বিয়া আয়তন ও লোকসংখ্যায় এত অকিঞ্চিৎকর যে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্তি ছাড়া তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখাই মুশকিল।

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ কঙ্গো

এক

বেলজিয়ামের একমাত্র উপনিবেশ ছিল কঙ্গো: কঙ্গোনদীর অববাহিকায় ঘন বিষুবরৈখিক অরণ্যে অবস্থিত বিশাল দেশ, কিন্তু ১৯৬১ সালের হিসাবমত লোকসংখ্যা মাত্র এক কোটি ৪০ লক্ষ। স্বাধীনতাকালে এর মধ্যে এক লক্ষ ১০ হাজার ছিল ইওরোপীয়।

১৮৭৬ সালে মধ্য আফ্রিকায় অনুপ্রবেশ ও ইওরোপীয় সভ্যতা প্রচারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে বেলজিয়ামের রাজা ব্রাসেলসে এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলন থেকে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়। তার সভাপতি ছিলেন বেলজিয়ান-রাজ লেওপোল্ড স্বয়ং এবং তার নাম ছিল আন্তর্জাতিক আফ্রিকা সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের নেতৃত্বে ও লেওপোল্ডের আনুকূল্যে মধ্য আফ্রিকায় কয়েকটি অভিযাত্রীদল প্রেরিত হয়। এবং সঙ্ঘের তরফ থেকে বিখ্যাত পর্যটক স্টানলে কঙ্গো অববাহিকার স্থানীয় উপজাতি-প্রধানদের সঙ্গে চার শ'রও বেশি চুক্তি সম্পাদন করেন। ইতিমধ্যে ১৮৮২ সালে সঙ্ঘের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে আন্তর্জাতিক কঙ্গো সঙ্ঘ এবং সঙ্গে সঙ্গে পতাকা ও স্বাধীনরাজ্যের অন্যান্য প্রতীক যথারীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বের্লিন কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে ও সম্মেলনকালে বহু রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক কঙ্গো সঙ্ঘকে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। সম্মেলন থেকে অবশ্য কঙ্গো অববাহিকায় প্রয়োগের জন্য কয়েকটি সাধারণ নীতি ও আদর্শ ঘোষিত হয়। এদের মধ্যে নীচেরগুলি ছিল প্রধান: (১) অবাধ বাণিজ্য ও অবাধ নৌবাহনের অধিকার প্রবর্তন, (২) স্থানীয় অধিবাসী ও বিদেশীদের জন্য ধর্মের স্বাধীনতা রক্ষা; (৩) কঙ্গো রাজ্যের নিরপেক্ষতা স্বীকৃতি; এবং (৪) স্থানীয় অধিবাসীদের নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ সংরক্ষণ।

বের্লিন সম্মেলন থেকে আন্তর্জাতিক কঙ্গো সঙ্ঘ 'স্বাধীন কঙ্গো রাজ্য' বলে স্বীকৃত হয়। নামে আন্তর্জাতিক হলেও কার্যতঃ এখানে লেওপোল্ডের প্রতি-

পত্তি ছিল সন্দেহাতীত। এর ওপর বিদেশীদের এই সংগঠনে যেসব শেয়ার ছিল লেওপোল্ড সেগুলি ক্রমশঃ কিনে নিতে লাগলেন। ফলে আন্তর্জাতিক কঙ্গো সঙ্ঘ তথা স্বাধীন কঙ্গো রাজ্য লেওপোল্ডের ব্যক্তিগত সংগঠনে পরিণত হয়। এমন কি বেলজিয়ান আইনসভা পর্যন্ত মত প্রকাশ করে যে কঙ্গো রাজ্য শাসন লেওপোল্ডের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

সে যাই হোক ৯০০,০০০ বর্গমাইলের এই জমিদারীতে (অর্থাৎ ভারতবর্ষ থেকে রাজস্থান বাদ দিলে যা হয় তত বড়) বের্লিন সম্মেলন ঘোষিত আদর্শ শপথ করে লেওপোল্ড তাঁর শাসনব্যবস্থা স্থাপন করলেন। বহুবিঘোষিত লক্ষ্য: কঙ্গোয় সভ্যতা বিস্তার; আসলে কিছুদিন বাদে যা পরিষ্কার হয়, কঙ্গোর প্রাকৃতিক সম্পদ নির্মমভাবে লুণ্ঠন।

নতুন সরকারের অন্যতম প্রথম কাজ হল, কঙ্গোর সমস্ত 'অনধিকৃত' জমি সরকারী সম্পত্তি বলে ঘোষণা। সঙ্গে সঙ্গে এই সব 'অনধিকৃত' এলাকার রবার ও হস্তিদন্তে সরকারের একচেটিয়া অধিকার দাবি করা হয় এবং আফ্রিকান অধিবাসীদের রাজকর্মচারী ও দালাল ছাড়া অন্য কারোকে তাদের উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করতে নিষেধ করা হয়। এছাড়া আফ্রিকানদের পণ্য উৎপাদন করতে বাধ্য করার জন্য বসানো হল মুদ্রাকর। গ্রাম পিছু দেয় করের পরিমাণ নির্ধারিত হয় রবার ও হস্তিদন্তের ওজনে। সর্বোপরি এইসব অনুজ্ঞা কার্যে পরিণত করার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের বলপ্রয়োগে সরকারী রক্ষীবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু বিশালায়তন 'অনধিকৃত' জমি বা সরকারী সম্পত্তি শুধু সরকারী সামর্থ্যে উন্নত করার সাধ্য লেওপোল্ডের ছিল না। তাই বিরাট বিরাট এলাকা ছেড়ে দেওয়া হয় বেসরকারী কোম্পানীর হাতে কনসেশন হিসাবে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: সোসিয়েতে আঁভাসেঁায়াস দ্যু কমের্স ও 'কঁগো আবির' কোম্পানী, 'ইসাঙ্গি' কোম্পানী, কঁতোয়ার কমেয়ার্সিয়াল কঁগোলে, সোসিয়েতে আনঁনিম বেল্‌জ পুর ল্য কমেয়ার্স দ্যু ও-কঁগো এবং কমিতে স্পেসিয়াল দ্যু কাতাঁগা। এই সব কোম্পানীকে রবার ও হস্তিদন্তের হিসেবে কর আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে নিজস্ব সেনাদল গঠনের ক্ষমতাও কোম্পানীরা পেল।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লেওপোল্ড অসঙ্কোচে 'দোমেন দ্য লা কুরোন' (রাজার এলাকা) নামে শ্রেষ্ঠরবার অরণ্যসমৃদ্ধ ১,১২,০০০ বর্গমাইল ব্যাপী বিরাট এক

এলাকায় বলতে গেলে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সঙ্গে উল্লিখিত এলাকার সম্পদ আহরণের জন্য 'ফঁদাসির্ঁ' নামে এক ব্যবসায় সংগঠনও তিনি স্থাপন করেন। 'দোমেন দ্য লা কুরোন'-এর আয়তন গোড়ায় ছিল বেলজিয়ামের দশগুণ। পরে এর আয়তন আরও সম্প্রসারিত হয়। এই বিরাট অঞ্চল থেকে যে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হত সে কথা বলা বাহুল্য। মুনাফার বাঁটোয়ারা কেমনভাবে হত তার এক হিসাব শ্রী ব্যুয়েল দিয়েছেন :

(১) রানীকে বার্ষিক ১,৫০,০০০ ফ্রাঙ্ক দেয়।

(২) যুবরাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে প্রতি বছর ১,২০,০০০ ফ্রাঙ্ক।

(৩) অন্য রাজপুত্রদের প্রত্যেককে বার্ষিক ৭৫,০০০ ফ্রাঙ্ক।

(৪) বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত রাজকন্যাদের প্রত্যেককে ৭৫,০০০ ফ্রাঙ্ক।

(৫) বেলজিয়ামের হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য বার্ষিক ৬,০০,০০০ ফ্রাঙ্ক।

(৬) 'আর্দেন'-এর রাস্তাঘাট ও অট্টালিকা নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য বার্ষিক ১,৫০,০০০ ফ্রাঙ্ক দেয়।

১৮৯৬ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে দোমেন দ্য লা কুরোনের সামগ্রিক লাভ হয় ৭ কোটি দশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক। 'দোমেন দ্য লা কুরোন' ছাড়া কনসেশন ভোগী কোম্পানীগুলোর লভ্যাংশ লেওপোল্ডের পকেটে আসত। ঐতিহাসিক মূন হিসাব দিয়েছেন একটি কোম্পানী আদায়ী মূলধন ৪৫ হাজার ডলারের ওপর। ছ' বছরে ৩০ লক্ষ ডলারের ও বেশী নীট মুনাফা করে। লাভের এক অংশ দিয়ে হিসেবী লেওপোল্ড এক প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল—কঙ্গো স্বাধীন রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রচার বন্ধের জন্য বেলজিয়াম পত্র-পত্রিকাকে 'অর্থ সাহায্য' করা। কাতিয়ে নামে জনৈক বেলজিয়ান যথার্থ লিখেছেন, "জাতির বিবেককে ঘুম পাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এল দোমেন থেকে।"

এ ছাড়া সমর্থন আসে ক্যাথলিক মিশনারীদের কাছ থেকে। যেহেতু ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রটেস্ট্যান্ট প্রধান দেশগুলি লেওপোল্ড বিরোধী সমালোচনার কেন্দ্রস্থল ছিল, সেহেতু শুধু বেলজিয়ামের নয় পরন্তু পূর্বোক্ত দেশগুলির ক্যাথলিকরাই ধরে নিল যে কঙ্গোর প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারীদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের খাতিরে ওই প্রচার শুরু হয়েছে।

বের্লিন সম্মেলনে ঘোষিত বড় বড় আদর্শের বুলিতে কঙ্গোর আফ্রিকানদের যে কিছু মাত্র উপকার হয় নি তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বরং এক দিক থেকে বলা যায় যে কঙ্গো অববাহিকায় লেওপোল্ডের বেসরকারী ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্থাপন করতে দিয়ে আফ্রিকানদের অমানুষিক শোষণের পথ খুলে দেওয়া হয়। 'অনধিকৃত' জমি দখল করার নামে কঙ্গোলীয়দের কৃষির প্রয়োজনীয় ভূমি অনেক সময় কেড়ে নেওয়া হয়। রবার ও হস্তিদন্ত সরবরাহের কর বসানো হয় আফ্রিকানদের ওপর। তাছাড়া ১৯০৩ সালে 'কঙ্গো স্বাধীন রাজ্য' এই মর্মে আইন পাস করে যে প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক কঙ্গোবাসী সরকারের জন্য মাসে ৪০ ঘণ্টা করে পরিশ্রম করতে বাধ্য থাকবে। যদিও এ জন্য প্রচলিত হারে পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা হয়, তবু ১৯০৪ সালে লেওপোল্ড নিয়োজিত তদন্ত কমিটি মন্তব্য করে যে বহু ক্ষেত্রে আফ্রিকানদের যথোপযুক্ত বেতনে বঞ্চিত করা হয়। এবং কখনও কখনও এমন সব জিনিস তাদের বেতন হিসাবে দেওয়া হয়, কঙ্গোয় যার কোন মূল্য নেই। তার ওপর ইওরোপীয় দালালেরা আদায়ীকৃত রবারের পরিমাণ হিসাবে কমিশন পেত বলে প্রায়শঃই তারা জোর করে যতবেশী সম্ভব রবার আদায় করত।

ধীরে ধীরে স্বাধীন কঙ্গো রাজ্যের কুশাসন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যখন কঙ্গো সরকার নিজের হাতে রবার ও হস্তিদন্তের একচেটিয়া কারবার তুলে নেয়, তখন খোদ বেলজিয়ামের ব্যবসায়ীরা প্রতিবাদ জানায়। অবাধ বাণিজ্য অধিকার সকলকে না দেওয়ায় বৃটিশ স্বার্থেও হাত পড়ে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে 'আদিবাসী রক্ষা সমিতি' নামে এক বেসরকারী বৃটিশ প্রতিষ্ঠান কঙ্গোর অবস্থার প্রতি বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০৩ সালে বৃটিশ সরকার এক আন্তর্জাতিক তদন্তের প্রস্তাব তোলে। কিছু পরে বৃটিশ প্রস্তাবের সমর্থন আসে আমেরিকা থেকে।

এই সব সমালোচনায় বিচলিত লেওপোল্ড ১৯০৪ সালে এক তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। যদিও এই রিপোর্টের সবটুকু প্রকাশিত হয় নি, তবু এর আংশিক প্রকাশ থেকেই বোঝা যায় যে, স্বাধীন কঙ্গো রাজ্যের শাসনকে কমিটির সদস্যেরা ঠিক 'আদর্শ' ব্যবস্থা বলতে পারেন নি। যাই হোক, এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী স্বাধীন কঙ্গো রাজ্যে কিছু কিছু সংস্কার সাধিত হয়, যথা, শ্রম-করের (যার মারফত প্রতি আফ্রিকান সরকারের জন্য নির্দিষ্ট কাল পরিশ্রম করতে বাধ্য থাকত) বিলোপ সাধন হয়; বেসরকারী বাণিজ্য

প্রতিষ্ঠানের দালালদের মারফত রবার কর আদায় বন্ধ হল। এ ছাড়া আফ্রিকানদের যোগদানে বাধ্য করে যে রক্ষী বাহিনী গঠিত হয়েছিল তারও অবসান ঘটে।

দুই

১৯০৮ সালে বেলজিয়াম আইন সভা এক 'শার্ৎ কলোনিয়াল' বা 'ঔপনিবেশিক সনদ' পাস করে কঙ্গোর ভাবী শাসনব্যবস্থার কাঠামো নির্ধারণ করল। কঙ্গোর শাসনভার লেওপোল্ড ও স্বাধীন কঙ্গো রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেলজিয়ান সরকারের হাতে দেওয়া হল। 'দোমেন দ্য লা কুরোন'এর জন্ম লেওপোল্ড ৫ কোটি ফ্রাঙ্ক ক্ষতিপূরণ আদায় করেন, এ ছাড়াও তিনি পেলেন ৪½ কোটি ফ্রাঙ্ক বেলজিয়ামে তাঁর পরিকল্পিত নগর সজ্জার জন্য এবং তারও ওপর রাজপরিবারের বার্ষিক লভ্যাংশের গ্যারান্টি। যেসব বেসরকারী কোম্পানী কঙ্গোতে কনসেশন ভোগ করছিল, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল, তাদের অধিকার ও সুবিধায় হস্তক্ষেপ করা হবে না। এমনি করে 'স্বাধীন কঙ্গো রাজ্য' 'বেলজিয়ান কঙ্গো'য় পরিণত হল।

১৯০৮ সাল থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত বেলজিয়ান কঙ্গো শাসিত হয়েছে কমবেশি পূর্বোক্ত 'শার্ৎ কলোনিয়াল' অনুসারে এই সনদ অনুযায়ী কঙ্গোর শাসনের দায়িত্ব থাকে বেলজিয়ান সরকারের হাতে। আইনের ক্ষেত্রে যদিও বেলজিয়ান আইনসভা ছিল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, তবু কঙ্গোয় প্রযোজ্য অধিকাংশ আইন প্রণীত হত রাজকীয় ডিক্রী মারফত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনকানুন ও বার্ষিক বাজেট অবশ্য বেলজিয়ান আইনসভার সম্মতি-সাপেক্ষ ছিল।

কঙ্গো শাসনের প্রত্যক্ষ ভার থাকত ঔপনিবেশিক মন্ত্রীর হাতে। তিনি বেলজিয়ামের ক্যাবিনেট সদস্য এবং আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল। মন্ত্রীকে সাহায্য দিত 'কঁসেই কলোনিয়াল' বা ঔপনিবেশিক পরিষদ, যার অর্ধেক সদস্য রাজা কর্তৃক মনোনীত হত এবং যার মধ্যে কঙ্গোর কোন প্রতিনিধি ছিল না। কঙ্গোলীয়দের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য ছিল ১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ও ১৯২৫ সালে পুনর্গঠিত 'স্থানীয় অধিবাসীদের সংরক্ষণ কমিশন' যার প্রায় সব সদস্য কঙ্গোলীয়দের মধ্য থেকে বেলজিয়াম রাজ কর্তৃক নিযুক্ত হত।

কথা ছিল, এর অধিবেশন প্রতি বছর বসবে এবং এর সদস্যরা আফ্রিকানদের স্বার্থ বিরোধী আইন বা কার্যক্রম কিংবা আফ্রিকানদের প্রতি দুর্ব্যবহারের কথা কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করবে। প্রকৃতপক্ষে ১৯১১ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এই ৪৩ বছরে মাত্র ৯ বার এই কমিশনের অধিবেশন বসেছে।

খোদ কঙ্গোয় রাজার নামে গভর্নর জেনারেল শাসন করতেন। এ ছাড়া কঙ্গোর ছ'টি প্রদেশের জন্য ছিলেন ছ'জন গভর্নর। পরবর্তীকালে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করায়, এখানে কঙ্গোর প্রদেশগুলি ও তাদের রাজধানীর নাম দেওয়া হল :

	প্রদেশ	লোকসংখ্যা (১৯৫৯)	রাজধানী
I	লেওপোল্ডভিল	৩২ লক্ষ	লেওপোল্ডভিল
II	কিভু	২৩ লক্ষ	বুকাভু (পূর্বেকার নাম ছিল কস্টারমানসভিল)
III	কাসাই	২১ লক্ষ	লুলুয়াবুর্গ
IV	একোয়াত্যর (বিষুব-রৈখিক প্রদেশ)	১৮ লক্ষ	কোকিলাৎভিল
V	কাতাঁগা	১৭ লক্ষ	এলিসাবেথভিল
VI	ওরিয়ঁতাল (পূর্ব প্রদেশ)	২৫ লক্ষ	স্ট্যানলেভিল

গভর্নর জেনারেলের কাজে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করার জন্য 'কঁসেই দ্য গুভর্নর্ম' (সরকারী পরিষদ) ও গভর্নরদের কাজে সাহায্য করার জন্য প্রতি প্রদেশে 'কঁসেই দ্য প্রভ্যাঁস' (প্রাদেশিক পরিষদ) স্থাপিত হয়।

খৃষ্টধর্মপ্রচার, শিক্ষাবিস্তার, নয়া অর্থনীতির ভিত্তিস্থাপন ইত্যাদির ফলে কঙ্গোর অধিবাসীদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে যারা কমবেশী শিক্ষিত ও উপজাতীয় বন্ধন যাদের শিথিল। এমন শ্রেণীকে বেলজিয়ানরা 'এভোলুয়ে' আখ্যা দিয়েছে। এভোলুয়েদের মধ্যে পড়ে দক্ষ কারিগর, শিক্ষক, কেরানী, ছোট বড় ব্যবসায়ী ইত্যাদি। রাজনৈতিক সচেতন ও ক্রমবর্ধমান সংখ্যার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে এদের স্বশাসনক্ষমতারহিত করে রাখা দুঃসাধ্য ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নগরায়নের দ্রুত পদক্ষেপে এভোলুয়েদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে যুদ্ধোত্তর যুগে অনেকে বুঝলেন, কঙ্গো-সমাজে 'এভোলুয়ে'দের বিশেষ অবস্থার সংবিধানিক স্বীকৃতি বাঞ্ছনীয়।

১৯৪৮ সালে এই উদ্দেশ্যে 'কার্ত দ্যু মেরিৎ সিভিক'-এর প্রবর্তন করা হয়।

স্থির হল যে, কতকগুলি শর্ত পূরণ করলে আফ্রিকানদের এই কার্ত অর্থাৎ কার্ড দেওয়া হবে। প্রয়োজনীয় শর্তগুলির মধ্যে এইগুলি ছিল উল্লেখযোগ্য : (i) এক বিবাহ, (ii) সাক্ষরতা, (iii) কতকগুলি নির্দিষ্ট অপরাধে দণ্ডিত না হওয়া, (iv) 'বয়স ২১ (কোন কোন ক্ষেত্রে ১৬ হলেই চলবে), (v) 'সভ্যতার উচ্চস্তরে ওঠার একাগ্র উৎসাহের নমুনা স্বরূপ' সচ্চরিত্র ও সদভ্যাসের প্রমাণ।

'কার্ত দ্যু মেরিৎ সিভিক' লাভের পর আফ্রিকানরা স্বেচ্ছায় 'ত্রিব্যুনো দ্য তেরিতোয়ার' নামে উপজাতি নিরপেক্ষ আদালতের এক্তিয়ারে পড়তে পারত, তার ফলে, তারা বেত্রদণ্ড থেকে রেহাই পেত এবং স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়েরও সুবিধা ভোগ করত।

১৯৫২ সালের শেষে মাত্র ৫ শ'য়েব-ও কম আফ্রিকান পূর্বোক্ত কার্ড পায়। প্রতি বছর কার্ডধারীদের সংখ্যা ১২৫ থেকে ১৫০ করে বৃদ্ধি পাচ্ছিল বলে প্রকাশ।

১৯৫২ সালে অনুরূপ এক আইনে এভোলুয়েদের জন্য 'ইম্মাত্রিক্যুলাসিওঁ' বা নাম রেজিস্ট্রী করার ব্যবস্থা করা হল। 'ইম্মাত্রিক্যুলাসিওঁ' সম্ভব ছিল কয়েকটি বিশেষ শর্ত পূরণ করাব পর এবং 'ইম্মাত্রিক্যুলাসিওঁ' হলে আফ্রিকানরা অনেকাংশে বেলজিয়ানদের সমান নাগরিক অধিকার পেত।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে পর্তুগীজ উপনিবেশের 'আসিমিলাদো' ব্যবস্থার মত 'কার্ত দ্যু মেরিৎ সিভিক' ও 'ইম্মাত্রিক্যুলাসিওঁ' ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য ছিল, আফ্রিকানদের মধ্যে সচেতন অংশকে কিছুটা সুযোগসুবিধা দিয়ে বৃহত্তর আফ্রিকান সমাজ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা, যার ফলে বিক্ষুব্ধ আফ্রিকান জনসাধারণ এদের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। সাধারণ উদ্দেশ্য এক হলেও, পর্তুগীজ ও বেলজিয়ান ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে, প্রথমোক্ত ব্যবস্থার মত বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষ 'এভোলুয়ে'দের বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক অধিকার দেয় নি। পর্তুগীজ উপনিবেশে 'আসিমিলাদো'রা পর্তুগালের রাষ্ট্রপতি ও আইনপরিষদের নির্বাচনে ভোট দিতে পারে। কঙ্গোর 'এভোলুয়ে'দের কোন ভোটাধিকার ছিল না। 'এভোলুয়ে'রা দূরে থাক, কঙ্গো প্রবাসী শ্বেতকায় বেলজিয়ানরাও এমন অধিকার পায় নি। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত কঙ্গোয় কোন নির্বাচিত পরিষদের অস্তিত্ব ছিল না এবং ছোটবড় সাম্প্রদায়িক স্বার্থসংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার জন্ম হলেও সত্যিকারের কোন রাজনৈতিক দলের সূত্রপাত হয় নি।

অর্ধ শতাব্দী ধরে বেলজিয়ান সরকারের ঔপনিবেশিক শাসনে কঙ্গোর বাহ্য উন্নতি নেহাত কম হয় নি। 'কঙ্গো স্বাধীন রাজ্যে'র আমল থেকে বেসরকারী কোম্পানীদের (যদিও সে সব কোম্পানীতে বেলজিয়ান কঙ্গো সরকারের বেশ কিছু মালিকানা থাকত) কনসেশন দেওয়ার রীতি চলে আসছে। এ রীতির ফলে কঙ্গোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৃহদায়তন উদ্যোগের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ১৯৫২ সালে সারা দেশে যত লোক নিযুক্ত ছিল (স্বাধীন পেশা ও ব্যবসায় বাদ দিলে) তার মধ্যে ৫১% ভাগ কাজ করতো ৩% এর কিছু বেশী বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলিতে। এবং হিসাব করে দেখা গেছে, এইসব কোম্পানী কঙ্গোর সমগ্রলগ্নীকৃত মূলধনের ৮৬% ভাগের মালিক। ঔপনিবেশিক সরকার এইসব কোম্পানীর অনেকগুলিতে অর্থ নিয়োগ করেছে। বলা হয় যে, শুধুমাত্র খনিশিল্পেই (বেসরকারী) ১৯৫৩ সালে কঙ্গো সরকারের শেয়ার ছিল প্রায় ১৫০ কোটি টাকার মত।

পর্যটক ও সাংবাদিকেরা বলেন ঔপনিবেশিক যুগে অন্য আফ্রিকান দেশের তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে কঙ্গোর অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত ছিল। এখানে পারিশ্রমিকের হার বেশি দেওয়া হত এবং শিক্ষার বিস্তারও অপেক্ষাকৃত ভাবে বেশি হয়েছে। এছাড়া জনসাধারণের জন্য কিছু কিছু হাসপাতাল সমাজসেবাকেন্দ্র প্রভৃতিও স্থাপন করা হয়। কিন্তু বেলজিয়ান ঔপনিবেশিক সরকারের একথা বোঝা উচিত ছিল, কঙ্গোলীয়দের রাজনৈতিক অধিকার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত রেখে শুধুমাত্র বৈষয়িক উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়ার নীতি বেশিদিন চলতে পারে না।

তিন

প্রকৃত রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার আগে কঙ্গোয় নানাধরনের প্রতিষ্ঠান চালু ছিল। পরবর্তীকালে কঙ্গোর রাষ্ট্রপতি জোসেফ কাসাভুবু এই ধরনের এক প্রতিষ্ঠানের (এক স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র সমিতি) সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫০ সালে কিকঙ্গো ভাষা সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য এক সংগঠন স্থাপিত হয় (পরে যার নাম হয় আবাকো) এবং কাসাভুবু এর সভাপতি নির্বাচিত হলেন পাঁচ বছর বাদে। ইতিমধ্যে বেলজিয়ান অধ্যাপক ফ্যান বিলসেন ১৯৫৪ সালে প্রকাশ করেছেন "বেলজিয়ান আফ্রিকার রাজনৈতিক

মুক্তির জন্য ত্রিশ বছরের পরিকল্পনা''। একে কেন্দ্র করে কঙ্গোর 'এভোলুয়েদে'র মধ্যে অনেক রাজনৈতিক আলোচনা চলে। এবং কাসাভুবু স্বয়ং কঙ্গোর দ্রুত স্বাধীনতার দাবি তোলেন।

এইসব দাবিদাওয়ার মোকাবিলা করার জন্য বেলজিয়ান সরকার বড় বড় শহরের পৌরসভার জন্য গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে। পরের বছর আগস্টে জেনারেল দ্য গল ব্রাজাভিলে এসে ফরাসী কঙ্গোর অধিবাসীদের তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার দিলেন। ব্রাজাভিল ও লেওপোল্ডভিল কঙ্গো নদীর দু'পারে দুই শহর। ফরাসী কঙ্গোর এই অগ্রগতির ছায়া পড়ে বেলজিয়ান কঙ্গোর ওপর। দ্য গলের ঘোষণার দু'দিন পরে প্যাট্রিস লুমুম্বার নেতৃত্বে কয়েকজন প্রভাবশালী এভোলুয়ে, কঙ্গোর স্বাধীনতার দাবি তোলেন। প্যাট্রিস লুমুম্বা ইতিপূর্বে স্টানলেভিলে আফ্রিকান সরকারী কর্মচারী সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং সুবক্তা ও সুলেখক হিসাবে তাঁর নাম ছিল সুপরিচিত। কয়েক মাসের মধ্যে এঁরা মুভমঁ নাসিওনাল কগোঁলে (এম. এন. সি.) বা কঙ্গো জাতীয় আন্দোলন নামে এক রাজনৈতিক দল সংগঠন করেন। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে এল আক্রায় অনুষ্ঠিত সারা আফ্রিকান জনসম্মেলন। লুমুম্বা তাঁর দু'জন সহকারীর সঙ্গে এতে যোগ দেন। সম্মেলন থেকে ফিরে এঁরা লেওপোল্ডভিলের এক জনসভায় অবিলম্বে স্বাধীনতার দাবি তোলেন। শহরে জন অসন্তোষ ইতিমধ্যেই দানা বেঁধে উঠছিল। এবারে তা প্রকাশ্য বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কাসাভুবু ও আরও কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আবাকো বেআইনী ঘোষিত হয়। কিন্তু প্রায় এরই সঙ্গে সরকার আরও কিছু গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের পরে ঘোষণা করে নতুন নির্বাচনের কথা।

১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে ব্রাসেলস শহরে কঙ্গোর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য এক গোল টেবিল বৈঠক আহূত হল। এই বৈঠকে কাসাভুবু পরিচালিত আবাকো-কার্তেল (আবাকো, পার্তি সালিদেয়্যার আফ্রিক্যাঁ, কালোনজি পরিচালিত এম. এন. সি'.র এক অংশ ও অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত ফ্রন্ট) কঙ্গোয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানায়, পক্ষান্তরে লুমুম্বার পরিচালিত এম. এন. সি.র সমর্থন আছে কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থার পক্ষে। বৈঠকে বেলজিয়ান সরকার দাঁড়ায় কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার দাবির পিছনে।

সে বছরের মে মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে লুমুম্বার এম. এন. সি. ১৩৭টি আসনের মধ্যে ৩৩টি দখল করে, যেখানে আবাকো প্রায় ১২টি। অবশ্য লেওপোল্ডভিল প্রাদেশিক পরিষদের ৯০টি আসনের ৩৩টিতে আবাকো প্রার্থীরা জেতে এবং এইভাবে বাকঙ্গো অধ্যুষিত এলাকায় আবাকোর জন-প্রিয়তার আর একবার প্রমাণিত হল। নির্বাচন শেষে লুমুম্বা অন্য কয়েকটি দলের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী হন, কাসাভুবু নির্বাচিত হন রাষ্ট্রপতি। জুনের শেষে যখন কঙ্গো স্বাধীনতা পেল তখন সেখানকার ছিল এই অবস্থা।

চার

কিন্তু স্বাধীনতা পাবার ঠিক পাঁচ দিন বাদে কঙ্গোর সেনাদল, ফোর্স প্যুব্‌লিক, বিদ্রোহ করল। ফোর্স প্যুব্‌লিকে মোট সৈন্য ছিল ২২,০০০। কিন্তু এর সমস্ত কর্তৃত্ব থাকে বেলজিয়ান অফিসারদের হাতে। বস্তুতঃ ফোর্স প্যুব্‌লিকে একজনও কঙ্গোলীয় অফিসার ছিল না। এ সম্বন্ধে সাধারণ সৈন্যদের অসন্তোষ এবং পারিশ্রমিক সম্পর্কে বিক্ষোভই এই বিদ্রোহ ঘটায়। কাসাভুবু ও লুমুম্বা বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে সক্ষম হন। তবু ইতিমধ্যে ইওরোপীয় বাসিন্দাদের ওপর কিছু কিছু আক্রমণ হওয়ায় বহু বেলজিয়ান কঙ্গো ছেড়ে যায়। ৮ই জুলাই বেলজিয়ান সরকার কঙ্গোয় বেলজিয়ানদের 'ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য' সেনাপ্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়। এবং ১০ জুলাই থেকে কঙ্গোর একাধিক অঞ্চলে বেলজিয়ান সৈন্যরা কঙ্গোলীয় সেনাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে নামে।

১১ই জুলাই কাতাঁগার প্রধানমন্ত্রী শ্রীচোম্বে কাতাঁগার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এবং সেই দিনই কঙ্গো সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। নিরাপত্তা পরিষদ তিনদিন বাদে কঙ্গোয় সৈন্যপ্রেরণের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং বেলজিয়ামকে কঙ্গো থেকে সেনাপসারণের অনুরোধ জানায়। উত্তরে বেলজিয়াম জানায় যে যতদিন না সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্য সমগ্র দেশের ইওরোপীয়দের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারবে, ততদিন বেলজিয়ান সেনা কঙ্গোয় অবস্থান করবে। ২১ শে জুলাই নিরাপত্তা পরিষদ দ্বিতীয় এক প্রস্তাবে বেলজিয়ামের কাছে পূর্বোক্ত অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করে এবং ১লা

জুলাইয়ে প্রতিষ্ঠিত কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রকে আহ্বান জানায়।

ইতিমধ্যে কঙ্গো সরকার বেলজিয়ামের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং প্রস্তাবিত কঙ্গো বেলজিয়াম চুক্তি (২৯শে জুন সম্পাদিত হলেও তখনও পর্যন্ত দুই দেশের পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয় নি), যার ওপর ভিত্তি করে বেলজিয়ান তার কঙ্গোস্থ সামরিক ঘাঁটি দাবি করছিল, প্রত্যাহার করে। এতদিন পর্যন্ত ধীরে ধীরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সেনাদল তাদের শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। কাতাঁগা বাদে কঙ্গোর অন্য প্রদেশসমূহে মোট আন্তর্জাতিক সৈন্যসংখ্যা ১০,০০০ এরও বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবতঃ লেওপোল্ডভিল সরকার আশা করেছিল যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সহায়তায় কেন্দ্রীয় শক্তি কাতাঁগায় যেতে পারবে। কিন্তু কাতাঁগার প্রধানমন্ত্রী চোম্বে ঘোষণা করেন যে কাতাঁগাস্থিত বেলজিয়ান সৈন্যরা তাঁর সরকারের অনুরোধক্রমে এসেছে ও তাদের অবস্থান কাতাঁগার নিরাপত্তার পক্ষে প্রয়োজনীয়। চোম্বে আরও বলেন যে কাতাঁগায় যদি আন্তর্জাতিক সৈন্য প্রবেশ করতে যায়, তবে তিনি বাধা দেবেন।

আগস্ট মাসের গোড়ায় নিরাপত্তা পরিষদ আবার এক প্রস্তাবে বেলজিয়ামকে সেনাদল অপসারণ করেতে অনুরোধ জানিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে অন্য সব প্রদেশের মত কাতাঁগায় ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেনাদল প্রেরিত হবে। শেষপর্যন্ত জাতিপুঞ্জ সেনাদল কাতাঁগার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না অথবা কাতাঁগা সরকারকে জোর করে লেওপোল্ডভিল সরকারের মধ্যে আনবে না : এই ঘোষণা করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সেনাদল কাতাঁগায় প্রেরিত হয়। চোম্বে স্বয়ং এলিজাবেথভিল বিমান ঘাঁটিতে গিয়ে হামারশোল্ড ও ৩০০ সুইডিশ সৈন্যকে অভ্যর্থনা জানান।

হামারশোল্ড-চোম্বের এই বোঝাপড়া লুমুম্বা স্বভাবতঃ সুনজরে দেখলেন না। লুমুম্বার আশা ছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্যরা শুধুমাত্র বেলজিয়ান সৈন্যদের অপসারণই করবে না, কেন্দ্রীয় সরকারের সেনাদলকে কাতাঁগায় যেতে সাহায্যও করবে।

কঙ্গোর দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময় থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমশঃ দুর্বল হতে আরম্ভ করে। ৭ই আগস্ট আবাকো কেন্দ্রীয় কমিটি লুমুম্বা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করে ও কঙ্গোর জন্য কনফেডারেশনের দাবি জানায়। পরের

দিন বলিকাঙ্গোর 'পুনা' দল (পার্তি ছ ল্যুনিতে নাসিওনাল আফ্রিক্যেন) আবাকোর প্রস্তাব সমর্থনের পর 'একোয়াত্যর' প্রদেশে এক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দাবি ঘোষণা করে। (এ প্রদেশে 'পুনা' বৃহত্তম রাজনৈতিক দল)। কাসাই প্রদেশের বালুবাগণ কর্তৃক কাসাই প্রদেশে এক স্বাধীন রাজ্য গঠনের সংকল্পও গৃহীত হয়।

কাসাই-এর কেন্দ্রাতিগ শক্তিদের ধ্বংস করার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন লুমুম্বা সরকারকে ১৫টি ইলিউশীন-১৪ বিমান দিয়ে সাহায্য করে। এইসব উড়ো জাহাজে করে কেন্দ্রীয় সৈন্য কাসাই প্রদেশে অবতরণ করানো হয় শ্রীকালোনজির 'হীরক রাষ্ট্রে'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর জন্য। 'হীরক রাষ্ট্রে'র নেতা নিজেই স্বীকার করেন তাঁর 'রাষ্ট্রের' সৈন্য সংখ্যা ২০০, পুলিস সংখ্যা ২৫০ ও তার ওপর আছে সশস্ত্র বালুবা কৌমের যোদ্ধারা। 'হীরক রাষ্ট্র" যে লেওপোল্ডভিলের আক্রমণের মুখে টিকতে পারত না এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

কালোনজিকে বাঁচিয়ে দিল লুমুম্বা-কাসাভুবু বিরোধ। লেওপোল্ডভিলে ইতিমধ্যেই লুমুম্বা বিরোধী ষড়যন্ত্র অনেকদূর এগিয়েছে। ২৫শে আগস্ট শহরে লুমুম্বা আহূত আফ্রিকান রাষ্ট্র সমূহের সম্মেলন-এর উদ্বোধন হবার সময় 'আবাকো', 'পুনা' ও কালোনজি অনুগামীরা লুমুম্বা বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয় ও পুলিস গুলী চালায়। ৫ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি কাসাভুবু রেডিও মারফত ঘোষণা করেন যে লুমুম্বাকে তিনি পদচ্যুত করেছেন এবং সেনেটের সভাপতি শ্রী জোসেফ ইলেওকে প্রধানমন্ত্রীপদে নিয়োগ করেছেন। কাসাভুবুর ঘোষণার কিছুক্ষণ পর লুমুম্বা নিজে রেডিও স্টেশনে গিয়ে ঘোষণা করেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষা মন্ত্রী আছেন। কাসাভুবু হলেন দেশদ্রোহী এবং তিনি আর রাষ্ট্রপতি নন। পরের দিন মন্ত্রীসভা লুমুম্বাকে সমর্থন জানায়। কিন্তু ৭ই সেপ্টেম্বর প্রতিনিধিসভা কাসাভুবু ও লুমুম্বা উভয়ের কাজ নাচক করে। অন্যদিকে ৮ই সেপ্টেম্বর সেনেট ৪১ বনাম ২ ভোটে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে লুমুম্বা সরকারের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করে। কেন্দ্রাতিগশক্তিগুলি (যথা চোম্বে ও কালোনজি) অবশ্য কাসাভুবুকে সোৎসাহ সমর্থন জানায়।

কাসাভুবু-লুমুম্বা বিরোধ আবার ফেটে পড়ার পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেনাদল লেওপোল্ডভিল বেতার স্টেশন বন্ধ করে দেয় এবং বিমান বন্দরগুলি

জাতিপুঞ্জের বিমান ছাড়া অন্য কোন বিমানকে ব্যবহার করতে দেয় না। মন্ত্রিসভা ও আইনসভার (বিশেষ করে সেনেটের) আস্থা পেয়ে লুমুম্বা বিমানবন্দর ও রেডিও স্টেশন তাঁকে প্রত্যর্পণ করার দাবি জানান।

বিশৃঙ্খল অবস্থা আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায় ১৪ই সেপ্টেম্বর যখন কঙ্গো সেনাদলের চীফ অফ স্টাফ কর্নেল মোবুতু সৈন্যদলের নামে দেশের শাসন ক্ষমতা তুলে নিলেন বলে ঘোষণা করেন। মোবুতু সব রকমের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেআইনী করলেন। সোভিয়েট, চেকোশ্লোভাক ও ঘানা দূতাবাস বন্ধ করে দিলেন এবং দৈনন্দিন শাসন চালানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে 'কলেজ অফ কমিশনার্স' খাড়া করলেন। লুমুম্বা (তখনও প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি দখল করে আছেন) মোবুতুর কাজকে আখ্যা দেন 'হাস্যকর ও বেআইনী।'

অন্যদিকে কাসাভুবু মোবুতুর ছাত্র-শাসকদের কলেজকে সমর্থন জানান। অতএব, লেওপোল্ডভিলের কেন্দ্রীয় সরকারে অতঃপর দুই যুযুধান পক্ষ দেখা দিল: একদিকে লুমুম্বা, অন্যদিকে কাসাভুবু ও মোবুতু। সমগ্র কঙ্গো জনসমর্থন যে লুমুম্বার পক্ষে বেশি ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী লেওপোল্ডভিলে হওয়ায় লুমুম্বা বিরোধীরা কিছুটা সুবিধা পায়। কাসাভুবুর প্রধান সমর্থন আসে যে বাকঙ্গোকৌমের কাছ থেকে, লেওপোল্ডভিল শহর ও প্রদেশ হল সেই বাকঙ্গো-অধ্যুষিত এলাকা। তাছাড়া, লেওপোল্ডভিলে বহু ইওরোপীয়ের বাস (তাদের মধ্যে অনেকে অবশ্য চলে গিয়েছিল। কিন্তু কেউ কেউ ছিল এবং যারা চলে যায় তাদের মধ্যে আবার অনেকে ফিরে আসে বলে প্রকাশ)। অতএব, যদি আমরা ধরে নিই (যার বাস্তব ভিত্তি প্রমাণ করা দুঃসাধ্য নয়) যে ইওরোপীয় বাসিন্দারা কঙ্গোর বিশৃঙ্খলায় নিষ্ক্রিয় থাকে নি, তবে লেওপোল্ডভিল তাদের সক্রিয়তার প্রশস্ততম ঘাঁটি ছিল সহজেই বোঝা যায়। আর, ইওরোপীয়দের অধিকাংশ যে এই সময় চরম লুমুম্বা-বিরোধী ছিল তা সর্বজনবিদিত। সর্বোপরি, কর্নেল মোবুতু নানা জায়গা থেকে (অনেকে বলেন স্বার্থসম্পন্ন পশ্চিমী কোম্পানী) অর্থসংগ্রহ করে ফোর্স পাব্লিককে স্বকীয় নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং লুমুম্বাকে ক্ষমতাচ্যুত করার কাজে এই শক্তিকে নিয়োগ করেন।

নভেম্বরের শেষদিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ লুমুম্বা-

প্রতিনিধিদের দাবি অগ্রাহ্য করে কাসাভুবু-প্রেরিত প্রতিনিধিদলকে কঙ্গোর প্রকৃত মুখপাত্র বলে গ্রহণ করলে, প্রকৃতপক্ষে মোবুতু ও তাঁর ছাত্র সহকর্মীদের শাসন খানিকটা বৈধতার মর্যাদা পায়।

কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর ১লা ডিসেম্বর মোবুতুর সেনাদল লুমুম্বাকে বন্দী করে। ১৯৬১ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি লুমুম্বাকে থিসভিল বন্দীশালা থেকে কাতাঁগার এলিসাবেথভিল কারাগারে পাঠানো হয়। ফেব্রুয়ারীর প্রথমার্ধে তাঁকে হত্যা করা হয়। কঙ্গোর স্বাধীনোত্তর রাজনীতির এক পরিচ্ছেদের শোচনীয় পরিসমাপ্তি এইভাবে হল।

কিন্তু লুমুম্বার মৃত্যুতে তাঁর আদর্শ শেষ হয় নি। গিজেঙ্গার নেতৃত্বে লুমুম্বানুগামীরা স্টানলেভিলে তাঁদের স্বাধীন শাসন স্থাপন করল। লুমুম্বার অন্য এক সহচর কাসামুরা কিভু প্রদেশের কর্তৃত্বভার হাতে তুলে নিলেন এবং লুমুম্বাপন্থীরা রুয়াণ্ডা উরুণ্ডি থেকে মোবুতু সেনার আক্রমণ প্রতিহত করে। কিছুদিনের মধ্যে আফ্রিকার ৪টি দেশ সহ (ঘানা, গিনি, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও মরক্কো) মোট ১২টি দেশ গিজেঙ্গা সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়। আর গিজেঙ্গা সরকার নিজকে সমগ্র কঙ্গোর একমাত্র বৈধ সরকার বলে দাবি করে।

ওদিকে লুমুম্বা-বিরোধী নেতারা নিজদের মধ্যে আত্মঘাতী যুদ্ধ এড়ানো ও দেশের ভাবী শাসনতন্ত্রের কাঠামো সম্পর্কে একমত হবার জন্য ১৯৬১ সালের মার্চে মালাগাসীর রাজধানী তানানারিভে এক সম্মেলনে মিলিত হন। এতে আসেন কাসাভুবু, চোম্বে, ইলেও, কামিতাতু, কালোনজি, বলিকঙ্গো ও আরও কয়েকজন নেতা। সম্মেলন থেকে বলা হল, যেসব রাজ্য (যথা লেওপোল্ডভিল, কাতাঁগা, মধ্যকঙ্গো, পূর্বকঙ্গো, উত্তর কাসাই দক্ষিণ কাসাই, একোয়াত্যর ইত্যাদি) সম্মেলনে যোগ দিয়েছে তাদের প্রত্যেকের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত। এদের এবং নতুন যেসব রাষ্ট্র হতে পারে তাদের সবাইকে নিয়ে কঙ্গোর এক ক্যনফেডারেশন গঠিত হবে। কিন্তু রাজ্যগুলি তাদের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবে। ক্যনফেডারেশনের প্রধান (সম্মেলন কাসাভুবুকে এই পদে নির্বাচিত করে) ও রাজ্যগুলির রাষ্ট্রপতিদের নিয়ে গঠিত রাজ্যপরিষদ ক্যনফেডারেশনের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ করবে। এমন নীতি নির্ধারণে প্রতিটি সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত ভোটে গৃহীত হবে।

প্রস্তাবিত এই রাজ্যগুলির মধ্যে চোম্বের শাসনাধীন কাতাঁগার পেছনে যে বিদেশী 'স্বেচ্ছাসেবক' ছিল, সেকথা চোম্বে নিজেও গোপন রাখেন নি। এছাড়া কাতাঁগার স্বাতন্ত্র্যবাদীরা কিছু কিছু পশ্চিমী দেশের সাহায্য পেয়েছে বলে শোনা যায়। কাতাঁগার জন্য অবশ্য পশ্চিমী শক্তিদের আগ্রহ স্বাভাবিক। আণবিক বোমা তৈরির অন্যতম প্রধান উপাদান, ইউরেনিয়াম, কাতাঁগা থেকে আসে। কাতাঁগায় 'উনিওঁ মিনিয়েয়্যার' নামে কোম্পানীকে যে সব কনসেশন দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে শুধু ইউরেনিয়াম নেই, আছে তামা, রূপা, কোবাল্ট (পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদনের ৮০%), দস্তা ও কয়লা। কাতাঁগার তাম্রসম্পদ পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধতম বলে অনেকে মনে করেন। এলিসাবেথভিল ও কাতাঁগার অন্যান্য শহরে উনিওঁ মিনিয়েয়্যার অনেক কারখানা স্থাপন করেছে। এ ছাড়া এর হাতে পরিবহন ব্যবস্থা, ডেয়ারী ও বড় বড় দোকান। কঙ্গোর খনিজ দ্রব্যের প্রায় ৯০% বিক্রয়ের আর সমস্ত রপ্তানী বাণিজ্যের ৪৫% উৎপাদনের দায়িত্ব এই কোম্পানীর। সারা দেশে যত কর আদায় হয় তার প্রায় অর্ধেক আসে উনিওঁ মিনিয়েয়্যারের কাছ থেকে। এমন কি এলিসাবেথ-ভিলের নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়েও এরা বহু অর্থসাহায্য করেছে। অতএব কাতাঁগার রাজনীতিতে উনিওঁ মিনিয়েয়্যারের স্বার্থ থাকা স্বাভাবিক।

কাতাঁগার স্বতন্ত্র হবার আন্দোলন অবশ্য কেন্দ্রীয় কঙ্গোলীয় সরকার সুনজরে দেখে নি। তাই তানানারিভ সম্মেলনের আরব্ধ কাজ সমাপনের জন্য এপ্রিল মাসে কোকিলাৎভিলে আর একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু চোম্বে এই সময় কাসাভুবু ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির (চুক্তি কাসাভুবু কর্তৃক নিযুক্ত নয় এমন বিদেশী উপদেষ্টাদের অব্যবহিত অপসারণের দাবি তোলে) তীব্র নিন্দা করে জানান যে এ চুক্তি প্রত্যাহৃত না হলে কাতাঁগা ও লেওপোল্ডভিলের মধ্যে যোগাযোগের এইখানেই শেষ। চোম্বের অসহযোগের হুমকি কাজে পরিণত হবার আগেই কঙ্গোলীয় সেনাদল তাঁকে বন্দী করে গোলটেবিল বৈঠকে পুনরায় যোগদানে বাধ্য করে। এই বৈঠক থেকে কঙ্গোয় এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হল। কিন্তু প্রায় দুই মাস বন্দীদশার পর মুক্তি পেয়ে চোম্বে এলিসাবেথভিলে প্রত্যাবর্তনের পর কাতাঁগার স্বাধীনতারক্ষার নতুন শপথ নিলেন। তবু কোকিলাৎভিল সম্মেলন একেবারে বিফলে যায় নি। এখান থেকে কঙ্গোলীয় কেন্দ্রীয় বিধানসভার পুনরধিবেশনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

কোকিলাৎভিল সম্মেলনের পর জুলাই মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রহরাধীনে কঙ্গোলীয় সংসদের পুনরধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কাতাঁগা বাদে কঙ্গোর সমস্ত প্রদেশ থেকেই প্রতিনিধিরা যোগ দেন, এমনকি ওরিয়তাঁল প্রদেশের পাণ্টা সরকারের নেতারা পর্যন্ত।

সংসদের সামনে করণীয় কাজ ছিল নিম্নরূপ :

(ক) নয়া সংবিধান রচনা ;

(খ) নতুন সরকার নির্বাচন ;

(গ) কঙ্গোয় জাতিপুঞ্জের কার্যকলাপ সম্পর্কে দেশের ভবিষ্যৎনীতি নির্ধারণ।

আগস্টের প্রথমে শ্রী সিরিল আদুলা ও শ্রী আঁতোয়ান গিজেঙ্গাকে যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রীপদে নির্বাচন করে কঙ্গোলীয় সংসদ এক নতুন নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠন করল। নয়া সরকার জাতিপুঞ্জের সমর্থন লাভে সক্ষম হয় এবং নতুন কেন্দ্রীয় শাসনের সমর্থনে স্টানলেভিলে গিজেঙ্গাসরকারের অবসান ঘোষিত হল। এরপর কিছুদিন দেশের অবস্থা সুব্যবস্থিত হতে যাচ্ছে এমন আশার সঞ্চার হয়।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিপুঞ্জের সেনাদল কাতাঁগা থেকে বহিরাগত বেতনভুক সৈন্যদের উচ্ছেদ অভিযান পুরোদমে শুরু করার পর কাতাঁগা 'প্রজাতন্ত্রের' পতন অবশ্যম্ভাবী মনে হয়েছিল। কিন্তু হ্যামারশোল্ডের রহস্যজনক মৃত্যু (১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১) জাতিপুঞ্জের অভিযানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর ডিসেম্বরের প্রথমে আবার অভিযান আরম্ভ হবার পর কাতাঁগার 'রাষ্ট্রপতি' চোম্বে লেওপোল্ডভিল সরকারের সঙ্গে শর্তাধীন ঐক্য আলোচনায় সম্মত হন। ২০শে ডিসেম্বর কিতোনায় চোম্বে-আদুলা সাক্ষাৎকার থেকে ঐক্যবদ্ধ কঙ্গো বজায় রাখা সম্পর্কে মতৈক্য ঘোষিত হবার কিছুদিন পরেই কিতোনা-চুক্তি অস্বীকারে চোম্বের বাধে নি।

ইতিমধ্যে লেওপোল্ডভিল সরকারের ঐক্যে ফাটল ধরেছে। আদুলা-কাসাভুবু-মোবুতু চক্রের সঙ্গে গিজেঙ্গার মতভেদ এবং পরে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে। লুমুম্বার উত্তরাধিকারী ও স্টানলেভিল সরকারের নেতা হিসাবে একসময় গিজেঙ্গার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। পরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গবেনিয়ে, জেনারেল ভিক্টর লুণ্ডুলা ও গিজেঙ্গা পরিচালিত পূর্বতন পার্তি সলিদেয়ার আফ্রিক্যাঁর অন্যতম নেতা ও লেওপোল্ডভিল প্রদেশের শাসকপ্রধান কামিতাতু প্রভৃতি অন্য লুমুম্বাপন্থী নেতাদের সঙ্গে গিজেঙ্গার মতবিরোধ ঘটে। বন্ধু-

বিচ্ছিন্নতার সুযোগে আদুলা সরকার কঙ্গোলীয় সংসদকে দিয়ে গিজেঙ্গাবিরোধী নিন্দাপ্রস্তাব পাস করায়। ১৯৬২-এর জানুয়ারীতে গিজেঙ্গা পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ হলেন।

ওদিকে কিতোনা চুক্তির (২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬১) ব্যর্থতার তিন মাসের মধ্যে শ্রীচোম্বে লেওপোল্ডভিলে কেন্দ্রীয় কঙ্গোলীয় সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে আর এক দফা বিফল আলোচনা শুরু করেন। এর কিছুদিন পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থাণ্ট কঙ্গো সঙ্কট অবসানের জন্য তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেন। উ থাণ্টের প্রস্তাব দু পক্ষ মেনে নিলেও এর বাস্তবে রূপায়নের কাজ খুব এগোয় নি। বরং কাতাঁগায় চোম্বে সরকার বিদেশ থেকে অস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহে মন দেয়। ইতিমধ্যে কাতাঁগাস্থিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেনাদলের সঙ্গে চোম্বের কাতাঁগা বাহিনীর খণ্ড সংঘর্ষ প্রায়শঃই হতে থাকে। ১৯৬২ সালের শেষে এই রকমের এক সংঘর্ষের পর জাতিপুঞ্জ বাহিনী কাঁতাগার প্রধান প্রধান শহর দখল করে। এইভাবে কাতাঁগার পৃথক অস্তিত্বের অবসান ঘটে (জানুয়ারী, ১৯৬৩)।

কিন্তু ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের দৌর্বল্য পরিস্ফুট হতে থাকে। লুমুম্বা-পন্থী ক্রিস্তফ গ্‌বেনিয়ে ব্রাজাভিলে গড়ে তোলেন জাতীয় মুক্তি পরিষদ, যার উদ্যোগে কিউলু, মধ্য কিভু, উত্তর কাতাঁগা ও উর্ধ্ব কঙ্গোর বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহ ঘটে। কঙ্গোর জাতীয় বিধান পরিষদের কার্যকাল শেষ হয় ১৯৬৪ সালের ৩০শে জুন। রাষ্ট্রপতি কাসাভুবু ইতিপূর্বেই নতুন সংবিধান রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বামপন্থী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে তিনি এবার অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য দেশত্যাগী শ্রীচোম্বেকে আহ্বান জানান।

১৫ই জুলাই চোম্বে অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় এক সংযুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

১৯৬৫ সালের মার্চমাসে স্বাধীনোত্তর কঙ্গোর প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহীদের অবশ্য ভোটদানের অনুমতি মেলে না, এবং দেশের নবসৃষ্ট ২৩টি প্রদেশের মধ্যে অন্ততঃ ৫টিতে কোন নির্বাচন হতে পারে না। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রধানতঃ তিনটি দল : চোম্বের নেতৃত্বে ও বহু ছোটখাট দলের সমবায়ে গঠিত 'কোনোকো' (কঙ্গোলীয় জাতীয় ক্যনভেনশন) রাষ্ট্রপতি কাসাভুবুর 'আবাকো' এবং লুমুম্বা-প্রতিষ্ঠিত

এম. এন. সি.। কিছু কিছু বামপন্থী লুমুম্বানুগামী নির্বাচন বয়কটের আহ্বান দেয়।

নির্বাচনে চোম্বের 'কোনোকো' দলের জয়লাভ হলেও চোম্বে ও কাসাভুবুর মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। কাসাভুবু সংবিধান-প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতাবলে চোম্বেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন (১৩ই অক্টোবর ১৯৬৫) এবং 'বালুবাকাত' দলেব শ্রীকিম্বাকে মন্ত্রিসভা গঠনে আহ্বান জানান। কিন্তু কিম্বা-মন্ত্রিসভা দু'মাসও টেকে নি। ২৫শে নভেম্বর কঙ্গোলীয় সেনাদলের প্রধান জেনারেল জোসেফ মোবুতু এক সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠন করলেন এবং নিজেকে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করলেন। মোবুতুর আদেশে কর্নেল লেওনার্দ মুলাম্বা কাসাভুবু ও চোম্বের সমর্থকদের নিয়ে এক নতুন ক্যাবিনেট গঠন করলেন। পরে অন্য তিনজন প্রাক্তন মন্ত্রীসহ শ্রীকিম্বাকে মোবুতু-বিরোধী চক্রান্তের অভিযোগে প্রকাশ্যে ফাঁসী দেওয়া হয়। জেনারেল মোবুতু ক্রমশ: পার্লামেণ্ট ও প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করেন এবং ১৯৬১ সালের শেষে প্রধানমন্ত্রীর পদের অবসান ঘোষিত হয়। কিছুদিন আগে শ্রীচোম্বের অনুপস্থিতিতে তাঁর বিচার হয়েছে এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

পাঁচ

বর্তমান অধ্যায়ের মূলসূত্রগুলি এবার একত্র উপস্থিত করা যাক।

উনবিংশ শতকের শেষভাগে ইওরোপীয় অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে ১৯৬০ সালের ১লা জুলাই পর্যন্ত কঙ্গোর ইতিহাসের ধারা আমরা অনুসরণ করেছি, কারণ যে কোন দেশেরই অতীত ইতিহাস বর্তমান পরিস্থিতিকে বুঝতে অনেকখানি সাহায্য করে।

আমরা দেখেছি বের্লিন সম্মেলনের (১৮৮৪—১৮৮৫) পর থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত কী ভাবে কঙ্গো শাসিত ও শোষিত হয়। কঙ্গোর সনাতন সমাজ এই নির্মম, অমানুষিক শাসনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। অন্যদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে কঙ্গোয় শিল্পায়ন ও নগরায়নের দ্রুতগতি অভ্যন্তরের বহু মানুষকে এনেছে শহরে, খনি-এলাকায় ও বাগিচায়। কিন্তু নানা কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেকার যোগাযোগ সারা কঙ্গোর অধিবাসীদের মধ্যে সমবৈশিষ্ট্য-

চেতনার জন্ম দিতে পারে নি। আজকের কঙ্গোর অস্থির রাজনীতির একটা কারণ খুঁজতে হবে এইখানে।

এ ছাড়া ৭৫ বছরের শাসনে বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষ কঙ্গোলীয়দের পুরোপুরি রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে রাখে। আমরা জানি ১৯৫৭ সালে সর্বপ্রথম সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারে পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬০সালের মাঝামাঝি এই সাড়ে তিন বছরে কঙ্গোর রাজনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে ততটাই, যতটা অর্জন করতে ভারতবর্ষের প্রায় ৮০ বছর লেগেছে। আকস্মিক ক্ষমতা ত্যাগ ও কঙ্গোর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে সক্রিয় হস্তক্ষেপ বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদের মধ্য আফ্রিকায় নিজ কর্তৃত্ব বজায় রাখার এক নতুন কৌশল হতে পারে। কঙ্গোয় ভারসাম্যের অভাবের এটা একটা কারণ সন্দেহ নেই।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ পূর্ব আফ্রিকা

এক

পূর্ব আফ্রিকা বলতে আমরা এখানে প্রধানতঃ তিনটি দেশকে বোঝাব: কেনিয়া, উগাণ্ডা ও টানজানিয়া। এই তিনটি দেশের মধ্যে একাধিক দিকে সাদৃশ্য রয়েছে। প্রথমতঃ তারা এক ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে পড়ে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে সাহারার অনুর্বর বিস্তৃতি, পশ্চিমে হ্রদ অঞ্চল, দক্ষিণে রোভুমা নদী আর পূর্বে আরব সাগর। জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতির দিক থেকেও তারা অনুরূপ। দ্বিতীয়তঃ, কিছুদিন আগে পর্যন্ত এইসব দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৃটেন কর্তৃক শাসিত হয়েছে। জাঞ্জিবার (বর্তমানে টানজানিয়ার অংশ) ছিল বৃটিশ আশ্রিত রাজ্য অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তার স্বায়ত্তশাসনের অধিকার খর্ব হয় নি। ট্যাঙ্গানাইকা (বর্তমান টানজানিয়ার বৃহত্তর অংশ) বৃটেন কর্তৃক শাসিত হত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিচালনাধীনে অছি-অঞ্চল হিসাবে। কেনিয়ার কিয়দংশ ও উগাণ্ডা ছিল আশ্রিত রাজ্য আর কেনিয়ার বাকী অংশে স্থাপিত হয় বৃটিশ উপনিবেশ। কেনিয়া, উগাণ্ডা ও জাঞ্জিবারে বৃটিশ আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে প্রায় ৮০ বছর আগে। ট্যাঙ্গানাইকা প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মান পূর্ব আফ্রিকার বৃহত্তর অংশ হিসাবে শাসিত হত (ক্ষুদ্রতর অংশ রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি নামে বেলজিয়াম শাসিত অছি অঞ্চলে পরিণত হয়) যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ে ট্যাঙ্গানাইকার বৃটিশ শাসনে অছি-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তি ঘটে।

অন্য একদিকে এই দেশগুলির মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তা হচ্ছে এই সব দেশে ইওরোপীয় ও এশীয় ঔপনিবেশিকদের অবস্থিতি। জাঞ্জিবারে তো কয়েক শতাব্দী ধরে একটি আরব বংশ রাজত্ব করেছে এবং সুলতানী শাসন উচ্ছেদের আগে সেখানকার শাসক ও অভিজাত গোষ্ঠী প্রধানতঃ আরব ছিল। এছাড়া আরব বণিকেরা পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে আছে। আরবদের মত অবিভক্ত ভারতবর্ষ থেকে আগত বণিকেরা জাঞ্জিবার, কেনিয়া, উগাণ্ডা ও ট্যাঙ্গানাইকায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। তার ওপর পরদেশী ঔপনিবেশিকদের মধ্যে ইওরোপীয়রাও আছে। জলবায়ু প্রতিকূল

বলে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকরা অধিকাংশ এলাকায় স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধতে পারে না। শুধুমাত্র কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানাইকার মালভূমিতে তারা বিস্তৃত জমি নিয়ে স্থায়ীভাবে বসতি করেছে।

এই সব ঔপনিবেশিকদের সংখ্যা সমগ্র দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে নগণ্য। কিন্তু তাদের প্রভাব শুধু জনসংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়। ইওরোপীয় ও এশীয় বাসিন্দারা এতদিন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করে এসেছে বা এখনও অনেকাংশে করছে। তারা হল বিস্তৃত জমির মালিক. কল-কারখানা বেশীর ভাগ তাদের হাতে এবং ঔপনিবেশিক শাসনে তো বটেই এমন কি স্বাধীনোত্তর কালেও অফিস-আদালতে বড় বড় পদ তারা দখল করে আছে। তার ওপর বৃটেনের হাতে চরম শাসন ক্ষমতা থাকায় ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বেশ কিছুটা অতিরিক্ত সুবিধাভোগ করেছে।

ঔপনিবেশিক আমলে ট্যাঙ্গানাইকায় সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বর্ণভেদে পারিশ্রমিকের তারতম্য হত। আবশ্যিক শ্রমদানে শুধুমাত্র আফ্রিকানরাই বাধ্য থাকত। মাস্টার অ্যাণ্ড নেটিভ সার্ভেণ্টস অডিন্যান্সের বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী আফ্রিকান চাকরদের কাজের চুক্তির সর্ত লঙ্ঘন ছিল ফৌজদারী বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ, যেখানে ইওরোপীয় মনিবদের পক্ষে এমন ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষিত হয় নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভেদমূলক ব্যবস্থা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। ১৯৫২ সালে যেখানে সরকারী বিদ্যালয়ে ইওরোপীয় ছাত্রদের মাথাপিছু ২০৭ পাউণ্ড খরচ করা হয়, সেখানে এক ধরণের বিদ্যালয়ে এশীয় ও আফ্রিকান ছাত্রের মাথাপিছু খরচ ছিল যথাক্রমে ২৯.১ এবং ৭.৬ পাউণ্ড।

বর্ণবিভেদের মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল এবং তাও আবার ট্যাঙ্গানাইকায়, যে দেশটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছি-শাসনে থাকায়, পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছে। কেনিয়ার কথা ধরা যাক। ঔপনিবেশিক যুগে এমনকি বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষিত কেনীয় গ্র্যাজুয়েটেরও অধিকাংশ ইওরোপীয় হোটেলে বা রেস্তোরাঁয় প্রবেশাধিকার ছিল না। কেনীয় আফ্রিকানরা মদ কিনতে পারত না, যদিও অনাফ্রিকানদের ওপর এমন নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয় নি। তেমনি 'পাস' ছাড়া আফ্রিকানরা রাত্রে বাইরে বেরোতে পারত না। অস্ত্রবহনে তাদের

অধিকার ছিল না। এমন কি সাইসাল ও কফি উৎপাদন করতে হলেও তাদের সরকার-প্রযুক্ত কয়েকটি বিধিনিষেধ মেনে চলতে হত।

কেনিয়ায় ইওরোপীয় আফ্রিকান দ্বন্দ্বের একটা বড় কারণ হল জমি সমস্যা। ১৮৯৭ সালে লর্ড ডেলামেয়ার সর্বপ্রথম কেনিয়ার মালভূমিতে ইওরোপীয় বসতি স্থাপনের প্রস্তাব তোলেন। তারপর এই শতাব্দীর শুরু থেকে ধীরে ধীরে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকরা বিস্তৃত জমি নিয়ে ব্যাপকভাবে চাষবাস আরম্ভ করে। এমনভাবে তাদের দখলে আসে সমগ্র মালভূমি যার আয়তন ছিল ১৬,০০০ বর্গমাইল। সরকার থেকে ৯৯৯ বছরের জন্য এই জমি ইওরোপীয়দের ইজারা দেওয়া হয়। এবং ১৯৩৮ সালের ক্রাউন ল্যাণ্ডস অর্ডিন্যান্সে বলা হয় যে "এইসব ইজারাপ্রাপ্ত জমির মালিক গভর্নরের সম্মতি ব্যতিরেকে ইওরোপীয় ছাড়া অন্য কারোকে জমির ম্যানেজার বা মালিক করতে পারবে না।" কেনিয়ার উচ্চভূমিতে ইওরোপীয়দের একচেটিয়া অধিকার দেওয়ায় এই অঞ্চল 'হোয়াইট হাইল্যাণ্ডস' বা শ্বেত মালভূমি নামে পরিচিত হয়।

এই ব্যাপক জমি হস্তান্তরের সর্বনাশা ফল কেনিয়ার আফ্রিকানরা ভোগ করেছে। আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কিকিয়ু উপজাতির। মালভূমির উর্বর জমি পরহস্তগত হওয়ায় কিকিয়ু বাসভূমি জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এর ফলে যেমন বহু কিকিয়ু ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হয়ে অন্যের জমিতে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে জমির ফলন শক্তির অপচয় ও ক্ষয় হয়েছে। কেনিয়ার স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কয়েক বছর আগেকার হিসাবে প্রকাশ যে 'প্রায় পাঁচ লক্ষ কিকিয়ুর হাতে কোন জমি ছিল না। যেখানে 'শ্বেতমালভূমির' প্রায় অর্ধাংশে কোন চাষ হচ্ছিল না। একই সময়ে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার কিকিয়ু ২,০০০ বর্গমাইল এলাকার ভোগদখল করছিল, যেখানে ৩,০০০ ইওরোপীয়ের হাতে ছিল ৩,০০০ বর্গমাইল জমি। বঞ্চিত কিকিয়ুদের বিক্ষোভ ও নৈরাশ্য যে মাউ মাউ বিদ্রোহে ফেটে পড়ে একথা সাধারণতঃ স্বীকৃত।

পূর্ব আফ্রিকার সর্বত্র বর্ণবৈষম্যের পাশাপাশি ইওরোপীয়, এশীয় ও আফ্রিকানদের মধ্যে দুরপনেয় অর্থনৈতিক পার্থক্য দেখতে পাওয়া গেছে। ১৯৫২ সালের এক হিসাবে প্রকাশ, ট্যাঙ্গানাইকার খনিশিল্পে নিয়োজিত মূলধনের ৯৯·৫% ইওরোপীয়দের হাতে। সে দেশের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন সাইসাল উৎপাদনের ৭২½% এরও বেশি ইওরোপীয়দের এবং

২৫% এশীয়দের নিয়ন্ত্রণে। এছাড়া বড় বড় ব্যাঙ্ক ও পাইকারী বাণিজ্যেরও অধিকাংশ ইওরোপীয় মালিকানায়।

ইওরোপীয়দের পরে এশীয় (আরব বাদে) ঔপনিবেশিকদের স্থান। এরা প্রধানতঃ খুচরা ব্যবসায় ও মাঝারি ধরনের চাকরিতে নিযুক্ত। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এশীয় বাসিন্দারা নিজদের সম্পত্তিও বাড়িয়েছে। ১৯৩৮ সালে যত সম্পত্তি দখলের অধিকার দেওয়া হয় তার ৬০% যায় এশীয়দের হাতে। ১৯৪৫ সালে এই অনুপাত বেড়ে হয় ৬৭%। এশীয়দের মত আরবরাও প্রধানতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত। ১৯৫২ সালের এক হিসাবে প্রকাশ ট্যাঙ্গানাইকার আরবদের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ে কর্মরত ছিল।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ আফ্রিকান কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল বা এখনও আছে, যদিও এরা প্রায়শঃ বাজারে বিক্রয়ের জন্য পণ্যোৎপাদন করে না। এদের চাষের মূল উদ্দেশ্য হল নিজদের প্রয়োজনীয় ফসল নিজেরাই তৈরি করা। কৃষিছাড়া ছোটখাট কারখানা, যানবাহন, সরকারী ও বেসরকারী অফিসে আফ্রিকানরা অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। স্বাধীন পেশাতেও (যেমন আইন, চিকিৎসা ইত্যাদি) আফ্রিকানদের অবদান কম ১৯৫৫ সালের হিসাবে দেখা যায়, সারা দেশে শ'চারেক লাইসেন্স-প্রাপ্ত ডাক্তারের মধ্যে আফ্রিকান ডাক্তারের সংখ্যা হল মাত্র ১০। আইন ব্যবসায়ে আফ্রিকানরা ছিল আরো কম। শিল্প ও বাণিজ্যেও আফ্রিকান অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। কফি, তুলা ও তামাক উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আফ্রিকান সমবায় সমিতিগুলি কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু পূর্বোক্ত বছরে সারা দেশের বড় বড় ১৯টি বেসরকারী কোম্পানীর একটিও আফ্রিকানদের আয়ত্তে ছিল না।

ট্যাঙ্গানাইকায় ইওরোপীয় এশীয় ও আফ্রিকানদের অর্থনৈতিক অবস্থার যে তুলনামূলক বর্ণনা দেওয়া হল, পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য দেশের পক্ষেও তা প্রাসঙ্গিক। কমবেশি সর্বত্র ইওরোপীয়রা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শৃঙ্গে, এশীয়েরা মাঝামাঝি এবং আফ্রিকানরা তাদের নীচে। ঔপনিবেশিক যুগে পূর্ব আফ্রিকার সমাজ কাঠামোর এই ছিল নকশা, স্বাধীনোত্তর কালে আফ্রিকানদের অবস্থার উন্নয়নের অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু এর গুণগত রূপান্তর এখনও ঘটে নি।

দুই

পূর্ব আফ্রিকার সব ক'টি দেশেই আফ্রিকানদের বহুদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক অধিকার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল।

আফ্রিকান স্বাধীনতার সমস্যা কিছুটা জটিল হয় ইওরোপীয় ও এশীয় ঔপনিবেশিকদের অবস্থানের ফলে। শিক্ষায়-দিক্ষায়, অর্থনৈতিক ক্ষমতাতে এরা অনেক বেশী এগিয়ে ছিল এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে-ও এরা আফ্রিকানদের চেয়ে অনেক বেশী সংগঠিত ছিল। সুতরাং অনেক সময়ে এরা (বিশেষ করে ইওরোপীয়েরা) নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে আফ্রিকান স্বাধীনতার পথে বিঘ্ন সৃষ্ট হয়েছে।

এই সমস্যার সবচেয়ে কুৎসিত রূপ দেখা গেছে কেনিয়ায়। এখানকার ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকরা আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে (১৯১৩ সালে) স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলে। এদের মতলব ছিল স্বায়ত্তশাসন পেলে এরা নিজেদের আধিপত্য আরো ভালোভাবে বজায় রাখতে পারবে (যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রোডেশিয়ার ইওরোপীয় বাসিন্দারা পেরেছে)। ১৯১৯ সালে বৃটিশ সরকার এদের দাবি আংশিক মেনে নেয়। ঠিক হয় অতঃপর আইন-পরিষদে ১১ জন ইওরোপীয় সদস্য নির্বাচিত হবে। ইওরোপীয় অধিবাসীদের এই সুযোগদানে এশীয়রাও তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু এশীয় বাসিন্দারের আন্দোলনে বৃটিশ সরকার বড়ই বিব্রত হয়ে ১৯২৩ সালে প্রকাশিত ডেভনশায়ার শ্বেতপত্রে ঘোষণা করে:

"···কেনিয়া মূলতঃ আফ্রিকান দেশ। এবং বৃটিশ সরকার তাঁদের এই সুবিবেচিত মত অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা উচিত বলে মনে করেন যে আফ্রিকানদের স্বার্থ সবার উপরে। আর যদি এই স্বার্থের সঙ্গে ঔপনিবেশিকদের স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হয় তবে আফ্রিকানদের স্বার্থকে বড় করে দেখতে হবে।"

মজার ব্যাপার এই যে যখন বৃটিশ সরকার আফ্রিকান স্বার্থের দোহাই পাড়ছেন তখনও পর্যন্ত আফ্রিকানদের কোন প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা, এমনকি কোন আফ্রিকানকে মনোনীত করে আইনপরিষদে আসন দেওয়া হয় নি। কেনিয়ায় আফ্রিকানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ধাপে ধাপে এগিয়েছে:

১৯২৭ আফ্রিকান স্বার্থ রক্ষণারেক্ষণ করার জন্য একজন ইওরোপীয়কে আইন-পরিষদে মনোনয়ন করার ব্যবস্থা।

১৯৪৪ প্রথম আফ্রিকান বেসরকারী সদস্যের মনোনয়ন।

১৯৪৬ দ্বিতীয় আফ্রিকান বেসরকারী সদস্যের সাময়িকভাবে মনোনয়ন।

১৯৪৭ দ্বিতীয় আসনকে স্থায়িত্বদান।

১৯৪৮ স্থির হয় যে আফ্রিকান স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান কয়েকজনের নাম পেশ করবে এবং তার মধ্য থেকে গভর্নর চার জন আফ্রিকানকে আইন-পরিষদে মনোনীত করবেন।

ইতিমধ্যে কেনিয়ায় আফ্রিকানদের ধূমায়িত বিক্ষোভ প্রকাশ্য দাবানলে রূপ নিয়েছে। আমরা আগেই বলেছি কিকিয়ুদের জমিসমস্যা ছিল এই বিক্ষোভের মূল। বহুদিন থেকে কিকিয়ুরা তাদের জমি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে আসছে। ১৯২২ সালে এই উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশন বলে এক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই সংগঠনকে বেআইনী ঘোষিত হল। যুদ্ধের পরে জোমো কেনিয়াট্টার নেতৃত্বে কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়ন নামে নতুন এক প্রতিষ্ঠান খাড়া করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে কেনিয়া সরকার একে নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে। এবং কেনিয়াট্টাকে জেলে পোরা হয়। সরকারের ভাষ্য: মাউ মাউ আন্দোলন সংগঠনে কেনিয়াট্টার হাত আছে। কেনিয়াট্টা অবশ্য এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। এর সঙ্গে সঙ্গে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। এরপর মাউ মাউ আন্দোলন প্রায় বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। ১৯৫২ সালে অক্টোবরে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর থেকে ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে যখন জরুরী অবস্থায় সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় তার মধ্যে প্রায় ১০,০০০ এর মত মাউ মাউ সমর্থক এবং ১,১৬৭ জন নিরাপত্তা রক্ষী হতাহত হয়। এছাড়া একই সময়ে ১৮০০ এর বেশী বেসামরিক লোক প্রাণ হারিয়েছে যার মধ্যে মাত্র ৩২ জন ইওরোপীয় ও ২৬ জন এশীয়। এই ৭½ বছরে ১,০০০ এরও বেশী মাউ মাউ স্বেচ্ছাসেবককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। সবসুদ্ধ মোট ৭৮,০০০ জন মাউ মাউ সমর্থককে বন্দী ও অন্তরীণ করা হয় যার মধ্যে জরুরী অবস্থা সমাপ্তি ঘোষণার সময় পর্যন্ত ১,০০০ জন মুক্তি পায় নি।

শেষপর্যন্ত সরকারী চণ্ডনীতিতে মাউ মাউ আন্দোলন দমন করা হলেও কেনিয়ার অগ্রগতি এই আন্দোলনের তীব্রতায় আরো একধাপ এগিয়ে যায়।

প্রথমতঃ একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে আফ্রিকানরা নিজ বাসভূমে পরবাসীর অবস্থা বিনা প্রতিবাদে মাথা পেতে নেবে না। সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের একথা বুঝতে বাকী থাকে না যে সক্রিয় আফ্রিকান বিরোধিতার সামনে তারা কত অসহায়। এই অসহায়তা শহরের বাইরে, বিশেষতঃ বিরাট বিরাট এলাকা নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে যাঁরা চাষবাস করছেন তাঁদের মধ্যে—অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। এবং একথা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না যে কেনিয়ার ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের ভাবী নিরাপত্তা আফ্রিকানদের সদিচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল। তাই আফ্রিকান প্রগতির পথে ইওরোপীয় বাসিন্দারা আর তেমন করে বাধাসৃষ্টি করতে পারে না।

১৯৫১ সালে জনৈক আফ্রিকান প্রতিনিধিকে কার্যনির্বাহী পরিষদ বা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে স্থান দেওয়া হয়। তিন বছর বাদে (১৯৫৪) বৃটিশ কলোনিয়্যাল সেক্রেটারী অলিভোর লিটল্টন নতুন এক সংবিধান গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান। এই সংবিধানে আফ্রিকান ও এশীয় প্রতিনিধির সংখ্যা কিছু বাড়ানো হয়।

কিন্তু তবু ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত আফ্রিকান প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হতেন না। সে-বছরের শুরুতে ৮ জন আফ্রিকান সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হলেন। কিন্তু নির্বাচনের পরা এঁরা সরকারী কাজে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। এইভাবে লিটল্টন সংবিধানকে বয়কট করার পর লেনক্স-বয়েড সংবিধান নামে এক নতুন সংবিধান মারফত আফ্রিকানদের আইনসভায় অতিরিক্ত ছ'টি আসন দেওয়া হল। কিন্তু কেনীয় জাতীয়তাবাদীরা এতেও সন্তুষ্ট হয় নি।

এর পর ১৯৬০ সালের প্রথমে অনুষ্ঠিত লণ্ডন সংবিধানিক সম্মেলন আইন পরিষদের নির্বাচনের ভিত্তি প্রশস্ততর করে এবং আইনপরিষদে নিরঙ্কুশ আফ্রিকান সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে স্বীকৃতি দেয়। একই বছরে কয়েকটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী মিলে কেনিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন (কে. এ. এন. ইউ বা সংক্ষেপে 'কানু') গঠন করে। অন্যদিকে এর বিরোধীরা গড়ে তোলে কেনিয়া আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন (কে. এ. ডি. ইউ বা 'কাডু')। 'কাডুতে' সামিল হল জজ্জা, কিপসিগি, স্থক, মাসাই ও সোমালি উপজাতিদের বিভিন্ন সংগঠন। 'কাডু'র অভিযোগ ছিল যে 'কানু' (যার প্রধান সমর্থন আসে কিকিয়ু উপজাতির কাছ থেকে) ছোট ছোট উপজাতির স্বার্থ উপেক্ষা করছে।

১৯৬১ সালের গোড়ায় কেনিয়ায় সাধারণ নির্বাচনে নতুন আইনসভার ৫৩টি আসনের মধ্যে 'কানু' ১৬ ও 'কাডু' ১০টি আসন দখল করে। কিন্তু কেনিয়াট্টাকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত 'কানু', কোন মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। তখন কাডুর নেতৃত্বে এক মন্ত্রিসভা গঠিত হল। তারপর অবশ্য 'কানু' ও 'কাডু'র সম্মিলিত দাবিতে কেনিয়াট্টা মুক্তি পান। প্রথম প্রথম কেনিয়াট্টার প্রভাবে 'কানু'-'কাডু' বিরোধের তীব্রতা হ্রাস পেলেও এদের নেতারা অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রিসভা ও ভাবী শাসন কাঠামো সম্পর্কে একমত হতে পারেন নি! 'কাডু'র নেতারা চান অপেক্ষাকৃত দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, পক্ষান্তরে 'কানু'র দাবি ছিল শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার। সে বছরের শেষে কেনিয়াট্টা 'কানু'তে যোগ দেন এবং 'কানু'-'কাডু' মিলনের আশা তিরোহিত হয়।

অবশ্য কানু-কাডু দ্বন্দ্ব ছাড়া অন্য অসুবিধাও ছিল। কেনিয়ার উত্তর-পূব সীমান্ত অঞ্চলের কিছু কিছু সোমালিভাষী অধিবাসী ও উপজাতীয় প্রধান সোমালি প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে তাদের অধ্যুষিত অঞ্চলের সংযুক্তির দাবি জানায়। অনুরূপভাবে উপকূল অঞ্চল সম্পর্কেও কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এ এলাকার উপর জাঞ্জিবারের দাবির কথা অনেকে উল্লেখ করেন। পক্ষান্তরে দি কোস্ট পিপল্‌স পার্টি নামে একটি প্রতিষ্ঠানে উপকূলস্থ কয়েকটি জিলার স্বাধীনতা কামনা করে।

১৯৬১ এর শেষে স্যর জেমস রবার্টসনের রিপোর্টে উপকূল অঞ্চলের স্বাধীন কেনিয়ায় পূর্ণ অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব সমর্থন পায়। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এক নতুন সংবিধান সম্মেলন আহূত হল)। প্রায় দুই মাসব্যাপী আলোচনার পর অবশেষে 'কানু' ও 'কাডু' একমত হতে পারে। স্থির হয়, কেনিয়ার ভাবী সংবিধানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা থাকবে এবং সম-প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে 'কানু-কাডু'র সংযুক্ত মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। সম্মেলনের আর একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কানু ও কাডুর সংযুক্ত মন্ত্রিসভা গঠিত হল। ১৯৬৩ সালের শুরুতে আরও সংবিধানিক পরিবর্তনের পর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে 'কানু' জাতীয় বিধান পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যা- গরিষ্ঠতা পায় এবং জোমো কেনিয়াট্টার নেতৃত্বে 'কানু'-মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসে। ১৯৬৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর কেনিয়া স্বাধীনতা পায় এবং এক বছর বাদে প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করে। জোমো কেনিয়াট্টা কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

তিন

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত মনে করা হত পূর্ব আফ্রিকার বৃটিশ শাসিত দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে আগে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতা লাভ করবে উগাণ্ডা। এবং সত্যি কথা বলতে কি কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানাইকার তুলনায় উগাণ্ডা অনেকাংশে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। প্রথমতঃ কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানাইকার মত উগাণ্ডায় অত বেশী সংখ্যক ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক ছিল না। ফলে উগাণ্ডায় ইওরোপীয় বাসিন্দাদের কোন কায়েমী স্বার্থ গড়ে উঠিতে পার নি। দ্বিতীয়তঃ প্রাক-ইওরোপীয় যুগে অন্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী সুসংগঠিত রাজ্য উগাণ্ডার অধিবাসীরা স্থাপন করতে পেরেছিল—যে কৃতিত্ব তাদের সভ্যতার মান ও উৎকর্ষের প্রমাণ দেয়। কিন্তু এসব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও উগাণ্ডার স্বরাজের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয় নি।

আসলে উগাণ্ডা একটি আশ্রিত রাজ্য যেখানে কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। প্রতি রাজ্যে বৃটিশ সরকারের একজন প্রতিনিধি বা রেসিডেণ্ট থাকতেন। এইসব রেসিডেণ্টদের ওপর ছিলেন গভর্নর সারা উগাণ্ডার জন্যে। উগাণ্ডায় সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজ্য হল বুগাণ্ডা যার শাসনকর্তা বা রাজার নাম কাবাকা। বহুদিনের শাসনের ঐতিহ্য বুগাণ্ডার আছে। ১৮৬২ সালে যখন স্পেক প্রথম উগাণ্ডায় আসেন তখন এ রাজ্যের সভ্যতার উৎকর্ষ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সুসংহত রাজ্য ছাড়াও বুগাণ্ডার অধিবাসী বাগাণ্ডা উপজাতি উগাণ্ডার অন্য তেরটি বৃহৎ উপজাতির যে কোনটির আয়তনের দ্বিগুণ হবে। বাগাণ্ডা উপজাতির সংখ্যা হবে দশ লক্ষেরও বেশী অর্থাৎ উগাণ্ডার সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগ।

এইসব কারণে উগাণ্ডার রাজনীতি বাগাণ্ডাদের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। যুদ্ধোত্তর উগাণ্ডার বৃহত্তম সংকট দেখা দেয় ১৯৫৩ সালে। এ সংকটের পটভূমিকা বোঝার জন্য আমাদের বুগাণ্ডার অতীত ইতিহাস ঘাঁটতে হবে। ১৯০০ সালে বৃটেন ও বুগাণ্ডার মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার মূল সর্ত ছিল : বৃটেন কাবাকাকে বুগাণ্ডার শাসনতান্ত্রিক কর্তা বলে স্বীকার করবে এবং কাবাকা বুগাণ্ডা শাসনের ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে

সহযোগিতা করবেন। যতদিন কাবাকা বুগাণ্ডার একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন অর্থাৎ যতদিন বুগাণ্ডায় গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ হয় নি ততদিন এ ব্যবস্থা মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে চলেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বুগাণ্ডার শাসনকাজে প্রতিনিধিদের যুক্ত করা হচ্ছিল। ১৯৫৩ সালে বুগাণ্ডার সর্বোচ্চ আইন পরিষদ 'লুকিকো'য় ৮৯ জন সদস্যের মধ্যে ৬০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। 'লুকিকো'র এই গণতন্ত্রীকরণ একদিকে যেমন বাগাণ্ডা জনগণকে তাদের ভাগ্যনির্ধারণের আংশিক অধিকার দিল, কাবাকার পক্ষে তেমনি এক উভয় সংকট উপস্থিত হল। বুগাণ্ডার জনমত ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিলে তাঁর কী কর্তব্য? ১৯০০ সালের চুক্তি অনুযায়ী তিনি বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বাধ্য। অথচ অন্যদিকে তিনি একধারে বাগাণ্ডা উপজাতির শাসক এবং নেতাও বটে। অর্থাৎ বাগাণ্ডা জনমতের বিরুদ্ধে গেলে তাঁর নেতৃত্ব বজায় রাখা কঠিন হবে।

১৯৫৩ সালে কাবাকার পক্ষে ঠিক এমনি ধরনের সমস্যার উদ্ভব হল। সে বছর অনিচ্ছুক আফ্রিকানদের ওপর জোর করে মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র চাপানো হয়েছে। পূর্ব আফ্রিকায়ও এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথাবার্তা কোন কোন মহলে চলছিল। উগাণ্ডার আফ্রিকানরা স্বভাবতঃই এই ভয় পায় যে কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানাইকা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হলে সেখানকার ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের প্রভুত্ব উগাণ্ডায়ও বিস্তৃত হবে। এই অবস্থায় বুগাণ্ডার জননেতারা পৃথকভাবে বুগাণ্ডার স্বাধীনতা দাবি করার সিদ্ধান্ত করলেন। বাগাণ্ডা উপজাতি চিরকাল তাদের ঐতিহ্য ও পৃথক সত্তা সম্বন্ধে সচেতন। পূর্ব আফ্রিকা তো নয়ই এমন কি উগাণ্ডার অন্য এলাকার সঙ্গেও বুগাণ্ডা নিজের ভাগ্যকে জড়াতে চাইল না। কিন্তু উগাণ্ডার সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ হল বুগাণ্ডা ও সবচেয়ে বড় উপজাতি হল বাগাণ্ডা। বুগাণ্ডাকে বাদ দিয়ে উগাণ্ডা যেন রামহীন রামায়ণ। সুতরাং বৃটিশ সরকার এই দাবির বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করল। কাবাকার পক্ষে কিন্তু বাগাণ্ডা প্রজাদের প্রবল জনমতের বিপক্ষে যাওয়া সম্ভব হল না, যদিও প্রজার পক্ষে গিয়ে তাঁকে ১৯০০ সালের চুক্তি লঙ্ঘন করতে হল। এবং তার শাস্তি তাঁর ভাগ্যে জুটল নির্বাসন।

কিন্তু কাবাকার নির্বাসন সারা দেশে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলল। সারা

বুগাণ্ডায় শোকের ছায়া নামল এবং কাবাকার ভগ্নী ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। রাজভক্ত বাগাণ্ডা প্রজারা কাবাকাকে ফিরিয়ে আনার দাবি তুলল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল উগাণ্ডা জাতীয় কংগ্রেস।

প্রায় দু'বছর পরে (১৯৫৫, অক্টোবর) বৃটিশ সরকার কাবাকাকে দেশে ফিরতে অনুমতি দেয়। কাবাকার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কতকাংশে খর্ব করা হয় এবং স্থির হয় বুগাণ্ডা উগাণ্ডা থেকে পৃথক হতে চাইবে না। কিন্তু কাবাকার নির্বাসন পর্ব শেষ হবার পর ও উগাণ্ডার স্বাধীনতার পথ মসৃণ ও বাধামুক্ত হয় নি। উগাণ্ডা জাতীয় কংগ্রেস ১৯৫২ সালে (যখন এর জন্ম হয়) থেকে শুরু করে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বেশ শক্তিশালী ছিল। কিন্তু তারপর কাবাকার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে কংগ্রেস ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। অথচ উগাণ্ডা উপজাতির নেতাদের পক্ষ থেকে স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ উগাণ্ডাদেশ গঠনের পথে সহযোগিতার অভাব আগের মতই থাকে। এমন কি ১৯৫৮ সালে সারা দেশ জুড়ে যখন নির্বাচন হল, তখন লুকিকো (বাগাণ্ডা আইনসভা) সে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে উগাণ্ডা জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও এক সময়কার সভাপতি মুসাজি 'উগাণ্ডা জাতীয় আন্দোলন' নামে এক জঙ্গী সংগঠন গড়ে তোলেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে এক এশীয় বিরোধী বয়কট আন্দোলন রক্তাক্ত হাঙ্গামায় পরিণত হওয়ার পর, এই প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়, বুগাণ্ডা উপদ্রুত এলাকা বলে ঘোষিত হল এবং এর ছ' জন নেতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উগাণ্ডার আভ্যন্তরীণ অনৈক্য (প্রটেস্ট্যাণ্ট ক্যাথলিক মুসলমান বিভেদ এবং মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী বনাম উপজাতীয় প্রধান সংঘর্ষ) উগাণ্ডার সবচেয়ে বড় শত্রু। উগাণ্ডার সুবিধা ছিল যে সেখানে অধিকসংখ্যক ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানকার আভিজাত্যের ঐতিহ্য সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিভেদ উগাণ্ডাকে স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রে পরিণত হতে বাধা দিয়েছে।

১৯৫৯ সালের প্রথমদিকে উগাণ্ডা সংবিধানে পরিবর্তনের প্রস্তাবের জন্য এক বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হয়। বছরের শেষে কমিটির রিপোর্টে বলা হয়:

(ক) ১৯৬১ সালে নতুন আইনপরিষদের নির্বাচন। আইন পরিষদে

আফ্রিকানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে।

(খ) আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করবে। যদিও সে মন্ত্রিসভায় পদাধিকার বলে কয়েকজন সরকারী কর্মচারীও স্থান পাবেন, তবু নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা (অর্থাৎ কার্যতঃ আফ্রিকান) থাকবে অনেক বেশী।

(গ) কমিটির অধিকাংশ সদস্য প্রস্তাব করেন যে মন্ত্রিসভা আইন পরিষদের কাছে সামগ্রিকভাবে দায়িত্বশীল থাকবে। কিন্তু গভর্নরের হাতে কিছু বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হবে।

(ঘ) কমিটির মতে উগাণ্ডায় এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া উচিত।

বুগাণ্ডা সরকার (যা বরাবর পৃথক বাগাণ্ডা রাষ্ট্র দাবি করেছে) এই কমিটির আলাপ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে নি বরং সরকার থেকে দাবি করা হয় যে কমিটির প্রস্তাব বুগাণ্ডার প্রতি প্রযোজ্য হবে না এবং বৃটিশ সরকারের সঙ্গে 'আশ্রিত' রাজ্য স্থাপন সম্পর্কীয় চুক্তি (যার ফলে বুগাণ্ডা আইনতঃ বৃটিশ অধীনে আসে) বৃটেনের সম্মতি ব্যতিরেকেই বুগাণ্ডা বাতিল করতে পারবে।

উগাণ্ডা জাতীয় কংগ্রেস অবশ্য ওয়াইল্ড (সংবিধান কমিটির সভাপতির নাম) কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে।

বৃটিশ সরকার সার্বজনীন ভোটাধিকার সম্পর্কে ওয়াইল্ড কমিটির সুপারিশ অগ্রাহ্য করলেও, আগে যারা ভোটহীন ছিল এমন কিছু লোক এবার ভোটদানের অধিকার পেল। ১৯৬১-এর মার্চমাসে সাধারণ নির্বাচনের পর আইন পরিষদে নির্বাচিত বেসরকারী সদস্যেরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। বাগাণ্ডা নেতারা অবশ্য নির্বাচন বয়কটের আহ্বান জানান। ফলে অধিকাংশ বাগাণ্ডাই ভোটদানে বিরত থাকে। যারা দেয় তারা প্রধানতঃ শ্রীবেনেডিক্টো কিওয়ানুকার ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে সমর্থন করে। বুগাণ্ডার ২১টি আসনের মধ্যে মোট ২০টি দখল করে ডেমোক্র্যাটিক দল সারা উগাণ্ডায় মোট ৪৩টি আসন পায়। উগাণ্ডা পিপল্‌স কংগ্রেস অবশ্য ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে অনেক বেশী ভোট পায়, কিন্তু আসন দখল করে মাত্র ৩৫টি। অন্য দল উগাণ্ডা ন্যাশনাল কংগ্রেসের ২০ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র একজন জয়লাভ করে।

বাগাণ্ডাদের নির্বাচন বয়কটে ঐক্যবদ্ধ উগাণ্ডা বজায় রাখতে বুগাণ্ডার অনিচ্ছার প্রমাণ আর একবার পাওয়া গেল। বস্তুতঃ বাগাণ্ডা আইনসভা, 'লুকিকো', ১৯৬১ সালের প্রথমে বুগাণ্ডাকে পৃথকভাবে স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব করে। বলা বাহুল্য, এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় এবং বৃটিশ সরকার নিযুক্ত রিলেশনশিপস কমিটি নামে এক কমিটি উগাণ্ডার ভাবী সংবিধানিক কাঠামো রচনা ও বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের কার্যভার গ্রহণ করে।

১৯৬১ সালের মাঝামাঝি একটি সরকারী কমিশন উগাণ্ডার ভাবী সংবিধানিক কাঠামো সম্পর্কে সুপারিশ দেয়: উগাণ্ডায় একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার বুগাণ্ডার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং অন্য রাজ্যত্রয় তোরো, আঙ্কোলে ও বুনিয়োবোর সঙ্গে উপ-যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কে আবদ্ধ থাকবে। কিছুদিনের মধ্যেই কাবাকা ও অন্য বাগাণ্ডা নেতারা উগাণ্ডা জাতীয় পরিষদে বুগাণ্ডার প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্তে একমত হন।

সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সাংবিধানিক সম্মেলন উগাণ্ডার ভবিষ্যৎ শাসন কাঠামো সম্পর্কে সাধারণ মতৈক্যে পৌছায়। স্থির হয়, ১৯৬২ সালের মার্চে উগাণ্ডা স্বায়ত্তশাসন এবং অক্টোবর মাসে পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে।

ফেব্রুয়ারীর ২৩শে বুগাণ্ডার লুকিকোর নির্বাচনে কাবাকা ইয়েক্কা (শুধুমাত্র কাবাকা) নামক দলের কাছে প্রধানমন্ত্রী শ্রীবেনেডিক্টো কিওয়ানুকার ডেমোক্র্যাটিক পার্টি শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। এপ্রিলের সাধারণ নির্বাচনে শ্রীমিল্টন ওবোটে পরিচালিত উগাণ্ডা পিপল্‌স কংগ্রেস ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করলে শ্রী ওবোটে উগাণ্ডার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ওবোটের উগাণ্ডা পিপল্‌স কংগ্রেস বুগাণ্ডার সনাতন কাঠামো সংরক্ষণের পক্ষপাতী কাবাকা ইয়েক্কা দলের সহযোগিতায় এই নির্বাচনে নামে।

ওবোটের অনেক সমর্থক এই আঁতাঁত ভালো চোখে দেখে নি। তারা বলে এই সহযোগিতা বাগাণ্ডা স্বাতন্ত্র্যবাদী ও প্রাচীনপন্থীদের কাছে আত্ম-সমর্পণ। কিন্তু এর ফলে মিল্টন ওবোটের দল উগাণ্ডার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর (৯ই অক্টোবর, ১৯৬২) ক্ষমতাসীন হয়েছে। এবং পরবর্তী ঘটনাবলী সাক্ষ্য দেয় যে ওবোটে তাদের সঙ্গে আপস করেন নি। বস্তুতঃ ১৯৬৬ সালের বুগাণ্ডা ও কাবাকার সঙ্গে প্রকাশ্য শক্তিপরীক্ষায় ওবোটে নিজহস্তে সমস্ত সরকারী ক্ষমতা নিয়ে সংবিধান নাকচ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বুগাণ্ডা ও অন্যান্য রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব করা হয়। বাগাণ্ডা প্রাচীনপন্থীরা লুকিকো ও কাবাকার

(যিনি ইতিপূর্বে উগাণ্ডা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন) বিরোধিতা করলে, ওবোটে বুগাণ্ডায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। বাগাণ্ডা বিরোধিতা অস্ত্রবলে দমন করা হয় এবং কাবাকা দেশ ছেড়ে বৃটেনে পালিয়ে যান।

চার

নাইজেরিয়া স্বাধীন হবার পর ট্যাঙ্গানাইকা ছিল বৃহত্তম বৃটিশ শাসিত অঞ্চল এবং আয়তনে উগাণ্ডার প্রায় চারগুণ। কিন্তু কেনিয়া ও উগাণ্ডার প্রতিবেশী হয়ে ও ট্যাঙ্গানাইকায় রাজনৈতিক উদ্দামতা ও উত্তেজনা অনেক কম। আফ্রিকানদের রাজনৈতিক প্রগতি সুষ্ঠুভাবে ধাপে ধাপে এগিয়েছে। প্রায় ২৫,০০০ ইওরোপীয় এবং এক লক্ষের মত এশীয় ঔপনিবেশিক থাকা সত্ত্বেও বর্ণসমস্যায় এখানকার আবহাওয়া বিষিয়ে যায় নি। কিন্তু ট্যাঙ্গা-নাইকায় আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহার যে একেবারে চলে নি তা নয়। আফ্রিকানরা নানা অন্যায় ও অবিচারের শিকার হয়েছেন, তা আমরা এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে লক্ষ্য করেছি। তবু কেনিয়ার তুলনায় ট্যাঙ্গানাইকায় বর্ণবৈষম্য অনেক কম ছিল। কেনিয়ার মত অত জমি হস্তান্তর ট্যাঙ্গানাইকায় হয়নি। তাছাড়া ট্যাঙ্গানাইকা ছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে শাসিত অছি অঞ্চল। বৃটিশ শাসকের সমালোচনা করতে পারত আন্তর্জাতিক জনমতে। এখানকার অধিবাসীরা দরকার মাফিক বৃটিশ সরকারের কোন নীতি বা কাজের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের কাছে আবেদনের অধিকার ভোগ করত। এ ছাড়া প্রতি তিন বছর অন্তর অছি পরিষদ থেকে একটি করে তদন্তকারী দল ট্যাঙ্গানাইকা সফর করে গেছে। ১৯৫৪ সালে এমন এক সফরকারী দল তার রিপোর্টে প্রস্তাব করে যে ট্যাঙ্গানাইকাকে বিশ বছর বাদে স্বাধীনতা দেওয়া হোক। সে সময় বৃটিশ সরকার এই প্রস্তাবকে "উদ্ভট এবং চরমপন্থী" আখ্যা দেন। আজ মনে হয়, এ প্রস্তাব সত্যি 'উদ্ভট' কিন্তু বৃটিশ সরকার যে কারণে বলেছিল সে কারণে নয়। এ প্রস্তাবে সময় বড়ই বেশী চাওয়া হয়েছিল। এই রিপোর্ট প্রকাশ হবার পর সাত বছর যেতে না যেতেই ট্যাঙ্গানাইকায় ইংরেজ শাসন শেষ হয়েছে। অথচ ট্যাঙ্গানাইকার স্বায়ত্তশাসনের পথে যাত্রা শুরু হল মাত্র কয়েক বছর আগে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সে দেশের আইনপরিষদে এশীয় ও আফ্রিকানদের স্থান ছিল না। ১৯৪৮ সালে বেসরকারী এশীয় ও আফ্রিকান

সদস্যের সংখ্যা বেসরকারী ইওরোপীয় সদস্য সংখ্যার সমান করা হয়। ১৯৫৫ সালে এশীয় আফ্রিকান ও ইওরোপীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে সমসংখ্যক বেসরকারী সদস্য নিযুক্ত হলেন। তারপর ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জীর প্রস্তাবানুযায়ী ট্যাঙ্গানাইকায় আইনপরিষদের প্রতিনিধিদের মনোনয়ন না করে নির্বাচন করার ব্যবস্থা হয়।

১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। প্রতি কেন্দ্রে তিনটি আসন (আফ্রিকান এশীয় ও ইওরোপীয়দের জন্যে একটি করে সংরক্ষিত) এবং প্রতি নির্বাচকের তিনটি ভোট। এই নিয়মের ভিত্তিতে ১৯৫৮ সালের নির্বাচনে ট্যাঙ্গানাইকা আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন বা 'টানু' নামে খ্যাত রাজনৈতিক দল সমস্ত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে সব ক'টি আসন দখল করে। এর কয়েকমাস বাদে (ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯) অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নির্বাচনেও 'টানু' তার বিজয়গৌরব বজায় রাখে।

'টানু'র এই কৃতিত্ব ট্যাঙ্গানাইকার রাজনৈতিক জীবনে স্থায়িত্ব এনেছে। এর ফলে একদিকে রক্ষণশীল ইউনাইটেড ট্যাঙ্গানাইকার পার্টি কোণঠাসা হয়েছে, অন্যদিকে চরমপন্থী ট্যাঙ্গানাইকা আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে নি। ট্যাঙ্গানাইকার এশীয় ও ইওরোপীয় ঔপনিবেশকদের পক্ষে এ অবস্থা ভগবানের আশীর্বাদের মত। 'টানু'র জনপ্রিয় নেতা দূরদর্শী শ্রীজুলিয়াম নিয়েরেরে দেশে ইওরোপীয় ও এশীয় ঔপনিবেশিকরা যে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিতে পারে একথা বলেছেন।

১৯৫৯ সালের শেষে আইনপরিষদে আফ্রিকান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও মন্ত্রিসভায় বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রবর্তিত হল। পরের বছরের মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নিয়েরেরে প্রচলিত 'টানু' ৭১টি নিবাচিত আসনের মধ্যে ৭০টি দখল করে। এবং জুলিয়াস নিয়েরেরের নেতৃত্বে ইওরোপীয়, আফ্রিকান ও এশীয় সদস্যসহ এক নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৬১ সালের ৯ই ডিসেম্বর ট্যাঙ্গানাইকা স্বাধীনতা পায় ও পরের বছর প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়।

স্বাধীনতার পর ট্যাঙ্গানাইকা জাঞ্জিবারের মিলন হল এই দুইটি দেশের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জাঞ্জিবার স্বাধীনতা পায় ১৯৬৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর। আর ১৯৬৪ সালের ১২ই জানুয়ারী জাঞ্জিবারের আরব সুলতানের বিরুদ্ধে এক বামপন্থী বিপ্লব সংগঠিত হয়। সুলতান সপরিবারে

ইংল্যাণ্ডে পালান এবং জাঞ্জিবারে এক 'জনগণতান্ত্রিক' সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এপ্রিল মাসে ট্যাঙ্গানাইকা ও জাঞ্জিবার মিলিত হয় এক সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র গঠন করে, যার নাম পরে রাখা হয় টানজানিয়া।

পাঁচ

এই অধ্যায়ের প্রথমে আমরা উগাণ্ডা, কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানাইকার সমস্যা একসঙ্গে আলোচনার প্রয়োজনের কথা বলি। এরা সবাই প্রতিবেশী দেশ এবং এদের অধিবাসীরা প্রধানতঃ বান্টু। ইওরোপীয় ও এশীয় বাসিন্দাদের অবস্থিতি এদের সমস্যা অনুরূপভাবে জটিল করেছে। তাছাড়া বৃটিশ আমলে এদের নিয়ে পূর্ব আফ্রিকা হাই কমিশন গঠিত হয়েছিল,—যে হাই কমিশনের হাতে ছিল সমগ্র পূর্ব আফ্রিকার রেলপথ, বন্দর, মুদ্রা ব্যবস্থা প্রভৃতির পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান। একসময় অনেক পূর্ব আফ্রিকান নেতা এই দেশগুলি নিয়ে এক যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু এই তিনটি দেশ স্বাধীন হবার পর এখন পর্যন্ত প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রের কোন কার্যকরী ভিত্তি স্থাপিত হয় নি। বরং কয়েকটি ক্ষেত্রে এদের মধ্যে এতদিন ধরে যে সহযোগিতা চলছিল তার সমাপ্তি ঘটেছে (যথা সাধারণ মুদ্রা ব্যবস্থা)। নিকট ভবিষ্যতে পূর্ব আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ মধ্য আফ্রিকা

এক

রোডসের কেপ থেকে কায়রো পর্যন্ত বৃটিশ প্রভুত্ব বিস্তারের পরিকল্পনায় রোডেশিয়া, জাম্বিয়া ও মালাবির স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রোডেশিয়া (তৎকালীন দক্ষিণ রোডেশিয়া) বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানী কর্তৃক অধিকৃত হয়। এ দেশের মাতাবেলেল্যাণ্ডে খনিজ সম্পদ ছিল যথেষ্ট। মাতাবেলেদের রাজা লোবেঙ্গুলাকে নানাভাবে ভুলিয়ে ১৮৮৮ সালে খনিজ শিল্প উন্নয়নের অধিকার এই কোম্পানী পায়। সমগ্র এলাকায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মূল্য স্বরূপ লোবেঙ্গুলাকে মাসিক ১০০ পাউণ্ড আর এক হাজার রাইফেল ও একটি গানবোট দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। গানবোট অবশ্য কখনও এসে পৌঁছোয় নি। বরং ১৮৯৩ সালে লোবেঙ্গুলাকে তাঁর 'ক্রাল' থেকে বিতাড়িত করে সমস্ত দেশকে বৃটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা কোম্পানীর শাসনাধীনে আনা হয়। দক্ষিণ রোডেশিয়ার জলবায়ু ইওরোপীয় বসবাসের অনুকূল বলে এখানে অনেক ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক স্থায়ীভাবে বসতি করেছে। ১৯৬১ সালের হিসাবে প্রকাশ সমগ্র দক্ষিণ রোডেশিয়ার জনসংখ্যা ৩১,১১,০০০ এর মধ্যে ইওরোপীয়দের সংখ্যা ছিল ২,২৫,০০০, আফ্রিকানরা ২৮,৭০,০০০ এবং বাকীরা এশীয় ও বর্ণসঙ্কর। কিন্তু সংখ্যায় কম হলে কী হয়, ইওরোপীয় বাসিন্দারা দক্ষিণ রোডেশিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তা। ভোটাধিকার, আইনপরিষদ, আমলাতন্ত্র, বিচারবিভাগ এবং পুলিস ও সামরিক বিভাগে সংখ্যাধিক প্রতিনিধিত্ব আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব এ সবেই আমরা ইওরোপীয় আধিপত্যের পরিচয় পাই। শ্বেত প্রভুত্ব বজায় রাখা হয়েছে বৈষম্যমূলক আইন ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা। যেমন, আফ্রিকানদের মাথাপিছু শিক্ষার জন্য যা খরচ করা হয় তার বিশগুণ খরচ হয় ইওরোপীয়দের মাথাপিছু শিক্ষায়। সেরা সেরা জমি, যা হবে সমগ্র দেশের ৪৯% ইওরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত, যদিও তারা সমগ্র জনসংখ্যার ৭% এর মত। আর শহরাঞ্চলে তো আফ্রিকানদের জমি কেনার অধিকারই নেই। মোটকথা, ১৯২৩ সালে যে স্বায়ত্তশাসন দক্ষিণ রোডেশিয়াকে দেওয়া হয়েছে তার প্রায় একচেটিয়া

ফল ভোগ করে আসছে দেশের সমগ্র জনসংখ্যার এক দশমাংশেরও কম ইওরোপীয় সম্প্রদায়।

দক্ষিণ রোডেশিয়ার মত উত্তর রোডেশিয়া (জাম্বিয়া) বৃটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা কোম্পানী অধিকার করে। তবে এ দেশের উপজাতীয় প্রধানেরা রাণী ভিক্টোরিয়ার আশ্রয় চায়। এবং তারপর থেকে এ দেশটি বৃটিশ প্রোটেক-টোরেটে পরিণত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এখানে তাম্রোৎপাদন শুরু হয়। এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর বাজারে তামার দাম খুব বেড়ে যাওয়ায় উত্তর রোডেশিয়ার সমৃদ্ধি আরম্ভ হল।

এই তিনটি দেশের মধ্যে দরিদ্রতম হল নায়াসাল্যাণ্ড (মালাবি)। এর প্রধান অবলম্বন কৃষি। কিন্তু লোকবসতি ঘন এবং সম্পদ কম হওয়ায় এখান-কার অধিবাসীরা উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে পর্যন্ত কাজের খোঁজে যায়। যে কোন সময়ে দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের এক-তৃতীয়াংশ বাইরে থাকে। ১৯৫৯ সালের এক হিসাবে দেখা যায় এই তিনটি দেশের মাথাপিছু পাইকারী উৎপাদন ছিল: নায়াসাল্যাণ্ড ১৯ পাউণ্ড, উত্তর রোডেশিয়া ৮১ পাউণ্ড এবং দক্ষিণ রোডেশিয়া ৮৯ পাউণ্ড। অন্য দুটি দেশের মত মালাবিতেও বৃটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা কোম্পানীর আগমন ঘটে উনবিংশ শতকের শেষে। অবশ্য তার আগেই চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড এখানে মিশন স্থাপন করেছে। এই চার্চের উদ্যোগে দারিদ্র্য সত্ত্বেও নায়াসাল্যাণ্ডে বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ফলে উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়ার মতই এখানে শিক্ষা বিস্তৃত।

দুই

১৯৫১ সালেই প্রথম উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া এবং নায়াসাল্যাণ্ডকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব ওঠে। প্রস্তাবটি এই তিন দেশের সংখ্যালঘু ইওরোপীয় সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনন্দিত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর সুবিধার কথা ছেড়ে দিলেও ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকরা বোঝে যে বর্ধমান আফ্রিকান চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা সহজতর হবে যদি তিন দেশের ইওরোপীয়রা সংঘবদ্ধ হয়। তাই যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাটি বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে এলেও দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী স্যর গডফ্রে হাগিন্স ও উত্তর রোডেশিয়ার ইওরোপীয় নেতা রয় ওয়েলেনস্কি এর সমর্থনে দাঁড়ান।

আফ্রিকানরা কিন্তু প্রস্তাবটিকে সুনজরে দেখে নি। নায়াসাল্যাণ্ড ও উত্তর রোডেশিয়ার আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করে। নায়াসাল্যাণ্ডের অনেক উপজাতীয় প্রধানও যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতায় অন্য আফ্রিকানদের সমর্থন জানান। এবং বৃটিশ সরকারের কাছে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য আফ্রিকানদের তরফ থেকে বৃটেনে প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়।

কিন্তু আফ্রিকান প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ১৯৫৩ সালের গোড়ায় লণ্ডনে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের জন্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এতে যোগ দিলেন বৃটিশ সরকার ও পূর্বোক্ত তিনটি দেশের ইওরোপীয় প্রতিনিধিরা। কিন্তু উত্তর রোডেশিয়া ও নায়াসাল্যাণ্ডের কোন আফ্রিকান নেতা এই সম্মেলনে যোগদানে রাজী হন না। আর দক্ষিণ রোডেশিয়ার কোন আফ্রিকান প্রতিনিধি তো নিমন্ত্রিতই হন নি।

সম্মেলন থেকে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গৃহীত হয়। স্থির হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে থাকবে ৩৫ জন সদস্য—তার মধ্যে ২৯ জন ইওরোপীয় ও বাকী ৬ জন আফ্রিকান। আফ্রিকান প্রতিনিধিরা আবার আফ্রিকান জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন না। বস্তুতঃ পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের যেখানেই নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় সেখানেই ভোটাধিকার এমনভাবে সঙ্কুচিত করা হয়েছিল যাতে নির্বাচক তালিকায় ইওরোপীয়রা আফ্রিকানদের ছাড়িয়ে যায়। যাতে কোন আফ্রিকান স্বার্থবিরোধী আইন গৃহীত না হতে পারে সেজন্য সম্মেলন থেকে একটি আফ্রিকান অ্যাফেয়ার্স বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। স্থির হল এই বোর্ডে থাকবে তিনটি অঙ্গরাজ্যের গভর্নর কর্তৃক মনোনীত ৬ জন সদস্য। কোন আইন বা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আফ্রিকান স্বার্থবিরোধী বলে মনে হলে, বোর্ড তা পরীক্ষা করে দেখবে এবং বৃটিশ সরকারের কাছে তাদের বক্তব্য পেশ করবে।

১৯৫৩ সালের এপ্রিলে দক্ষিণ রোডেশীয় নির্বাচক মণ্ডলী অনেক ভোটাধিক্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য, এই সিদ্ধান্তে আফ্রিকানদের ভূমিকা খুবই নগণ্য কারণ এ দেশের ৫০,০০০ নির্বাচকের মধ্যে আফ্রিকানদের সংখ্যা ছিল ৫০০-এরও কম।

যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকান অধিবাসীরা কিন্তু অন্যভাবে তাদের বিরোধিতা জানাতে ছাড়ে নি। উত্তর রোডেশিয়ায় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। এতে অন্যান্য শ্রেণীর

পাশে এসে দাঁড়ায় সংগঠিত আফ্রিকান খনি শ্রমিকেরা। সরকারী দমননীতির ফলে এ দেশের প্রধান নেতাদ্বয় হ্যারী স্কম্বুলা ও কেনেথ কাউণ্ডা কারারুদ্ধ হন। পার্শ্ববর্তী নায়াসাল্যাণ্ডে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্রের অবসান ও নিজদেশের আইনপরিষদে জননির্বাচিত আফ্রিকান প্রতিনিধিত্বের দাবিতে দানা বাঁধে।

তিন

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পর নায়াসাল্যাণ্ডেই সর্বপ্রথম শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তিত হয়। নতুন বিধানে নির্ধারিত আফ্রিকান প্রতিনিধিদের নায়াসাল্যাণ্ড আইনপরিষদে স্থান দেওয়া হলেও প্রত্যক্ষ নির্ধারণ এবং আফ্রিকান-অনাফ্রিকান সমপ্রতিনিধিত্বের দাবি স্বীকৃত হয় নি। তাই এ সংস্কার জাতীয় আন্দোলনের আশা মেটাতে পারে নি। ইতিমধ্যে নায়াসাল্যাণ্ড আফ্রিকান কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এর যে দুজন সদস্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদের সদস্যপদ ত্যাগে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাদের বহিষ্কৃত করেছে। প্রধানতঃ যাঁর প্রচেষ্টায় কংগ্রেস এ পথ নিল তাঁর নাম ডক্টর হেস্টিংস কামুজু বাণ্ডা।

এখানে ডক্টর বাণ্ডার জীবনেতিহাস সংক্ষেপে বলা দরকার, কারণ নায়াসাল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাস এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ডক্টর বাণ্ডার জন্ম ১৯০২ সালে এক চাষী পরিবারে। যখন তাঁর বয়স ১৩ তখন তিনি ১০০০ মাইল হেঁটে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি দেন। সেখানে চাকরি করে টাকা জমিয়ে তিনি আমেরিকা যান। প্রথমে ওহাও ও পরে শিকাগোতে তিনি পড়াশোনা করেন। তারপর আমেরিকার টেনেসি ও বৃটেনের এডিনবারাতে ডাক্তারী পাস করেন। এরপর ইংল্যাণ্ডে ও ঘানায় ডাঃ বাণ্ডা চিকিৎসক হিসাবে পসার জমিয়ে তোলেন। মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তিনি বিদেশ থেকেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৫৮ সালে নায়াসা জাতীয়তাবাদী নেতা হেনরী চিপেম্বেরের অনুরোধে তিনি নায়াসাল্যাণ্ড ফিরলেন। সে বছরের ১লা আগস্ট ডঃ বাণ্ডা নায়াসাল্যাণ্ড আফ্রিকান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে দেশের সর্বত্র কংগ্রেসের প্রভাব বিস্তারে তৎপর হলেন। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে অসহযোগ আন্দোলনের

কর্মসূচী গ্রহণের জন্য কংগ্রেস এক জরুরী সভা সংগঠিত করে। মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ এতদিনে বিস্ফোরণের উপক্রম করছে এবং দেশের বিভিন্নাংশ থেকে শান্তিভঙ্গের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ৩রা মার্চ বৃটিশ সরকার নায়াসাল্যাণ্ডে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করল। ডক্টর বাণ্ডা সহ বহু জাতীয়তাবাদী নেতা কারারুদ্ধ হলেন। এক বছর বাদে তিনি মুক্তি পেলেন এবং নবগঠিত মালাবি কংগ্রেস পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। কিছু দিনের মধ্যে বৃটিশ সরকার নায়াসাল্যাণ্ড আইনপরিষদে আফ্রিকান সংখ্যাধিক্যের নীতি মেনে নেয়। ১৯৬১ সালের আগস্টে নতুন নির্বাচনে মালাবি কংগ্রেস পার্টি বিপুল ভোটাধিক্যে জেতে। আইনপরিষদের ৩৩টি আসনের মধ্যে পার্টির সদস্য বা সমর্থিত প্রার্থী ২৩টি আসন দখল করে। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক ইউনাইটেড ফেডারেল পার্টি মাত্র ৫টি আসন পায়। সে বছরের সেপ্টেম্বরে মালাবি কংগ্রেসের প্রার্থীরা কার্যনির্বাহী পরিষদের পাঁচটি নির্বাচিত পদে অধিষ্ঠিত হয়, বাকী পাঁচটি পান সরকারী কর্মচারীরা। ডক্টর বাণ্ডা প্রাকৃতিক সম্পদ ও স্থানীয় শাসন। এবং তাঁর সহকর্মী কানিয়ামা চিউমে শিক্ষা দপ্তরের ভার পেলেন। এইভাবে মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম আফ্রিকান সরকার গঠিত হল।

এরপর ডক্টর বাণ্ডার যুক্তরাষ্ট্র বিরোধিতা আর সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ১৯৬৩-এর মার্চে নায়াসাল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের অধিকার স্বীকৃতি পেল। এর আগেই নতুন এক সংবিধানে আরো শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মে মাসে নায়াসাল্যাণ্ড আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন পায়। এবং ১৯৬৪ সালের ৬ই জুলাই নায়াসাল্যাণ্ড মালাবি নামে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল।

নায়াসাল্যাণ্ডের আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস যেমন ডক্টর বাণ্ডার জীবন কাহিনীর সঙ্গে জড়িত; উত্তর রোডেশিয়ার স্বাধীনতাপ্রাপ্তি তেমনি শ্রীকেনেথ কাউণ্ডার নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে বিবর্ধিত হয়েছে। শ্রীকাউণ্ডার ১৯২৪ সালে জন্ম হয়। বড় হয়ে ইনি উত্তর রোডেশিয়া ও ট্যাঙ্গানাইকায় কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৯ সালে কাউণ্ডা আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিলেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। তখন সভাপতি হ্যারী স্কুম্বুলার পরই তাঁর স্থান। কিন্তু এরপর স্কুম্বুলার সঙ্গে তার মতবিরোধ শুরু হয়, যার পরিণতি কেনথ কাউণ্ডার নেতৃত্বে জাম্বিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস সংগঠনে।

ইতিমধ্যে উত্তর রোডেশিয়ার সংবিধানিক পরিবর্তনের কথাবার্তা চলছে। ১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৫৮ সালের শেষ পর্যন্ত এমন আলোচনা চলে এবং ১৯৫৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রস্তাব ঘোষিত হয়। এ প্রস্তাবের জটিল ধারা-উপধারার মধ্য দিয়ে যে জিনিসটি বেরিয়ে আসে তা হল এই: উত্তর রোডেশিয়ার নতুন আইনপরিষদে মোট ৩০ জন সদস্য থাকবে, যার মধ্যে ১৬ জন সদস্য উওরোপীয় ও ৬ জন সদস্য আফ্রিকার নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হবে, বাকী ৮ জন গভর্নর কর্তৃক মনোনীত হবে।

১৯৫৯ সালের বসন্তকালে নতুন আইনপরিষদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এতে অংশ নেয় ডোমিনিয়ান পার্টি যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর দল ইউনাইটেড ফেডারেল পার্টি হ্যারী ঙ্কুম্বুলার আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস এবং গার্ফিল্ড টড ও স্যর জন মোফাট পরিচালিত মধ্য আফ্রিকা পার্টি। কাউণ্ডার নেতৃত্বে জাম্বিয়া জাতীয় কংগ্রেস নতুন শাসনতন্ত্র ও নির্বাচন পদ্ধতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং নির্বাচন পুরোপুরি বয়কট করে। নির্বাচন বিরোধী আন্দোলন থেকে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয় এবং নির্বাচনের কিছু আগে গভর্নর জাম্বিয়া জাতীয় কংগ্রেস বেআইনী ঘোষণা করেন। কিন্তু যারা ভোটার হতে পারত এমন ২৫,০০০ আফ্রিকানদের মধ্যে মাত্র এক-চতুর্থাংশ নির্বাচক-তালিকায় নাম রেজিস্ট্রী করায় কেনেথ কাউণ্ডা ও তাঁর দলের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হল।

জাম্বিয়া জাতীয় কংগ্রেস বেআইনী ঘোষণার সময়ে কাউণ্ডাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি মুক্তি পেলেন। ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ জাম্বিয়া জাতীয় কংগ্রেসের পরিবর্তে ইউনাইটেড ন্যাশনাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টি বা সংযুক্ত জাতীয় স্বাধীনতা পার্টি গঠিত হয়েছে। কারামুক্ত কাউণ্ডা এ দলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন এবং বছর শেষ হবার আগে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলন ক্রমশঃ দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিস্ফোরিত হয় এবং কপারবেল্ট বা তাম্রএলাকায় সংযুক্ত জাতীয় স্বাধীনতা পার্টি বেআইনী ঘোষিত হল।

সে বছরের ডিসেম্বর মাসে কাউণ্ডা তাঁর দলের প্রতিনিধি হিসাবে লণ্ডন সংবিধান সম্মেলনে যোগ দেন। এ সম্মেলনে মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর রোডেশিয়ার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের সমস্যা আলোচিত হয়। ১৯৬১-

এর ফেব্রুয়ারীতে উত্তর রোডেশিয়ার জন্য নতুন এক সংবিধান ঘোষিত হল। এ সংবিধানে আইনপরিষদের গঠন ও নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে যেসব ব্যবস্থা করা হয় তাতে নতুন আইনপরিষদে আফ্রিকান-অনাফ্রিকান সমপ্রতিনিধিত্ব এমনকি আফ্রিকান সংখ্যাধিক্যের পর্যন্ত সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু এই সম্ভাবনায় আতঙ্কিত স্যর রয় ওয়েলেনস্কি লণ্ডনে গিয়ে রক্ষণশীল দলের নেতাদের সঙ্গে লবী করতে শুরু করলেন। ফলে জুনমাসে প্রস্তাবিত সংবিধান এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যাতে পূর্বোক্ত সম্ভাবনার আশা কম থাকে। ফলে উত্তর ও লুআপুলা প্রদেশে আবার বিক্ষোভ শুরু হল এবং কাউণ্ডার দল সেসব অঞ্চলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কাউণ্ডা দাবি করেন সংবিধান সংশোধন নাকচ করে ফেব্রুয়ারী প্রস্তাবে ফিরে যাওয়া হোক। ১৯৬২-এর ফেব্রুয়ারীর শেষে কাউণ্ডার দাবি অশতঃ মেনে নেওয়া হল। কয়েকদিন বাদে দলের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পর কাউণ্ডা জানান, তাঁর দল নতুন সংবিধান বর্জন করলেও পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। নির্বাচনে ওয়েলেনস্কির ইউনাইটেড ফেডারাল পার্টি ১৬টি, কাউণ্ডার ইউ. এন. আই. পি. ১৪টি এবং হ্যারী স্কুম্বুলার এ. এন. সি. ৭টি আসন পায়। শেষোক্ত দলদুটির মধ্যে গুরুতর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা মিলিত হয়ে প্রথম আফ্রিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠন করে (ডিসেম্বর, ১৯৬২)। ১৯৬৪-এর গোড়ায় আরও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। কাউণ্ডার দল নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করল এবং ১৯৬৪ সালের ২৪শে অক্টোবর উত্তর রোডেশিয়া জাম্বিয়া নাম ধারণ করে স্বাধীন হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে নায়াসাল্যাণ্ড ও উত্তর রোডেশিয়ার মত দক্ষিণ রোডেশিয়ায় আফ্রিকান রাজনৈতিক প্রগতি এত দ্রুত ও এত মসৃণপথে চলে নি। যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবার পর দক্ষিণ রোডেশিয়ার উদারনৈতিক প্রধানমন্ত্রী গারফিল্ড টড আফ্রিকানদের রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারণের প্রয়াস পান। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালের শেষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি স্যর রবার্ট ট্রেডগোল্ডের সভাপতিত্বে এক কমিশন গঠিত হল। সার্বজনীন ভোটাধিকার নাকচ করলেও ট্রেডগোল্ড রিপোর্ট আফ্রিকান ও ইওরোপীয় নির্বাচকদের জন্য এক ভোটার তালিকা ও যুক্ত ভোটদানের কথা বলে। স্বভাবতঃই এমন প্রস্তাব গৃহীত হলে দক্ষিণ রোডেশিয়ায় আফ্রিকানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেক বেড়ে যেত। এমন সময় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও বৃটিশ সরকার দুপক্ষ থেকেই চাপ আসে এবং

সুযোগ পেয়ে ডোমিনিয়ান পার্টি আর টডের নিজ পার্টি সংযুক্ত রোডেশীয় পার্টির রক্ষণশীল সদস্যরা টড-বিরোধী অভিযানে নেমে পড়ে। এমন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে গার্ফিল্ড টড তাঁর প্রস্তাবে কিছু রদবদল করেন। কিন্তু রক্ষণশীল জাতিবিদ্বেষীরা এতেও সন্তুষ্ট হয় নি। তাদের চক্রান্তে পড়ে শেষ পর্যন্ত গার্ফিল্ড টড প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন স্যর এডগার হোয়াইটহেড (ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮)। কয়েকমাস বাদে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে হোয়াইটহেডের দল, সংযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় দল, গার্ফিল্ড টড ও তাঁর পুনর্গঠিত দল সংযুক্ত রোডেশীয় দলকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে।

হোয়াইটহেড এবার দক্ষিণ রোডেশিয়ার আফ্রিকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করতে উদ্যোগী হলেন। ১৯৫৯-এর ফেব্রুয়ারীতে নায়াসাল্যাণ্ডের গোলযোগকে উপলক্ষ করে তিনি দক্ষিণ রোডেশিয়ায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেন। একই সঙ্গে দক্ষিণ রোডেশীয় আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস নিষিদ্ধ ও কয়েক শ' আফ্রিকান কারারুদ্ধ হয়। পরের বছর নবগঠিত জাতীয় গণতান্ত্রিক দলের অফিসে পুলিস হানা দেয় এবং কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করে। এই দমননীতির প্রতিবাদে সল্‌সবেরি ও বুলাওয়াথিও শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হলে পুলিসের গুলীচালনায় ১২জন আফ্রিকান নিহত হয় এবং পাঁচ শ'এর বেশী বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৬০-এর ডিসেম্বরে দক্ষিণ রোডেশিয়ার সংবিধান পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আহূত সম্মেলনের অধিবেশন বসে লণ্ডনে। তারপর কিছুদিন বন্ধ থাকার পর সম্মেলন আবার মিলিত হয় দু'মাস বাদে। এর প্রস্তাবাবলীর মধ্যে ছিল: দক্ষিণ রোডেশীয় আইনসভার সদস্যসংখ্যা ৩০ থেকে ৬৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং ১৫ জন সদস্যের মূলতঃ আফ্রিকান নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচন। ডোমিনিয়ন পার্টি ও জাতীয় গণতান্ত্রিক দল এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে, যদিও বিভিন্ন কারণে।

বৃটিশ সরকার নয়া প্রস্তাবটি জুলাই মাসে গণভোটে দেয়। গণভোটে অংশগ্রহণের অধিকার ছিল প্রধানতঃ ইওরোপীয় নির্বাচকদের। ৪১,৯৪৯ ভোট প্রস্তাবের পক্ষে এবং ২১,৮৪৬ বিপক্ষে যায়। গণভোটে জাতীয় গণতান্ত্রিক দল অংশ নেয় নি। বরং ভোটের দিন এই দলটি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় ও আফ্রিকান অধ্যুষিত এলাকায় এক বেসরকারী গণভোটের আয়োজন করে। এর ফল হয় নিম্নরূপ: প্রস্তাবের পক্ষে ৫৮৪ আর বিপক্ষে ৪,৬৭,০০০।

১৯৬১-এর শেষে হোয়াইটহেড জাতীয় গণতান্ত্রিক দলকে বেআইনী ঘোষণা করলে, এ দলের নেতা জোশুয়া ঙ্কোমো জিম্বাবোয়ে আফ্রিকান পিপল্‌স ইউনিয়ন (জেড. এ. পি. ইউ. বা 'জাপু') নামে এক নতুন দল গড়ে তুললেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যে এই দলটিও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে গোপনে কাজ চালাতে থাকে। ইতিমধ্যে জোশুয়া ঙ্কোমোর নেতৃত্বে অনেক আফ্রিকান আস্থা হারিয়েছে। এবং এরা ১৯৬৩ সালে রেভারেণ্ড নিটহোলের নেতৃত্বে জিম্বাবোয়ে আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন (জেড. এ. এন. ইউ বা 'জানু') গঠন করল।

১৯৬২ সালের নির্বাচনে হোয়াইটহেডের দলকে পরাজিত করে উইনস্টন ফীল্ড ও ইয়ান স্মিথের নেতৃত্বে এক চরম দক্ষিণপন্থী দল, রোডেশিয়ান ফ্রন্ট, ক্ষমতা পায়। এর পর থেকে এই দলটির নেতারা দক্ষিণ রোডেশিয়ার স্বাধীনতার দাবি তুলতে থাকেন। ১৯৬৪ এর প্রথমভাগে যখন উইনস্টন ফীল্ড এক পক্ষীয় স্বাধীনতার পথে এগোতে অস্বীকার করলেন, তখন তাঁকে সরিয়ে ইয়ান স্মিথ প্রধানমন্ত্রী হন।

এবার যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তন কোন পথে গেছে দেখা যাক। ১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এখানকার ইওরোপীয় নেতারা ক্রমশঃ আফ্রিকান রাজনৈতিক অধিকার সঙ্কোচনের প্রয়াস পেয়েছেন। ১৯৫৭ সালে নতুন এক আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে অনেক পরিবর্তন আনা হয়। প্রথমতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩৫ থেকে বাড়িয়ে ৫৯ করা হল। এর মধ্যে নির্বাচিত ইওরোপীয় সভ্য ২৬ থেকে ৪৪-এ বাড়ানো হয়। এই ৪৪ জনের ২৪ জন দক্ষিণ রোডেশিয়া, ১৪ জন উত্তর রোডেশিয়া এবং ৬ জন নায়াসাল্যাণ্ড থেকে নির্বাচিত হবে। অন্যদিকে আফ্রিকান সদস্য সংখ্যা ৬ থেকে ১২-তে পরিণত হল। এর মধ্যে ৪ জন দক্ষিণ রোডেশিয়ায়, ২ জন উত্তর বোডেশিযায় এবং ২ জন নায়াসাল্যাণ্ডে নির্বাচিত হবে বলে স্থির হয়। বাকী ৪ জন নায়াসাল্যাণ্ড ও উত্তর রোডেশিয়ার আফ্রিকান ইলেকটোর‍্যাল কলেজ কর্তৃক 'বিশেষভাবে নির্বাচিত' হবে। আফ্রিকান স্বার্থের তত্ত্বাবধায়ক ইওরোপীয় সদস্যসংখ্যা বদলায় না। আগের মতই ১ জন দক্ষিণ রোডেশিয়া থেকে নির্বাচিত, ১ জন উত্তর রোডেশিয়ার গভর্নর কর্তৃক মনোনীত ও অন্য জন নায়াসাল্যাণ্ডের গভর্নর কর্তৃক মনোনীত হবে। আইনপরিষদের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমন নির্বাচন পদ্ধতি গৃহীত হল যাতে আফ্রিকান

প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে ইওরোপীয় নিবাচকদের প্রভাব অনুভূত হয়। প্রাক্তন আইনপরিষদে ২৯ জন সদস্য ছিল পুরোপুরি ইওরোপীয়দের দ্বারা ও ৪ জন পুরোপুরি আফ্রিকানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং দুজন প্রাদেশিক গভর্নর কর্তৃক মনোনীত। নতুন আইনপরিষদে ৫৫ জন পুরোপুরি ইওরোপীয় নির্বাচক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে, ৪ জনের নির্বাচনে আফ্রিকান জনমত প্রতিফলিত হবে, দু'জন হবে প্রাদেশিক গভর্নর কর্তৃক মনোনীত, আর বাকী দুজন সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা শক্ত।

১৯৫৮ সালের যুক্তরাষ্ট্রীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু উত্তর রোডেশিয়া ও নায়াসাল্যাণ্ডের আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস এতে ভাগ নেয় নি। এবং এই বয়কটের ফলে উত্তর রোডেশিয়া ও নায়াসাল্যাণ্ডের বিশেষ নির্বাচক তালিকায় আফ্রিকান ভোটারদের সংখ্যা হয় যথাক্রমে ৫৩ ও ১১।

নির্বাচনে জিতে ওয়েলেনস্কি আফ্রিকান জাতীয়তা বাদী আন্দোলন দমনে বিশেষ তৎপরতা দেখান। এই সময় একাধিক বক্তৃতা ও বিবৃতিতে তিনি একদিকে নায়াসাল্যাণ্ড ও উত্তর রোডেশিয়ার যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের অধিকার দাবির নিন্দা করেন ও অন্যদিকে মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের ডোমিনিয়ান স্টেটাস এমন কি পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পক্ষে যুক্তি দেখান। ১৯৫৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে লর্ড মঙ্কটনের নেতৃত্বে এক কমিশন বসান হল। মঙ্কটন কমিশন যে কোন অঙ্গরাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রত্যাগের অধিকার স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব করলে, ওয়েলেনস্কি তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৬২ সালের মার্চে ওয়েলেনস্কির পরামর্শে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয় নির্বাচনে ইউনাইটেড ফেডারাল পার্টি আবার জয়লাভ করে, যদিও কোন আফ্রিকান পার্টি নির্বাচনে ভাগ নেয় নি।

১৯৬৩ সালকে যুক্তরাষ্ট্রের ভাগ্যনির্ধারণের বছর বলা হয়েছে। ততদিনে অন্য রাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের অধিকার মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। এবং এই স্বীকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও একে রোখবার ক্ষমতা ওয়েলেনস্কির ছিল না। ইতিমধ্যে নায়াসাল্যাণ্ডে ডক্টর বাণ্ডার শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং রোডেশিয়ায় কাউণ্ডা ন্কুমুলা আঁতাত মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। এমন কি দক্ষিণ রোডেশিয়াতেও ওয়েলেনস্কির দল বিরোধী পক্ষ রোডেশিয়ান ফ্রণ্টের কাছে পরাস্ত হয়েছে।

অতঃপর জুন-জুলাই মাসে ভিক্টোরিয়া ফল্‌স-এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রীয়

ব্যবস্থা বিলোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঠিক হয় যে ১৯৬৩-এর ৩১শে ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের অবসান ঘোষণা করা হবে।

চার

যুক্তরাষ্ট্রের অপমৃত্যুর পর দক্ষিণ রোডেশিয়ার (নতুন নাম রোডেশিয়া) ইওরোপীয় শাসকেরা স্বাধীনতার দাবি তুলেছেন এবং বৃটেন এ দাবি মেনে না নিলে একপাক্ষিক স্বাধীনতা ঘোষণার সম্ভাবনার কথা বার বার বলেছেন। এর উত্তরে বৃটিশ সরকারের মুখপাত্ররা হুমকি দিয়েছেন, যদি এমন কাজ করা হয় তবে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। এর মধ্যে রোডেশীয় প্রশ্ন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উত্থাপিত হয়েছে। এবং সাধারণ সভা ১৯৬২সাল থেকে রোডেশিয়ার তৎকালীন সংবিধান পরিবর্তনের কথা বলে আসছে। পরে একপাক্ষিক স্বাধীনতা ঘোষণার সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়ে এশীয় ও আফ্রিকান প্রতিনিধিরা রোডেশিয়ার প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদে তোলেন। নিরাপত্তা পরিষদ বৃটিশ সরকারকে একপাক্ষিক স্বাধীনতা ঘোষণার সম্ভাবনা রোধ করার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানায়। তা সত্ত্বেও ১৯৬৫ সালের ১১ই নভেম্বর ইয়ান স্মিথ রোডেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। এর প্রতিবাদে সারা এশিয়া ও আফ্রিকা ফেটে পড়ল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রদের স্মিথ-সরকারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে দিতে অনুরোধ জানাল। এবং ঘানা, টানজানিয়া প্রমুখ কয়েকটি আফ্রিকান রাষ্ট্র বৃটেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করল।

পঞ্চদশ অধ্যায় : দক্ষিণ আফ্রিকা

এক

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র অর্থনৈতিকভাবে যেমন উন্নত এর বর্ণসমস্যাও তেমনি জটিল। এই জটিলতার এক সূত্র আমাদের নিয়ে যাবে এর অতীত ইতিহাসে,—বুয়র-বৃটিশ ও বাণ্টু-বুয়র দ্বন্দ্বে যা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে এ দেশের অধিবাসীদের দিকে তাকালেও বর্ণসমস্যার তীব্রতার আর এক কারণ খুঁজে পাব। ১৯৫৭ সালের হিসাব মত দক্ষিণ আফ্রিকার লোকসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৬৭ হাজার। প্রধানতঃ চারটি জাতি বা 'রেইস' এ দেশে থাকে ; ইওরোপীয় (সমগ্র জনসংখ্যার ২০·৯%), এশীয় বা প্রধানতঃ ভারতীয় (৩·৩%), কালার্ড (কেপ মালয় সহ—৯·১%) ; এবং আফ্রিকান (৬৬·৭%)। ইওরোপীয়রা ভাষার ভিত্তিতে দুই ভাগে বিভক্ত ইংলিশ ও আফ্রিকানার। ইংলিশদের পূর্বপুরুষেরা অধিকাংশ এসেছে বৃটেন থেকে। তাদের মাতৃভাষা ইংরাজী। তারা আফ্রিকানারদের তুলনায় অধিকতর শহরবাসী। কৃষি ছাড়া শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যে তারা বেশী কর্মতৎপর। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইউনাইটেড পার্টি এদের মুখপাত্র। আফ্রিকানার বা বুয়ররা হল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় আসে ইংলিশদের অনেক আগে। দেশের অভ্যন্তরে এরা বড় বড় কৃষিক্ষেত্র নিয়ে বসতি করেছে। ন্যাশনালিস্ট পার্টি এদের স্বার্থসংরক্ষক। আফ্রিকানাররা ইংলিশদের চেয়ে সংখ্যায় কিছু বেশী। দেশের সর্বত্র এই দুই সম্প্রদায় ছড়িয়ে থাকলেও নাটালে ইংলিশদের সংখ্যাধিক্য (আফ্রিকানারদের সঙ্গে তুলনায়)। এই নাটালেই ভারতীয় বাসিন্দারা প্রধানতঃ বসবাস করছে। বলতে গেলে এক ডারবান শহরেই থাকে এদের ৫০% এর বেশী। কালার্ডরা হল বর্ণসঙ্কর। এদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে আছে বুশমেন, হটেনটট, ইওরোপীয়, এবং মালয় পশ্চিম আফ্রিকা মালাগাসী ও দক্ষিণ এশিয়া থেকে আনা ক্রীতদাস। কালার্ডদের ৮৯% বাস করে কেপ প্রদেশে এবং ৬০% এর মাতৃভাষা হল আফ্রিকান্স (আফ্রিকানারদের মাতৃভাষা)। অল্পসংখ্যক হটেনটট ও বুশম্যানদের বাদ দিলে আফ্রিকানরা সবাই বাণ্টু। এখানে প্রচলিত বাণ্টু ভাষাগুলি প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত

করা যায়: (১) জুনি ও (২) সোথো। অন্যান্য জাতির তুলনায় শহরবাসী আফ্রিকানদের শতকরা হার কম হলেও উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় আফ্রিকানরা শহরে বসবাস করছে। ১৯০৪ সালে আফ্রিকানদের মাত্র একদশমাংশ শহরে বাস করছিল, ১৯৫১ সালে এই অনুপাত বেড়ে হয় ২৭.১%। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ থাকে শহরের ইওরোপীয়াংশের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত 'লোকেশন' ও শ্যান্টি' শহরতলীতে। যে অবস্থায় এরা থাকে বর্ণসমস্যার তীব্রতার তা হল একটা বড় কারণ। শহরে ছাড়াও অনেক আফ্রিকান সাময়িকভাবে আছে ইওরোপীয়দের কৃষিক্ষেত্রে কৃষিশ্রমিক হিসাবে। বাকীরা থাকে আফ্রিকান রিজার্ভে।

দুই

১৯৪৮ সালে ন্যাশনালিস্ট পার্টির নির্বাচনে জয়লাভ দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নির্বাচনে জিতে এরা এদের বর্ণ-বিদ্বেষনীতি কার্যকর করতে সক্ষম হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে বর্ণবিদ্বেষ কোনও নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু ন্যাশনালিস্ট পার্টি বর্ণবিভেদীকরণ পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হল। এই উদ্দেশ্যে তারা যে নীতি গ্রহণ করে তার নাম অ্যাপার্থাইড বা পৃথকীকরণ। ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রেই বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা আজ পৃথক।

১৯৫৯ সালে প্রণীত বান্টু স্বায়ত্তশাসন আইনের বিধান অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তরপূর্ব অংশে আফ্রিকানদের বসবাসের জন্য বান্টুস্থান নামে খ্যাত কিছু অঞ্চল নির্দিষ্ট হয়েছে। সমস্ত দেশের আয়তনের ১৩% ভাগ মাত্র এর আয়তন। কিন্তু সমগ্র দেশের জনসংখ্যার ৬৬% লোককে (৯০ লক্ষ আফ্রিকানদের) এখানে থাকতে হবে। এই সব এলাকায় ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হবে এবং ভবিষ্যতে এরা স্বাধীনতা পাবে এমন প্রতিশ্রুতিও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতির বিরোধিতা এসেছে তাঁরই দলের অন্যান্য নেতার কাছ থেকে।

১৯৬৩ সালে ট্রান্সকাই অঞ্চলে প্রথম বান্টুস্থান প্রতিষ্ঠিত হলেও, সমস্ত বান্টুস্থানের প্রতিষ্ঠা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। তাই অন্তর্বর্তীকালে আফ্রিকানদের ইওরোপীয় নাগরিকদের থেকে পৃথক করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকান সরকার

কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। ১৯৫০ সালে এই উদ্দেশ্যে গ্রুপ এরিয়াস অ্যাক্ট পাস করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল এক শহরে বিভিন্ন জাতির লোকদের বাসস্থান ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় ও অঞ্চলে নির্দিষ্ট করা।

এছাড়া আফ্রিকানরা যাতে অবাধে শহরাঞ্চলে ভিড় না বাড়াতে পারে এ জন্য তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছে। শহরে আগমনেচ্ছুক আফ্রিকানের লাগে শনাক্তপত্র এবং যে শহরে সে যেতে চায় তার পৌর-সভার অনুমতি। এইসব বিধিনিষেধের মাধ্যমে যেসব জায়গায় সস্তা অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন নেই, সেখানে গ্রাম থেকে আসা আফ্রিকানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়।

অ্যাপার্থাইডের অন্যতম উদ্দেশ্য হল মিশ্রবিবাহ বন্ধ করা। অবশ্য আফ্রিকান ও ইওরোপীয়দের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য এত বেশী যে এ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিবাহাদি প্রায় হয় নি বললেই চলে। ন্যাশনালিস্ট পার্টি কিন্তু আরও পাকাপাকি ব্যবস্থার পক্ষপাতী। ১৯৪৯ সালে তাঁরা আইন করে ইওরোপীয় ও অন্যদের মধ্যে মিশ্রবিবাহ রোধ করে। পরের বছরের এক নতুন আইনে এদের মধ্যে কোন রকমের যৌনসম্পর্ক স্থাপন বেআইনী হল। এইসব আইনের একটা অসুবিধা কোন লোকের সঠিক জাতিবর্ণ নির্ণয়। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার ১৯৫০ সালের পপুলেশন রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের বিভিন্ন ধারায় প্রতিটি নাগরিকের জাতি-বর্ণ রেজিস্ট্রীভুক্ত করার ব্যবস্থা করেন।

শ্বেত ও কৃষ্ণকায়দের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য শুরু করা হয়েছে আরও অনেক আগে। ১৯১১ সালে মাইন্‌স অ্যাণ্ড ওয়ার্কস অ্যাক্টে অশ্বেতকায়রা ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটে সবরকমের দক্ষ ও প্রায়-দক্ষ জীবিকা থেকে পুরোপুরিভাবে বঞ্চিত হয়। ১৯১৩ সালে ল্যাণ্ড অ্যাক্ট আফ্রিকানদের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের (রিজার্ভ) বাইরে সমস্ত জমি থেকে উচ্ছেদ করে। যে কোনও সভ্য দেশের শ্রমিকেরা যে সমস্ত অধিকার পায়, দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় শ্রমিকেরা তা থেকে বঞ্চিত। আফ্রিকান ট্রেড ইউনিয়নগুলির কোনও আইনগত স্বীকৃতি নেই। আবার ১৯৫৬ সালের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্যনসিলিয়েশন অ্যাক্ট অনুযায়ী শ্বেত ও কৃষ্ণকায়দের যৌথভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনও আইনবিরোধী। অন্যদিকে নেটিভ লেবার অ্যাক্ট আফ্রিকানদের সব রকম ধর্মঘট নিষিদ্ধ করেছে। কোন আফ্রিকান যদি তার প্রভুর আদেশ

পালন না করে তবে তাকে ফৌজদারী মামলায় সোপর্দ করা যায়। এ ছাড়া ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল ক্যনসিলিয়েশন অ্যাক্ট শ্রমমন্ত্রীকে কোন্ কোন্ জাতির শ্রমিকেরা কোন্ কোন্ কাজ করতে পারবে তা নির্দিষ্ট করে দেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

শ্রমিকদের জীবনে বর্ণবৈষম্য ও কোণঠাসা নীতির প্রতিক্রিয়া বিচার করতে হলে শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের আয়ের বৈষম্য লক্ষ্য করতে হয়। সোশ্যাল সেকিওরিটি কমিটির এক রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৪১-৪২ সালে একজন ইওরোপীয় শ্রমিকের গড়পড়তা আয় ছিল একজন কালার্ড (বর্ণসঙ্কর) শ্রমিকের পাঁচগুণ ও একজন আফ্রিকান শ্রমিকের সাড়ে বারগুণ।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সব বিদ্যালয়ই বর্ণ অনুযায়ী বিভক্ত। কেপটাউন ও উইটওয়াটার্সর‍্যাণ্ড এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন পর্যন্ত কোন বর্ণবৈষম্য ছিল না। কিন্তু ১৯৫৯ সালে ইউনিভার্সিটি এডুকেশন অ্যাক্টকে সংশোধন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অশ্বেতকায়দের ধীরে ধীরে সরাতে হবে এবং আফ্রিকানদের জন্য তিনটি, ভারতীয়দের জন্য একটি আর অন্যান্য অশ্বেতাঙ্গদের জন্য একটি কলেজ খোলা হবে।

যানবাহন, ডাকঘর, হোটেল-রেস্তোরাঁ, পার্ক থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতিতে যাতে বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা পরস্পরের সংস্পর্শে আসতে না পারে এজন্য ১৯৫৩ সালে সেপারেট অ্যামেনিটিজ অ্যাক্ট পাস করা হয়। এক এক সময় আইনটির প্রয়োগ এমনভাবে করা হয়েছে যাতে যে কোন সভ্য দেশের লোক লজ্জায় সঙ্কুচিত হবে। যথা দক্ষিণ আফ্রিকার বিমান কোম্পানীর কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ভারতীয় ও আফ্রিকান যাত্রীরা বিমানের যেসব আসন ব্যবহার করেন সেইসব আসনকে ব্যবহারের পর বীজাণুমুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে ধোলাই করতে হবে।

অ্যাপার্থাইড নীতির ফলে অশ্বেতাঙ্গদের সবরকম রাজনৈতিক অধিকার নষ্ট হয়েছে। নাটাল প্রদেশে আইনতঃ আফ্রিকানরা সাধারণ নির্বাচক তালিকায় নাম ওঠাবার অধিকার রাখে। কিন্তু ১৯৪৬ সালে শেষ আফ্রিকান ভোটারের মৃত্যুর পর আর কোন আফ্রিকান ভোটারের নাম সাধারণ নির্বাচক তালিকায় যুক্ত হয় নি। অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট ও ট্রান্সভালে কোন আফ্রিকান ভোটার নেই। কেপ প্রদেশ এক্ষেত্রে খানিকটা উদার ছিল। কিছুদিন আগে পর্যন্ত কেপ প্রদেশে প্রায় চার হাজার আফ্রিকান পুরুষ ভোটার পৃথকভাবে

তিনজন ইওরোপীয় প্রতিনিধিকে আফ্রিকান স্বার্থসংরক্ষণে পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষে নির্বাচন করে পাঠাত। এছাড়া সারা দেশের আফ্রিকানরা পরোক্ষভাবে ৪ জন ইওরোপীয়কে সিনেটে নির্বাচন করত। কিন্তু ১৯৫৯ সালের বাণ্টু স্বায়ত্তশাসন আইনে এমন ব্যবস্থা রহিত হল।

১৯৫৬ সালে কেপ প্রদেশের কালার্ড ভোটাররা (যারা এতদিন ইওরোপীয় ভোটারদের সঙ্গে একসঙ্গে ভোট দিত) এক পৃথক নির্বাচক তালিকায় স্থান পেল। এদের প্রতিনিধিদেরও ইওরোপীয় হওয়া চাই।

এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার আইনসভা পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গ সদস্য নিয়ে গঠিত। এমনকি প্রাদেশিক পরিষদ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনেও ইওরোপীয় নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ। অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট ও ট্রান্সভালে অশ্বেতকায়দের পৌরশাসনে কোন অধিকার নেই। নাটাল অবশ্য কালার্ড ভোটারদের ইওরোপীয় ভোটারদের সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলেছে, কিন্তু আফ্রিকান ও এশীয়দের ভোটাধিকার দেয় নি। কেপ প্রদেশে আইনতঃ এশীয় ও আফ্রিকাসহ অশ্বেতকায়রা পৌরসভার নির্বাচনে ভোটদান এবং পৌরপরিষদে নির্বাচিত হতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ খুব অল্পসংখ্যক আফ্রিকানই ভোটার হতে পেরেছে।

বিচার ও কার্যনির্বাহী বিভাগ তথা আমলাতন্ত্র আর সামরিক ও পুলিস বাহিনীতে উচ্চ পদ প্রায় সমস্তই ইওরোপীয়রা দখল করে আছে। কয়েক বছর আগে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয় যে তখন পর্যন্ত এমন কি আফ্রিকান এলাকাতেও কোন আফ্রিকান ম্যাজিস্ট্রেট কি সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয় নি।

একদিকে দেশের চার-পঞ্চমাংশ অধিবাসীদের ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করে রাখা এবং অন্যদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের ফলে সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে যাকে দমিয়ে রাখার জন্য সরকারী উৎপীড়নের মাত্রাকে ক্রমশঃই বাড়িয়ে যেতে হচ্ছে। ১৯৫৩ সালে যে কোন সময় জরুরী অবস্থা ঘোষণার অবাধ অধিকার সরকার হাতে নিয়েছে। তারও আগে ১৯৫০ সালে সাম্যবাদ দমন আইন পাস করা হয়। এবং যে কোন লোককে শুধুমাত্র 'কম্যুনিস্ট' আখ্যা দিয়ে মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা সরকার পায়। এই আইনের প্রয়োগে বহু আফ্রিকান ও এশীয় নেতাকে সরকার জনসভায় যোগ দিতে পর্যন্ত নিষেধ

করেছে। এদের মধ্যে ছিলেন নোবেল পুরস্কার পাওয়া আফ্রিকান নেতা শ্রী অ্যালবার্ট লুঠুলি এবং এখনও আছেন ভারতীয় নেতা ডক্টর নাইকার।

তিন

দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্য অশ্বেতকায় সম্প্রদায়ের মত ভারতীয় বংশোদ্ভুতরাও বর্ণবৈষম্য নীতির শিকার হচ্ছে। কিন্তু তাদের সমস্যার বিশেষ একটি দিক আছে। সেটি হল এই সমস্ত ইওরোপীয় পার্টিই মনে করে যে ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার কোন অধিকার নেই। বস্তুতঃ ভারতীয় বিদ্বেষ শুধুমাত্র আফ্রিকানদের বৈশিষ্ট্য নয়। নাটাল মূলতঃ ইংলিশ অথচ ভারতীয় বিদ্বেষ এখানেই সবচেয়ে বেশী। তেমনি আজ যারা বিরোধী পক্ষ সেই ইউনাইটেড পার্টি বৈষম্যমূলক এশিয়াটিক ল্যাণ্ড টেনিউয়্যার অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান রেপ্রেসেণ্টেশ্যন অ্যাক্ট পাস করে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে। একভাবে লেবার পার্টির সদস্যরাও ভারতীয় বিরোধী ব্যবস্থায় সরকারকে সমর্থন করে এসেছে।

বর্তমানে অন্যান্য অশ্বেতকায় সম্প্রদায়ের চেয়ে ভারতীয়দের অবস্থা আরো খারাপ এই জন্য যে তাদের পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণে কোন অধিকার নেই। ট্রান্সভাল প্রদেশে এশীয়দের কোন কালেই ভোটাধিকার ছিল না। আর অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটে তো সমস্ত অশ্বেতাঙ্গই ভোটাধিকারে বঞ্চিত। নাটালেও ধাপে ধাপে ভারতীয়দের সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ১৮৯৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন, ১৯২৪ সালে জিলা নির্বাচন এবং ১৯২৫ সালে পৌরনির্বাচনের অধিকার তারা হারায়। ১৯৪৬ সালে প্রণীত এশিয়াটিক ল্যাণ্ড টেনিউয়্যার অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান রেপ্রেসেণ্টেশ্যন অ্যাক্ট পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষে ৩জন ও সেনেটে ৪জন ইওরোপীয় প্রতিনিধি পৃথকভাবে প্রেরণের অধিকার ভারতীয়দের দিতে চায়। কিন্তু ভারতীয় বাসিন্দারা এতে অসম্মত হন। ১৯৪৮ সালে ন্যাশনালিস্ট পার্টি নির্বাচনে জিতে পূর্বোক্ত আইনের নির্বাচনসংক্রান্ত শর্তগুলি নাকচ করায় বর্তমানে ভারতীয় বাসিন্দাদের কোন প্রতিনিধি পার্লামেণ্টে নেই।

ভারতীয় বাসিন্দাদের সম্পর্কে সরকারী নীতির লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে কিছুদিন আগে জনৈক ন্যাশনালিস্ট মন্ত্রী ডক্টর ডঙ্গেস বলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতীয়দের সংখ্যা নিম্নতম অঙ্কে নামিয়ে আনাই আমাদের উদ্দেশ্য।" এর প্রয়োজনে ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের

জন্য সরকার যে বোনাস দেন তার পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত মাত্র ৩০ জন ভারতীয় বাসিন্দা দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে ভারতবর্ষে এসেছে। ভারতীয়দের অধিকাংশই আজ তিন-চার পুরুষ ধরে দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করছে। তাদের বেশীর ভাগ ভারতবর্ষ কখনো দেখে নি। অনেকে ভারতীয় ভাষায় কথা বলতে পর্যন্ত পারে না। এমন লোকদের ভারতীয় আখ্যা দিয়ে ভারতবর্ষে পাঠানোর চেষ্টা হাস্যকর।

ভারতীয় বাসিন্দাদের অনেক সময় সাধারণ নাগরিক অধিকারটুকুও দেওয়া হয় না। যেজন স্বাধীনভাবে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে যাতায়াত তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। ছুটি উপভোগে অন্য প্রদেশে যেতেও তাদের বিশেষ অনুমতি-পত্র লাগে। অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটে ভারতীয়দের ব্যবসায় ও চাষবাসের অধিকার নেই। ট্রান্সভাল সরকার ভারতীয়দের ব্যবসা করার লাইসেন্স দেয় না। এবং সে প্রদেশে ভারতীয়রা আইনতঃ কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। নাটালে এশীয়রা কেবলমাত্র কয়েকটি অঞ্চলেই সম্পত্তিভোগ করতে পারে এবং তাও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিশেষ অনুমতি নিয়ে। ভারতীয় সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে ১৯৫০ সালের গ্রুপ এরিয়াস অ্যাক্ট। এই আইন প্রয়োগ করে ১৮৫৩ সালে এক ডারবানেই সবসুদ্ধ কয়েক কোটি টাকা মূল্যের ভারতীয় সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া হয়েছে।

অনেকে বলেন ভারতীয়দের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ভয়ই হল ইওরোপীয়দের ভারতীয় বিদ্বেষের কারণ। কিন্তু এ থেকে এমন কথা মনে করলে ভুল হবে যে ভারতীয় বাসিন্দারা সকলেই ধনী। অল্পসংখ্যক ধনী ব্যবসায়ী থাকলেও অধিকাংশ ভারতীয় গরীব। ১৯৫১ সালে ডারবান শহরে ইওরোপীয়দের মাথাপিছু সম্পত্তি ছিল ৮৫৮ পাউণ্ড যেখানে ভারতীয়দের ছিল ১৬৭ পাউণ্ড। তেমনি ১৯৪৭ সালে নাটাল প্রদেশে ৫৩,০০০ অর্থোপার্জন-কারী ভারতীয়ের মধ্যে ৩০,০০০ জন বছরে ১০০ পাউণ্ডের কম রোজগার করত, আরও ১৬,০০০ জন করত ২০০ পাউণ্ডের কম।

দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যেখানে যেরকম সুবিধা সেইরকম যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। স্বদেশে তাঁরা বলেন, ভারতীয় বাসিন্দারা বিদেশী। আবার ভারতীয়দের ওপর তাঁদের ব্যবহার সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রশ্ন উঠলে তাঁরা যুক্তি দেন, ওটা তাঁদের ঘরোয়া ব্যাপার।

পূর্ণ অধিকারের জন্য ভারতীয়দের সংগ্রাম আফ্রিকানদের সমর্থন না পেলে

সফল হতে পারে না। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে এদের সম্পর্ক যে খুব নিকট তা নয়। বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিরাট ব্যবধানের জন্য এরা ঘনিষ্ঠভাবে মিলতে পারছে না। আকৃতিগত পার্থক্য এই সম্প্রদায় দুটির স্বতন্ত্রচেতনা প্রখর করেছে। তবু ইওরোপীয়দের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়ায় আফ্রিকান ও ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি আছে। এবং সুখের বিষয় সম্প্রতিকালে ভারতীয় ও আফ্রিকান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি মিলিত সংগ্রামের প্রয়োজন বুঝতে পেরেছেন।

চার

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণনীতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভেতরে ও বাইরে অনেক এশীয় ও আফ্রিকান দেশ কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে। ১৯৪৬ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জেনারেল অ্যাসেম্বলীর প্রথম অধিবেশনে ভারতবর্ষ এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। সেই থেকে প্রায় প্রতি বছরই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণনীতি আলোচিত হয়েছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ মেনে চলতে অনুরোধ জানান হয়েছে। অপর পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলে যে (১) তারা সনদ বিরোধী কিছু করে নি এবং (২) দক্ষিণ আফ্রিকার প্রজাদের সম্পর্কে আইন প্রণয়ন তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, সুতরাং সনদ অনুযায়ী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তাতে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণনীতির নিন্দামূলক প্রস্তাব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বার বার বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বর্ণনীতির পরিবর্তন এখনো ঘটানো যায় নি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণনীতির সবচেয়ে কঠোর সমালোচক হল আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলি। এই সব দেশগুলির সীমাবদ্ধ সামর্থ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তাদের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার ফলে এদের বিরোধিতা কখনই দক্ষিণ আফ্রিকাকে খুব দুর্বল করতে পারে নি। তবু প্যান-আফ্রিকান সভা ও অধিবেশনে, আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার (ও. এ. ইউ.) বিভিন্ন জমায়েতে সে দেশের বর্ণনীতি তীব্র আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। এইরকম সমালোচনা ও নিন্দার সম্মুখীন হয়ে ১৯৬১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

বর্ণনীতি ও ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহারের প্রশ্ন ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার শাসনের ব্যাপারেও দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা জার্মানীর উপনিবেশ ছিল। যুদ্ধের পর এই এলাকা ম্যাণ্ডেট প্রথায় শাসিত হতে থাকে। লীগ অফ নেশনসের মৃত্যুর পর দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছি পরিষদের হাতে এই অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করে নি। পক্ষান্তরে ১৯৪৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল স্মাটস এই দেশটি দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাবের পক্ষে তাঁর যুক্তি ছিল: (১) দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার আইন সভায় এই মর্মে সর্বসম্মিতিক্রমে প্রস্তাবগ্রহণ; এবং (২) স্থানীয় গণভোটের ফলাফল। স্মাটস সরকারের বিবৃতি অনুযায়ী উল্লিখিত গণভোটে দুই লক্ষাধিক লোক দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্তর্ভুক্তির পক্ষে ভোট দেয়। যেখানে তেত্রিশ হাজার লোক এর বিরুদ্ধে মত দেয়, এবং ছাপ্পান্ন হাজারের মত জানা যায় নি। আমরা অবশ্য জানি না, আফ্রিকানদের স্বাধীন মত প্রকাশের অনুকূল অবস্থার মধ্যে এই অনুসন্ধান হয়েছিল কিনা এবং এই বিষয়ের সমস্ত সম্ভাব্য ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া ভোটদাতারা অবগত ছিল কিনা। যাইহোক, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্মাটসের প্রস্তাব গ্রহণ করে নি। ১৯৪৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সম্বন্ধে বাৎসরিক বিবরণ পেশ করতে অস্বীকার করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার এই দেশটিকে দেওয়া হয়।

অচল অবস্থা নিরসনের জন্য এই বিরোধ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আদালতের মত জানতে চাওয়া হয়েছিল। ১৯৫০ সালে তার রায় বের হল: (ক) দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা এখন পর্যন্ত ১৯২০ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক ম্যাণ্ডেটের অধীন; (খ) দক্ষিণ আফ্রিকার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা অব্যাহত আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার শাসন তত্ত্বাবধানের ভার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ওপর পড়েছে। এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছে এই অঞ্চল শাসনের বাৎসরিক বিবরণী এবং অঞ্চলবাসীদের যে কোন আবেদন পেশ করতে বাধ্য; (গ) আইনতঃ এই অঞ্চলটিকে অছি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে দক্ষিণ আফ্রিকা বাধ্য নয়; (ঘ) অপরপক্ষে এর আন্তর্জাতিক চরিত্র পরিবর্তনের কোন একপক্ষীয় অধিকার দক্ষিণ আফ্রিকার

নেই। দক্ষিণ আফ্রিকা ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যৌথভাবে এ অধিকার রয়েছে।

আন্তর্জাতিক আদালতের রায় কার্যকরী করার জন্য জাতিপুঞ্জের তরফ থেকে অনেক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের অসহযোগিতায় তা ফলপ্রসূ হয় নি। কয়েক বছর ধরে প্রতিবাদ জাতিপুঞ্জের অধিবেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে রুটিন মাফিক প্রস্তাব পাস হয়েছে যে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে অছি ব্যবস্থার অধীনে আনা হোক এবং প্রতিবছর দক্ষিণ আফ্রিকা সরাসরি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।

১৯৬০ সালের শেষে ইথিওপিয়া ও লাইবেরিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে এই মর্মে অভিযোগ আনে যে অ্যাপার্থাইড নীতি দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় প্রয়োগের ফলে ম্যাণ্ডেটচুক্তি (যার মারফত জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সমান অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়া হয়) লঙ্ঘন করা হচ্ছে। বাদী দেশ দুটির মামলার বিষয়বস্তুতে কোন আইনগত অধিকার নেই এই যুক্তিতে আদালত পূর্বোক্ত অভিযোগ অগ্রাহ্য করে (জুলাই, ১৯৬৬)।

এদিকে ১৯৬৪ সালের শুরুতে ন্যাশনালিস্ট সরকার নিযুক্ত ওডেনডাল কমিশন দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক নতুন পরিকল্পনা এনেছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা এগার খণ্ডে বিভক্ত হবে। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত এবং আয়তনে বৃহত্তম অঞ্চল থাকবে ইওরোপীয়-দের জন্য নির্দিষ্ট। বাকী দশটি অঞ্চলের এক একটিতে এক একটি উপজাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার স্বীকৃত হবে। ১৯৬৭ সালের মার্চে দক্ষিণ আফ্রিকা পূর্বোক্ত দশটি অঞ্চলের একটিতে (ওভাম্বোল্যাণ্ডে) আংশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রবর্তনের প্রস্তাব এনেছে। অন্যদিকে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ভাবী শাসনব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে।

পাঁচ

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইওরোপীয় সরকারের বর্ণনীতি ও দমন অশ্বেতাঙ্গরা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয় নি। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের জন্মেরও আগে ১৮৮২ সালে কেপ প্রদেশে নেটিভ এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয় এবং ১৮৮৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি 'পাস ব্যবস্থার' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ১৯০৪

সালে নাটালে এবং ১৯০৭ সালে ট্রান্সভালে আফ্রিকানদের সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯১২ অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের রাজধানী ব্লুমফন্টেন শহরে সাউথ আফ্রিকান ন্যাশনাল নেটিভ কংগ্রেস স্থাপিত হয়। এর নামই পরে বদল করে রাখা হয় আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এ. এন. সি.)। এর স্থাপনে উপজাতীয় প্রধানেরা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে এবং শুরুতে এর নেতারা বৃটিশরাজের প্রতি আনুগত্যপ্রকাশে ভোলেন নি। এই সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ: (১) আফ্রিকানদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণ; (২) ইওরোপীয়দের সঙ্গে সমপর্যায়ে আফ্রিকানদের নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি; (৩) সর্বক্ষেত্রে আফ্রিকান প্রগতি ও একতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

১৯১৩ সালে প্রস্তাবিত ল্যাণ্ড অ্যাক্টের (যার মারফত আফ্রিকানরা তাদের রিজার্ভের বাইরে জমির মালিকানার অধিকার হারাল) বিরুদ্ধে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস তার প্রথম প্রতিবাদ সংগঠিত করল। তারপর ১৯৩৬ সালে যখন কেপ প্রদেশের ১১,০০০ আফ্রিকান ভোটারদের যৌথ নির্বাচক তালিকা থেকে অপসারণ করা হল তখন অনেক শিক্ষিত আফ্রিকান কংগ্রেসে যোগ দেয়।

১৯৪৬ সালে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস নেটিভ রেপ্রেসেণ্টেটিভ কাউন্সিল বয়কট শুরু করে। সেই বছরই ট্রান্সভাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস (নেতা ডক্টর দাদু) এবং নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের (নেতা ডক্টর নাইকার) আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, যৌথ সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সফল আলোচনা চালায়। এবং এইসব সংগঠনের উদ্যোগে বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করা হয়।

১৯৫৫ সালে ট্রান্সভালের ক্লিপ টাউনে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, সাউথ আফ্রিকান ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস, সাউথ আফ্রিকান কালার্ড পিপল্‌স কংগ্রেস, হোয়াইট কংগ্রেস অফ ডেমোক্র্যাটস এবং সাউথ আফ্রিকান কংগ্রেস অফ ট্রেড ইউনিয়ন্‌স মিলে স্বাধীনতা সনদ গ্রহণ করে। এই সনদে জাতি, ধর্ম ও বর্ণনির্বিশেষে সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীর সমান অধিকারের কথা ঘোষিত হয়।

আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রাণ ছিলেন চীফ অ্যালবার্ট জন লুঠুলি। লুঠুলি গান্ধীজীর মত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং তাঁর প্রভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিবাদ আন্দোলন বিক্ষুব্ধ বর্ণসংগ্রামে ফেটে পড়তে পারে

নি। তবে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করলেও সকলে তাঁর সংগ্রামের পথ বেছে নেয় নি। ১৯৫৭ সাল থেকে কিছু কিছু চরমপন্থী ক্রমশঃ সহিংস প্রতিরোধের পথ ধরে।

চরমপন্থীদের নেতা হলেন রবার্ট মাঙ্গালিসো সোবুকোয়ে। সোবুকোয়ে প্রথম প্রথম এ. এন. সি.র মধ্যেই 'আফ্রিকানিস্ট গোষ্ঠীর কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি এ. এন. সি. ছেড়ে দেন। এবং পরের বছর প্যান-আফ্রিকানিস্ট কংগ্রেসের (পি. এ. সি.) সভাপতি নির্বাচিত হলেন। প্যান-আফ্রিকানিস্ট কংগ্রেসে সামিল হয়েছিল এ. এন. সি.র চরমপন্থী সদস্যরা। এ. এন. সি.'র 'সংগ্রামবিমুখিতা' ও বহু জাতির সহযোগিতার নীতি এরা অগ্রাহ্য করে। এদের মতে দক্ষিণ আফ্রিকা তথা আফ্রিকা মহাদেশ শুধুমাত্র কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদের জন্য। ১৯৬০ সালের মার্চে এরা পাস-বিরোধী অভিযান আরম্ভ করে যা শার্পভিল ও কেপটাউনের রক্তাক্ত দাঙ্গায় পরিণত হয় এবং সোবুকোয়ে স্বয়ং কারারুদ্ধ হন।

ছয়

অর্থনৈতিক অবস্থা ও বর্ণনীতি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের এক গুরুতর সঙ্কটের পরিচায়ক। আফ্রিকানদের ৬০% ভাগ আজ দক্ষিণ আফ্রিকান অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে জড়িত। এদের প্রায় অর্ধেক থাকে ইওরোপীয় ফার্মে বাকীরা শহরাঞ্চলে। দক্ষিণ আফ্রিকান অর্থনীতি এদের ওপর এত নির্ভরশীল যে ন্যাশনালিস্ট সরকার আফ্রিকানদের ভৌগোলিকভাবে পুরোপুরি পৃথক করে দিতে পারে না। যে অবস্থায় আফ্রিকান রিজার্ভগুলিকে রাখা হয়েছে তা থেকে মনে হয় সরকার এদের উন্নয়নে খুব আগ্রহশীল হয়তো না হতেও পারে, কারণ এদের বৈষয়িক উন্নতি হলে এখান থেকে দলে দলে আফ্রিকান শ্রমিক ইওরোপীয় শিল্পে ও খেত-খামারে কাজ করতে আসবে না। অথচ আফ্রিকান শ্রমিকদের শহরে আগমন বাঞ্ছনীয় হলেও, এরা শহরগুলির স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়ুক এটা সরকার কিছুতে চাইতে পারে না। তাই আফ্রিকানদের নগরায়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য ন্যাশনালিস্ট সরকার বহুবিধ আইন করেছে।

এর মধ্যে কতকগুলি আইন নগরবাসী আফ্রিকানদের সংখ্যা বেঁধে

দিয়েছে বা তাদের নগরবাসকাল নির্ধারিত করেছে। অন্য কতকগুলির মারফত অস্থায়ী নগরবাসী আফ্রিকানদের জন্য শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। আর বাকীগুলিতে আফ্রিকানরা শহরে এসে যাতে ইওরোপীয়দের সমকক্ষ হয়ে উঠতে না পারে তার বন্দোবস্ত আছে। অস্থায়ী শ্রমব্যবস্থা শিল্পপরিচলনায় অপচয়ের সূচক। তবু বর্ণবিদ্বেষ ও সামাজিক পৃথকীকরণের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ইওরোপীয়রা এ অপচয় সহ্য করছে। বর্ণবিদ্বেষের অন্য মূল্যও তাদের দিতে হচ্ছে বহু মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা আর আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্থায়িত্বের অভাব। আর আছে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা। দেশাভ্যন্তরে অশ্বেতাঙ্গদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকার ইওরোপীয় সম্প্রদায় সমগ্র জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে।

ষোড়শ অধ্যায় : পর্তুগীজ আফ্রিকা

এক

আফ্রিকা মহাদেশে স্পেনের বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রায়তন উপনিবেশগুলি যদি আমরা না ধরি, তবে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের কথা বাইরের লোকে সবচেয়ে কম জানে। অন্যান্য অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বেশী হয়েছে, হয়েছে শিক্ষার বিস্তার, সুতরাং বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান কিছুটা চলেছে। এর ফলে, তাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কিছুটা আছে। আফ্রিকার পর্তুগীজ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না।

অথচ পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের ওপর আলোকপাত আজ যত প্রয়োজন, এমন আর কোনদিন ছিল না। আজ আফ্রিকার, শুধু আফ্রিকার কেন পৃথিবীর সবচেয়ে জবরদস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হচ্ছে পর্তুগাল। দুনিয়ার সর্বত্র সাম্রাজ্য-বাদ ধসে পড়ছে। আফ্রিকায় বিরাট ফরাসী সাম্রাজ্যের প্রায় কোন চিহ্ন নেই (ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড ছাড়া)। বৃটিশ অধীনস্থ অঞ্চলগুলিও একের পর এক মুক্ত হচ্ছে। এমন কি স্পেন তার অধীনস্থ কিছু অংশ মরক্কোর হাতে তুলে দিয়েছে। অটুট আছে শুধু পর্তুগীজ সাম্রাজ্য। পর্তুগাল অন্য সব শক্তির চেয়ে আগে আফ্রিকায় আসে। মনে হয়, অন্য সবার পরে সে বিদায় নেবে। পর্তুগালের সাম্রাজ্য আফ্রিকা ছাড়া অন্যত্রও কিছু কিছু ছড়িয়ে থাকলেও আফ্রিকাতেই তার প্রধান অংশ। এ মহাদেশে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যকে পাঁচ ভাগ ভাগ করা যায়: (ক) কেপ ভের্দে দ্বীপপুঞ্জ; (খ) পর্তুগীজ গিনি; (গ) সাও তোমে ও প্রিন্সিপ দ্বীপ; (ঘ) আঙ্গোলা ও (ঙ) মোজাম্বিক।

কেপ ভের্দে দ্বীপপুঞ্জে গোটা দশেক দ্বীপ আছে যাদের মোট আয়তন হবে ২,৫০৬ বর্গ মাইলের কিছু বেশী: পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগে পর্তুগীজ নাবিকেরা এই জনহীন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করে। পর্তুগাল থেকে লোক পাঠিয়ে এখানে বসতি স্থাপন করানো হয়। চাষের কাজে সাহায্যের জন্য গিনি উপকূল থেকে আসে গোলামের দল। আজ এর জনসংখ্যা ২ লক্ষের কাছাকাছি যার অর্ধেকের বেশী হল ইওরো-আফ্রিকান বর্ণসঙ্কর। বাকী লোকদের মধ্যে ৯০% হল নিগ্রো। খাঁটি পর্তুগীজদের সংখ্যা কয়েক হাজার

মাত্র। তবু আইনতঃ এ অঞ্চলের সব অধিবাসীকেই 'সভ্য' পদবাচ্য করা হয়েছে।

পর্তুগীজ গিনির আয়তন ২২,৫৫০ বর্গ মাইল এবং এর ৩ লক্ষ লোকের ৩-৪ হাজার ছাড়া সবাই নিগ্রো। নিগ্রো অধিবাসীদের আইনতঃ পর্তুগীজ ভাষায় নাম হল 'ইনদিজেনাস'—অর্থাৎ এরা 'সভ্য' নাগরিকদের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার পায় নি।

সাও তোমে ও প্রিন্সিপ দ্বীপদ্বয়কে খাঁটি 'বাগিচা উপনিবেশ' বলা যায়। এদের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হল কফি, কোকো ও তৈলবীজের বাগিচা। বাগিচায় কাজ করার জন্য আফ্রিকান ভূখণ্ড থেকে দাস আমদানী করা হয়। আজকের ৩০,০০০ নিগ্রো অধিবাসীরা হল সেই ক্রীতদাসদের বংশধর। এখন অবশ্য এদের নিজেদের স্বাধীন উপজীবিকা আছে, স্বাধীনভাবে চাষবাস, ব্যবসায় কিংবা মৎস্যশিকার। অতএব, বাগিচার শ্রমিক আনতে হয় আঙ্গোলা এমনকি পূর্ব উপকূলের মোজাম্বিক থেকে পর্যন্ত।

ব্রাজিল স্বাধীন হবার পর আঙ্গোলা হল পর্তুগালের বৃহত্তম উপনিবেশ: আয়তনে ১২,৪৬,৭০০ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৪১ লক্ষ যার মধ্যে ১ লক্ষের মত হল 'সভ্য' লোক।

আয়তনের দিক থেকে আঙ্গোলার পরই মোজাম্বিকের স্থান, যদিও মোজাম্বিকের লোকসংখ্যা আঙ্গোলার চেয়ে বেশী (মোট ৫৮ লক্ষ) মোজাম্বিকে প্রায় ৬০,০০০ 'সভ্য' নাগরিক আছে যার অর্ধেক হল ইওরোপীয়।

দুই

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে পর্তুগালের আফ্রিকা আবিষ্কার শুরু হয়। আরব বণিকদের হাত থেকে এশিয়ার বাণিজ্য ছিনিয়ে নেওয়া ও তার জন্য ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কার ছিল আফ্রিকা অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বভাবতঃ প্রথম প্রথম এশিয়ার জন্যই ছিল আফ্রিকার মূল্য। তাই আফ্রিকার প্রধান ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ ও স্থায়ী অধিকার স্থাপনের কাজ বিশেষ এগোয় নি। আফ্রিকার বিরাট উপকূল রেখার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি (যেমন নদীর মোহানা) ও সন্নিহিত কয়েকটি দ্বীপ দখল করে পর্তুগাল ক্ষান্ত ছিল। পরে অবশ্য আফ্রিকা 'নিজগুণে' তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। আফ্রিকার বুক থেকে ক্রীতদাস, হস্তিদন্ত আর স্বর্ণ রপ্তানী হতে থাকে। কিন্তু তার জন্যও মহাদেশের অভ্যন্তরে

অনুপ্রবেশের প্রয়োজন বিশেষ ছিল না। বলতে গেলে, মোজাম্বাকি ও আঙ্গোলার অভ্যন্তরে (উপকূল ভাগ বরাবরই পর্তুগীজ দখলে ছিল) পর্তুগালের অধিকার বিস্তৃত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। মোজাম্বিকে ১৮৯৫-৯৯ সালের, দক্ষিণ আঙ্গোলায় ১৯০৭-১৪ সালের ও গিনির ১৯২৬ সালের অভিযান অভ্যন্তরের স্বাধীন উপজাতি প্রধানদের পর্যুদস্ত করে। এর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয় ও শক্তিশালী শাসনযন্ত্রের পত্তন করা হয়।

বহুদিন ধরে পর্তুগালের ঔপনিবেশিক নীতির মূল কথা ছিল সরকারের নিম্নতম করণীয় কাজ হিসাবে একেবারে যা না করলে নয় তা করা। মোজাম্বিকের কথা ধরা যাক। সাম্প্রতিক কাল ছাড়া ইওরোপীয় উপনিবেশী-করণের কাজ খুব সামান্যই এগিয়েছে। সারা দেশে কৃষি ও শিল্পে স্থাণুত্ব ঘোচে নি। লাউরেন্সো, মারকোয়েস ও বেইরা বন্দরে আমদানী রপ্তানী প্রচুর সত্য কথা। কিন্তু তার বেশীর ভাগ রোডেশিয়া ও ট্রান্সভালের খাতিরে। প্রধানতঃ পূর্বোক্ত দুই দেশের বাণিজ্যের জন্য মোজাম্বিকে রেলপথ খোলা হয়েছে। মোজাম্বিকের মাটি ও জলবায়ু হরেক রকমের ফলনের উপযোগী (যথা, আখ, তুলা, সাইসাল, নারকেল, ভুট্টা প্রভৃতি)। কিন্তু বহুদিন যাবৎ এ দেশের চিনি ছাড়া অন্য কিছু উল্লেখযোগ্য উৎপাদন ছিল না। ইদানীংকালে অবশ্য তুলা, চীনা বাদাম, সাইসাল ও নারকেল ছোবড়ার উৎপাদন সম্প্রসারিত হয়েছে।

পর্তুগীজ সরকারের বেশী কিছু না করার নীতির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল মোজাম্বিক কোম্পানীর কনসেশন। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোম্পানীটি ৫২,০০০ বর্গমাইল জমির ওপর কনসেশন ভোগ করে এসেছে। এই বিরাট অঞ্চলে কোম্পানীর কাজ ছিল শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, শাসনও বটে।

মোজাম্বিকের মত আঙ্গোলায়ও উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভাব। এবং জলবায়ু অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও পর্তুগাল থেকে যথেষ্ট সংখ্যক ঔপনিবেশিক সেখানে বসতি করে নি।

আসল কথা, উপনিবেশকে অর্থনৈতিকভাবে কাজে লাগাতে গেলে যে ধরনের উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকা দরকার পর্তুগালের তা নেই। অন্য ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশের (ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম) তুলনায় পর্তুগীজ অর্থনীতি অনেক পেছিয়ে আছে। তার ফলে অনেক সময়

পর্তুগালের উপনিবেশ থেকে লাভ করেছে অন্য দেশ। যেমন, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগে জার্মানী। অবশ্য সে যুগেও শুল্ক ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের মারফত ঔপনিবেশিক পণ্য প্রথমে পর্তুগালে আনা হয়েছে এবং সেখান থেকে তাকে আবার অন্যদেশে রপ্তানী করা হয়েছে। এইভাবে পর্তুগাল তার সাম্রাজ্য থেকে কিছুটা বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করেছে মাত্র। কিন্তু উপনিবেশের কাঁচামালকে ভিত্তি করে নিজ দেশের শিল্প বিস্তার তার সাধ্যাতীত প্রমাণিত হয়েছে।

তিন

পর্তুগীজ আফ্রিকার অনেকাংশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে মস্ত বড় বাধা হল শ্রমিকের অভাব। আমরা আগে দেখেছি সাও তোমে ও প্রিন্সিপ দ্বীপে আঙ্গোলা ও মোজাম্বিক থেকে শ্রমিক চালান করতে হয়। কিন্তু আঙ্গোলার নিজের লোকসংখ্যা মাত্র ৪০ লক্ষ। এই দেশের বিভিন্ন প্রদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব উল্লেখ করলে বোঝা যাবে এখানে শ্রমিক-সমস্যা কত তীব্র—কাবিন্দা: প্রতি বর্গমাইলে ৬ থেকে ৭; কঙ্গো: ৪-৫, মালাঙ্গে: ২-৩; বেঙ্গুয়েলা: ৮-৯; হুইলা: ২-৩; বিহে: ১-২। মোজাম্বিকের লোকসংখ্যার ঘনত্ব আরো বেশী, কিন্তু যথেষ্ট নয়।

বাগিচা, রেলপথ ও অন্যত্র যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক সরবরাহের জন্য পর্তুগীজ সরকার বাধ্যতামূলক শ্রম প্রথা প্রবর্তন করেছে বলে অভিযোগ শোনা যায়। ১৯০৫ সালে আমেরিকার হার্পার্স ম্যাগাজিন নেভিনসন নামে এক বৃটিশ সাংবাদিককে পর্তুগীজ আফ্রিকায় দাসত্ব সম্পর্কে তদন্ত করতে পাঠায়। ফিরে এসে নেভিনসন 'আধুনিক দাসত্ব' (এ মডার্ন স্লেভারি) নামে এক বই লেখেন। এর তিন বছর বাদে আরো দু'জন লেখক এ সম্বন্ধে আরো দু'খানা বই প্রকাশ করেন। এই সব লেখকদের রচনা থেকে যে কথাগুলো বেরিয়ে আসে তা হল এই:

পর্তুগালের 'কোকোদ্বীপ' সাও তোমে ও প্রিন্সিপের বাগিচায় কাজ করার জন্য অনেক শ্রমিক স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে আসে না। যে পদ্ধতিতে তাদের সংগ্রহ করা হয় তার সঙ্গে যেভাবে পূর্বে ক্রীতদাস সংগ্রহ করা হত তার বিশেষ পার্থক্য নেই। এমন কি কোন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিককে কখনও তার নিজের দেশে পাঠানো হয়েছে কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এর পর পর্তুগীজ সরকার আঙ্গোলা ও মোজাম্বিকে বাধ্যতামূলক শ্রম সাধারণভাবে বেআইনী করে। 'সাধারণভাবে' বলা হচ্ছে এই জন্য যে এ সব আইন পাস হবার পরেও অনেকে অভিযোগ করেছেন যে সরকারী ও বেসরকারী কাজের জন্য আঙ্গোলা ও মোজাম্বিকে যেভাবে শ্রমিক সংগ্রহ করা হয় তা প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিক সংগ্রহের সমান। শাসন কর্তৃপক্ষ থেকে অবশ্য জোর করে শ্রমিক সংগ্রহের কথা অস্বীকার করা হয়। কিন্তু ১৯৫৩ সালে ইউনাইটেড নেশনস অ্যাড হক কমিটি অন ফোর্সড লেবার (বাধ্যতামূলক শ্রম সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অ্যাড হক কমিটি) বলে যে, বাধ্যতামূলক শ্রম আইনতঃ নিষিদ্ধ হলেও আইনে এমন অনেক ফাঁক আছে যার মারফত লোকদের জোর করে কাজ করানো যায়। এই সব ফাঁক কেমনভাবে বাগিচা ও খনির মালিক ও সরকারের কাজে লাগে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ১৯৫৫ সালে হার্পার্স ম্যাগাজিন আবার উদ্যোগী হয়ে বেসিল ডেভিডসন নামে প্রখ্যাত এক ইংরেজ সাংবাদিককে আফ্রিকায় পাঠায়। ডেভিডসন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন 'দি আফ্রিকান অ্যাওয়েকনিং' বা 'আফ্রিকার জাগরণ' নামক গ্রন্থে।

বেসিল ডেভিডসনের মতে আঙ্গোলার সমগ্র অর্থনীতি নির্ভর করছে বাধ্যতামূলক শ্রমের ওপর এবং পঞ্চাশ বছর আগে যত গোলাম ছিল, আজ আছে তার চেয়ে বেশী। যে কোন তদন্তের সময় প্রতি সাবালক আফ্রিকান পুরুষকে প্রমাণ করতে হয় যে হয় সে কোন কাজ করছে কিংবা তদন্তের আগের বছর ছ'মাস ধরে সে কাজ করেছে। এর ব্যত্যয় হলে তাকে বাধ্যতামূলক শ্রমের জন্য পাঠানো হয়। যারা শ্রমিক চায় তারা গভর্নর জেনারেলের কাছে আবেদন করে। তখন স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 'কন্ত্রাতাদোস' বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক চেয়ে পাঠানো হয় (বেসিল ডেভিডসনের ভাষায় এই সব 'কন্ত্রাতাদোস' ক্রীতদাস ছাড়া অন্য কিছু নয়)। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তখন আবার উপজাতি প্রধানদের কাছ থেকে দরকারমত শ্রমিক চেয়ে পাঠান। নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের এক সংবাদদাতার ভাষায় "যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিক না পাওয়া যায়, তবে পুলিস পাঠিয়ে তাদের ধরে নিয়ে আসা হয়।"

স্বাধীন শ্রমিকদের অনুপাতে 'কন্ত্রাতাদোস'দের সংখ্যা যথেষ্ট হওয়ায় (নিদেন পক্ষে আঙ্গোলায়) অনেকে মনে করেন এই সব চুক্তিবদ্ধ বা

'কন্ত্রাতাদোস' শ্রমিকদের জোর করে চুক্তিতে স্বাক্ষর করানো হয়েছে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে আঙ্গোলায় যেখানে ৪,২০,০০০ ছিল 'ভলাতারিয়স' বা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত শ্রমিক, সেখানে 'কন্ত্রাতাদোস' বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩,৭৯,০০০। বেঙ্গুয়েলা রেলপথ কোম্পানীতে ১৯৫৩ সালে ১৭,৫০০ আফ্রিকান শ্রমিকদের মধ্যে ৭,০০০-এরও বেশী ছিল 'কন্ত্রাতাদোস'। আঙ্গোলা হীরক কোম্পানীর শ্রমিকদের এক-তৃতীয়াংশ ছিল চুক্তিবদ্ধ।

আঙ্গোলা সম্পর্কে বেসিল ডেভিডসন যা বলেছেন তার সমর্থন মেলে মোজাম্বিক সম্পর্কে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক মার্ভিন হ্যারিসের রচনায়। অধ্যাপক হ্যারিস বলেন যে পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকায় অর্থাৎ মোজাম্বিকে ধরে নেওয়া হয় যে সমস্ত আফ্রিকান পুরুষ হচ্ছে নিষ্কর্মা যদি না অবশ্য তারা এর বিপরীত কথা প্রমাণ করতে পারে। যারা চাকরি বা কর্মের প্রমাণ দিতে না পারে, এবং যদি তারা 'স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজে যোগ না দেয়', তবে তাদের ছ'মাসের জন্য সরকারী কাজে লাগানো যায়। জেলাশাসকের সাধারণ সিদ্ধান্তানুযায়ী যে কোন আফ্রিকানকে যে ব্যবস্থায় কাজ করতে হয় তাকে বলা হয় 'শিবালো' ব্যবস্থা। শ্রীহ্যারিসের মতে যে কোন বছরে মোজাম্বিকে প্রায় ১ লক্ষ 'শিবালোকে' চুক্তিবদ্ধ করে সরকারী ও বেসরকারী কাজে নামানো হয়।

অপরের বাগিচা বা অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে বাধ্য করা ছাড়া পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সরকার আঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের কৃষকদের সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী তুলা উৎপাদন করতে বাধ্য করেছে। মোজাম্বিকের বিস্তৃত অঞ্চল কয়েকটি কনশেসন ভোগী কোম্পানীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এবং প্রতি কনশেসন ভোগী কোম্পানী তার নিজের এলাকার আফ্রিকান চাষীদের নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা উৎপাদন করতে বাধ্য করেছে। এই স্বৈরাচারী ব্যবস্থা একশ' বছর আগেকার বাংলাদেশের নীলচাষের কথা মনে করিয়ে দেয়।

অনেকের ধারণায় মোজাম্বিক ও আঙ্গোলা থেকে যে বহু কৃষক দেশান্তর যাত্রা করেছে, তার একটা কারণ—এই বাধ্যতামূলক শ্রম সম্পর্কিত সরকারী আইনকানুনের কড়াকড়ি। প্রবাসীদের বেশীর ভাগ গেছে মালাবীর দক্ষিণ প্রদেশ, গাম্বিয়া ও ট্রান্সভালে। ১৯৩৩ সালে মালাবীতে ৪,০০,০০০ এর বেশী লোক ছিল ভিনদেশী। এর একটা বিরাট অংশ আসে মোজাম্বিক থেকে।

এমন হতে পারে, দেশান্তর যাত্রার হার তারপর থেকে কমে গেছে। ১৯৫৪ সালের এক হিসাবে প্রকাশ যে, প্রতি বছর ৭,০০০ জন আফ্রিকান মোজাম্বিক থেকে অন্যদেশে যায়, যদিও এদের মধ্যে অনেকের প্রবাসকাল হয় স্বল্পস্থায়ী। 'কস্ত্রাতাদোস প্রথার জনৈক সমালোচকের মতে আঙ্গোলা থেকে যত লোক দেশান্তরগামী হয়েছে, সব জড়িয়ে তাদের সংখ্যা হবে ১০ লক্ষ।

পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য চিরকাল বলে আসছেন যে, জোর করে আফ্রিকানদের কাজ করানো হয় না। অন্যদিকে, যে কষ্টদায়ক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শ্রমিকেরা কাজ করে, সে কথা তারা স্বীকার করে। ১৯৪৭ সালে পর্তুগীজ সরকার ক্যাপ্টেন গালভাও নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সরেজমীন তদন্ত করতে পাঠায়। শ্রীগালভাও তাঁর রিপোর্টে পর্তুগীজ সরকারকে তীব্র সমালোচনা করেন। বোধ করি, পুরস্কার স্বরূপ ১৯৫৮ সালে গোপন বিচারের পর গালভাও ১৬ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

চার

পর্তুগালের একসময়কার ঔপনিবেশিক মন্ত্রী অধ্যাপক মার্সেলো কেতানোর মতে এ যুগের পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসন চারটি মৌলিক নীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে: (ক) অর্থনৈতিক সংহতি; (খ) মানসিক সমীকরণ; (গ) শাসনতান্ত্রিক বিশেষীকরণ ও (ঘ) রাজনৈতিক ঐক্য।

পর্তুগাল ও তার উপনিবেশগুলি (সংবিধানের ভাষায় সাগরপারের প্রদেশসমূহ) অর্থনৈতিকভাবে একটি সন্নিবদ্ধ একক গঠন করে। শুল্কনীতি ও বাণিজ্যিক বাধানিষেধের ফলে বিদেশজাত পণ্যের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের পণ্যকে অধিকতর সুবিধা দেওয়া হয়। পর্তুগীজ সংবিধানের ১৫৮ ধারায় বলা হয়েছে: "সাগরপারের প্রদেশগুলির (অর্থাৎ উপনিবেশগুলির) অর্থনীতিক সংগঠন পর্তুগীজ জাতির সাধারণ অর্থনীতির অংশ বলে গণ্য হবে এবং এইভাবে তারা পৃথিবীর অর্থনীতিতে স্থান গ্রহণ করবে।"

মানসিক সমীকরণের মূলকথা হল খৃষ্টধর্মের ক্যাথলিক মতবাদ (পর্তুগালে প্রায় সবাই ক্যাথলিক) এবং পর্তুগীজ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচার। মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র ধর্মপ্রচারে লিপ্ত নয়। সংবিধানের ১৪০ ধারা তাদের "শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান এবং সভ্যতা প্রচারের যন্ত্র" হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

'মানসিক সমীকরণের' আর একটি উপায়, 'আসিমিলাদো' ব্যবস্থা, আমরা একটু পরেই আলোচনা করব।

পর্তুগালের সাম্রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগরে তিমর থেকে শুরু করে আটলান্টিকের সাও তোমে পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এই বিস্তৃত অঞ্চলে সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন রকমের আইনকানুন ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়েছে। এইখানে হল শাসনতান্ত্রিক বিশেষীকরণের তাৎপর্য।

পঞ্চদশ শতকে সাম্রাজ্যবিস্তার থেকে শুরু করে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ বরাবর পর্তুগাল ও উপনিবেশসমূহের রাজনৈতিক ঐক্যের কথা বলে আসছেন। তবে এই শতাব্দীর প্রথমদিকে একটি বিপরীতমুখী ধারা লক্ষ্য করা যায়। ১৯০৭ সালে মোজাম্বিককে এক রাজকীয় সনদ দেওয়া হয়—যা থেকে মনে হয়, শেষ পর্যন্ত এই দেশটিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার কল্পনা যে কর্তৃপক্ষের মনে একেবারে ছিল না, তা নয়। ১৯১০ সালে পর্তুগালে প্রজাতন্ত্রের পত্তনের পর উপনিবেশ শাসনের ভারের অনেকখানি যায় গভর্নরের কাছে এবং ঠিক হয়, গভর্নরকে পরামর্শ দেবে আংশিক নির্বাচিত আইনসভা। এমন কি আঙ্গোলাকে তার নিজের সনদ গ্রহণ অথবা বর্জন করার অধিকার পর্যন্ত দেওয়া হয়।

১৯২৬ সালে পর্তুগালে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে এই বিকেন্দ্রীকরণ নীতিরও মৃত্যু হয়। এর পর থেকে একাধিকবার ঘোষণা করা হয়েছে—উপনিবেশগুলি হল পর্তুগালের সাগরপারের প্রদেশ এবং ঔপনিবেশিক আইনপরিষদগুলির পরিবর্তে স্থাপিত হয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। ১৯৫১ সালে আইন পাস করে 'উপনিবেশ'-এর নতুন নামকরণ হয় 'সাগরপারের প্রদেশ' এবং অনুরূপভাবে ঔপনিবেশিক মন্ত্রিদপ্তরের নাম বদলিয়ে করা হয় 'সাগরপারের প্রদেশসমূহের মন্ত্রিদপ্তর'।

বর্তমান ব্যবস্থায় পর্তুগালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 'সাগরপারের প্রদেশের' অধিবাসীদেরও অংশগ্রহণের ক্ষমতা আছে। তার মানে এই নয় যে উপনিবেশের সমস্ত অধিবাসীরা রাষ্ট্রপতি ও আইনপরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। আসলে ইওরোপীয় অধিবাসীদের সঙ্গে কেবলমাত্র 'আসিমিলাদো'রা ভোট দেয়, যদিও গত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আসিমিলাদো নয় এমন কিছু 'অভিজাত' আফ্রিকানদের ভোট দিতে আহ্বান করা হয়। তেমনি পর্তুগালের আইনপরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার 'সাগরপারের প্রদেশগুলিকে' দেওয়া

হয়েছে আঙ্গোলা ও মোজাম্বিক ৩ জন করে, পর্তুগীজ গিনি ১ জন এবং সাও তোমে ও প্রিন্সিপ যুক্তভাবে ১ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করে। কিন্তু এই সব প্রতিনিধিদের যে আফ্রিকার বাসিন্দা হতে হবে এমন কোন কথা নেই। ১৯৫৬ সালে আঙ্গোলা-প্রেরিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন একজন আঙ্গোলা ব্যাঙ্কের পরিচালক ও অন্য একজন আঙ্গোলার পূর্বতন গভর্নর জেনারেল।

পর্তুগালস্থিত শাসনকর্তৃপক্ষের অধীনে কাজ করে বিভিন্ন উপনিবেশের স্থানীয় কর্মচারীবৃন্দ। আঙ্গোলা ও মোজাম্বিকে সর্বোচ্চ কর্মচারী গভর্নর জেনারেল। তার অধীনে আছে প্রাদেশিক শাসকেরা (আঙ্গোলা ছয়টি ও মোজাম্বিক চারটি প্রদেশে বিভক্ত)। প্রাদেশিক শাসকদের পরিচালনাধীনে জেলা শাসক, তার নীচে মহকুমা শাসক এবং তারও নীচে থানায় আছে থানা শাসকেরা। আফ্রিকান উপজাতি সম্পর্কিত ব্যাপার পরিচালনা ও পর্তুগীজ শাসকদের সঙ্গে আফ্রিকানদের যোগসাজস রক্ষার জন্য আছে 'রেগুলো' বা উপজাতি প্রধানেরা।

শিক্ষিত ও উপজাতি বন্ধনহীন আফ্রিকানরা সর্বত্র ইওরোপীয় শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেছে। তাই পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসনে এই শ্রেণীকে সরকারের পক্ষে টানার বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে। এবং অন্ততঃ কিছু পরিমাণে উপনিবেশের 'এলিট' পর্তুগীজ নাগরিকদের সমমর্যাদা ও অধিকার ভোগ করছে যে প্রথার মারফত তার নাম 'আসিমিলাদো' ব্যবস্থা।

পর্তুগালের আফ্রিকান উপনিবেশ সমূহে ইওরোপীয়রা সরাসরি 'পপুলাসাও সিভিলিজাদা' বা 'সভ্য' পর্যায়ে পড়ে। আফ্রিকান ও মিশ্রবর্ণসঙ্করর 'সভ্য' বলে গণ্য হবে যদি তারা কয়েকটি শর্ত পূর্ণ করে। প্রথম কথা, তাদের ইওরোপীয় জীবনযাত্রা গ্রহণ করতে হবে যার মানে হল বহুবিবাহের মত কয়েকটি প্রথা যা ইওরোপীয়রা পছন্দ করে না সেগুলি বর্জন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ তাদের পর্তুগীজ ভাষায় দক্ষ হতে হবে। তৃতীয়তঃ তাদের সম্মানজনক ব্যবসায়, পেশা বা চাকরি থাকা চাই যা তাদের অর্থনৈতিক যোগ্যতার পরিচয় দেবে। চতুর্থতঃ তাদের সামরিক শিক্ষাকাল সমাপ্ত করা দরকার।

এই সব শর্ত পূরণ হলে তারা 'আসিমিলাদো' পদবাচ্য হবে এবং তখন নিম্নলিখিত অধিকার তাদের আসবে : (অ) পাসপোর্ট পাবার অর্থাৎ বিদেশে যাবার অধিকার; (আ) সরকারী বিদ্যালয়ে তাদের শিশুরা বিনা খরচে

শিক্ষালাভ করতে পারবে ; (ই) ভোটাধিকার ; (ঈ) ইওরোপীয়দের জন্ত নির্ধারিত হারে কর দেবার অধিকার (অর্থাৎ আফ্রিকানদের জন্য যে বিশেষ 'জিজিয়া' কর আছে তার হাত থেকে মুক্তি মিলবে) ; (উ) খাস পর্তুগালের আইন প্রযোজ্য হবে (অর্থাৎ আফ্রিকান উপজাতীয় আইন আর 'আসিমি-লাদোদের প্রতি বলবৎ হবে না।

পূর্বোক্ত শর্তগুলি পরীক্ষা করলে বোঝা যায় কেন পর্তুগালের আফ্রিকান উপনিবেশে আফ্রিকান 'আসিমিলাদোর' সংখ্যা কম হতে বাধ্য। ১৯৫০ সালের হিসাবে দেখা যায়, মোজাম্বিকের ৫৮ লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে আফ্রিকান 'আসিমিলাদোর সংখ্যা কয়েক হাজার মাত্র। আঙ্গোলায় এর চেয়ে একটু ভাল অবস্থা। সেখানে ৪১ লক্ষ লোকের মধ্যে আফ্রিকান 'আসিমিলাদোর' সংখ্যা হল ৩০,০০০ এর কিছু বেশী। যেখানে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সীমাবদ্ধ সেখানে এ অবস্থা স্বাভাবিক। তাছাড়া সনাতন ধর্ম ছেড়ে সবাই 'আসিমিলাদো' পদবাচ্য হবার জন্য খৃষ্টান হতে না চাইতেও পারে। অতএব, সারা উপনিবেশের লোক 'আসিমিলাদো' হতে এখনও বহু দেরি।

পর্তুগীজ সরকার হয়তো তা চায়ও না। 'আসিমিলাদো' প্রথার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেসব শিক্ষিত আফ্রিকানরা স্থানীয় অধিবাসীদের বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বেধে ওঠাতে সাহায্য করার শক্তি রাখে তাদের দলে টানা। পর্তুগীজ নাগরিকের সমান পদমর্যাদা দিয়ে আসলে তাদের আফ্রিকান জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাওয়া হচ্ছে। অতএব, সবাইকে 'আসিমিলাদো' বানানোর কী মানে? তাছাড়া পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীকে 'আসিমিলাদো করিয়ে পর্তুগীজ নাগরিকদের সমান অধিকার ও সুবিধা দিলে তারাই যে পর্তুগাল শাসন করবে। (১৯৫৩ সালে খাস পর্তুগালের লোকসংখ্যা ছিল ৮৬ লক্ষের কিছু বেশী অর্থাৎ শুধুমাত্র আঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের আফ্রিকান অধিবাসীদের সংখ্যা তার চেয়ে বেশী)।

পাঁচ

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্থাণুত্ব, বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্নতা, বর্ণবিভেদের তীব্রতার অভাব, পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের অভাব এবং 'আসিমিলাদো' প্রথার ফলে পর্তুগীজ আফ্রিকায় রাজনৈতিক চেতনা

সম্প্রতিকাল পর্যন্ত দুর্বল ছিল। বিচ্ছিন্নভাবে যে আন্দোলন হয় নি তা নয়। ১৯৫৩ সালে এক সরকারী ঘোষণায় দ্বীপের সমস্ত অধিবাসীকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হতে আদেশ করার ফলে সাও তোমে দ্বীপে রক্তাক্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে ২০০ জন হতাহত হয় এবং পর্তুগীজ সরকার গভর্নরের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

একই বছরে আঙ্গোলায় কিছুটা রাজনৈতিক তৎপরতা লক্ষ করা যায় যখন 'উনিয়াও দোস পপুলাসাওম দি আঙ্গোলা' এবং 'মোভিমেন্তো পপুলার দি লিবেরটাসাও দি আঙ্গোলা' নামে দুটি রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপিত হয়। ১৯৫৯ সালে এই দুই সংগঠন অন্য কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে এক হয়ে 'পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আফ্রিকান বৈপ্লবিক ফ্রন্ট' গঠন করে যার মধ্যে সামিল হয় মোজাম্বিকের রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ ও গিনির (পর্তুগীজ) 'পার্তিদো আফ্রিকানো দি ইন্দিপেনসিয়া দি গিনে'।

১৯৬০ সালে সারা আফ্রিকায় প্রবল আলোড়ন বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন আঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের অধিবাসীদেরও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। এ ছাড়া গোয়ার মুক্তি আন্দোলন ও পর্তুগীজদের বিতাড়ন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা এবং খোদ পর্তুগালে সালাজার বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদির ফলে পর্তুগীজ আফ্রিকার অধিবাসীরা এক নতুন চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েছে।

১৯৬১ সালের মার্চ মাসে উত্তর আঙ্গোলার কফি বাগিচায় জাতীয়তাবাদী 'কমাণ্ডো' দল সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ ঘানা, গিনি ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে এই সংগ্রামে উস্কানি দেওয়া ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার অভিযোগ করে। কিন্তু 'স্বাধীনতার জন্য আঙ্গোলান বৈপ্লবিক ফ্রন্ট' যার নেতা হলেন জনৈক মুলাটো (বর্ণসঙ্কর) সাম্যবাদী, মারিও আন্দ্রাদে, গিনি প্রজাতন্ত্রে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করেছে। আঙ্গোলা থেকে ভৌগোলিক দূরত্ব ও আঙ্গোলায় এর অপ্রচুর সমর্থনের জন্য বর্তমান আন্দোলনে পূর্বোক্ত সংগঠন নেতৃত্ব দিচ্ছে এমন মনে হয় না।

আঙ্গোলার জাতীয় আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নাম আঙ্গোলান পিপল্‌স ইউনিয়ন যার প্রধান ঘাঁটি হল কঙ্গোর লেওপোল্ডভিলে। কঙ্গোর লেওপোল্ডভিল প্রদেশ ও আঙ্গোলার উত্তরাংশের অধিবাসীরা এক ভাষা ও কৌমের মধ্যে পড়ে। তা ছাড়া কঙ্গোয় প্রায় ৬০,০০০ আঙ্গোলার শ্রমিক

কর্মরত। এইসব কারণে অনেকে মনে করেন যে আঙ্গোলার 'গেরিলা কম্যাণ্ডো' দল কঙ্গোয় শিক্ষা পেয়েছে।

আঙ্গোলায় পর্তুগীজদের নৃশংস দমন ব্যবস্থা সভ্যতার সীমারেখা ছাড়িয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলন এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৬২-এর জানুয়ারী মাসের এক খবরে প্রকাশ, আঙ্গোলার বিপ্লবীরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আয়োজনরত।

দমননীতি বাদে সালাজার সরকার ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় কথঞ্চিৎ সংস্কার ঘোষণা করেছে। প্রথমতঃ স্থির হয়েছে, আঙ্গোলা ও মোজাম্বিকে হাজার হাজার পর্তুগীজ নাগরিকদের স্থায়ীভাবে বসতি করানো হবে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। তারপর, ১৯৬১ সালের আগস্ট মাসে পূর্বতন 'আসিমিলাদো' প্রথার অবসান এবং সাক্ষরতা ও ৩৫ টাকা কর দেবার ভিত্তিতে উপনিবেশের আফ্রিকানদের ভোটাধিকারসহ পূর্ণ নাগরিকত্বদানের কথাও ঘোষিত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, জাতীয় আন্দোলন এতে থামে নি। পর্তুগীজ বর্বরতার কথা বহু খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক বহির্বিশ্বে প্রচার করেছেন। এবং আঙ্গোলার প্রশ্ন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উত্থাপিত হয়েছে। ১৯৬১-এর জুন মাসে নিরাপত্তা পরিষদ পর্তুগীজ সরকারকে আঙ্গোলায় দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করতে নির্দেশ দেয়। পর্তুগাল এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। জুনের শেষে, জাতিপুঞ্জ নিয়োজিত পঞ্চশক্তি তদন্তকমিশন আঙ্গোলায় প্রবেশ লাভে ব্যর্থ হয়। এর কয়েক মাস বাদে নিরাপত্তা পরিষদের কাছে প্রেরিত রিপোর্টে কমিশন মন্তব্য করে, স্বায়ত্তশাসনের অব্যবহিত প্রস্তুতি না হলে, আঙ্গোলায় আরও রক্তপাতের সম্ভাবনা। ১৯৬২-এর ৩০শে জানুয়ারী জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত এক প্রস্তাবে আঙ্গোলানদের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকারের কথা ঘোষণা করে।

আঙ্গোলা ছাড়া, মোজাম্বিক ও পর্তুগীজ গিনিতেও জাতীয় আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মোজাম্বিকে উনিয়াও দেমোক্রাতিক নাসিওনাল দ্য মোসাম্বিক (বা 'উদেনামো') ১৯৬১ সালের মাঝামাঝি প্রকাশ্যে অস্ত্র সংগ্রহ ও বিদ্রোহের সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করে। এই দলটি বাদে মোজাম্বিক আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন (বা মানু) কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানাইকাস্থিত তাদের ঘাঁটি থেকে সংগ্রাম শুরুর কথা বলেছে। এই বছরের ৫ই ফেব্রুয়ারী আদ্দিস আবাবায় 'মানু'র জনৈক নেতা ১৯৬৩-এর মধ্যে মোজাম্বিকের

স্বাধীনতার দাবিতে জাতিপুঞ্জের কাছে প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

১৯৬২ সালের প্রথম ভাগে পশ্চিম আফ্রিকার পর্তুগীজ উপনিবেশ, গিনি থেকেও সশস্ত্র সংগ্রামের খবর পাওয়া গেছে।

ফলাফল যা-ই হোক না কেন, এইসব সংগ্রাম যেমন একদিকে পর্তুগীজ আফ্রিকার অধিবাসীদের সংগ্রামী রাজনৈতিক চেতনার অভিজ্ঞান, অন্যদিকে এর ফলে আবার অনুপক্রুত পর্তুগীজ উপনিবেশের অতিকথার বেলুন ফেঁসে গেছে। 'কোরাণ্টাইন' করে যেমন সংক্রামক রোগীর স্পর্শ থেকে অনাক্রান্ত লোকদের বাঁচানোর চেষ্টা হয়, তেমনি করে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীরা চেয়েছিল নিজ উপনিবেশের প্রজাদের বাইরের পৃথিবীর রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে। কিন্তু যে যুগে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহে পৃথিবীর মানুষ হানা দিচ্ছে, সে যুগে এই ধরনের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হবে তাতে সন্দেহ কী?

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা

এক

আফ্রিকার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আজকের নয়। বহু প্রাচীন কাল থেকে পশ্চিম-ভারতের লোকেরা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এসেছে। ভারতবর্ষ ও আফ্রিকাকে বিচ্ছিন্ন করেছে আরব সাগর, কিন্তু নিয়মিত মৌসুমী বায়ুর কল্যাণে এই ভৌগোলিক বাধা মোটেই দুরপনেয় নয়। প্রতি বছর শীতকালে নিয়ম করে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে মৌসুমী বায়ু বয়। সে হাওয়ায় পাল তুলে আরব সাগর পাড়ি দিয়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে পৌছোনো সহজ। তারপর বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে পাল্টা মৌসুমী হাওয়ায় জাহাজ চালিয়ে নাবিকেরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে ফিরে আসত। প্রকৃতির এই অবদান ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মধ্যে যোগাযোগ সহজসাধ্য করে। এর সুযোগ নিয়ে এ দেশের বণিকেরা বাণিজ্য চালাতেন পূর্ব উপকূলে ছড়ানো বন্দরগুলির সঙ্গে। এ লেনদেনে আফ্রিকা যোগান দিত হাতীর দাঁত, সোনা ও গোলাম। ভারত থেকে যেত অলঙ্কার, কাপড় ও অন্য নানা জিনিস। কবে থেকে এই বাণিজ্য শুরু হয়েছে বলা কঠিন। তবে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে তৈরি সাঁচীস্তূপে জাহাজের খোদাই করা ছবি দেখে অনুমান করা যায় বৌদ্ধযুগে ভারতে সাগর পাড়ি দেওয়া অজানা ছিল না। আনুমানিক ৮০ খৃষ্টাব্দে সংকলিত গ্রীক নাবিকদের নৌবাহ শিক্ষণ গ্রন্থে পূর্ব আফ্রিকার বন্দরে ভারতীয় জাহাজের যাতায়াতের উল্লেখ আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কো পোলো তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে ম্যাডাগাস্কার ও জাঞ্জিবারে ভারতীয় জাহাজের আগমনের কথা লেখেন।

হিন্দু লেখকেরা আফ্রিকা মহাদেশের ভূগোল সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। পুরাণে কৃষ্ণা নদীর (নীলনদ) কথা বলা হয়েছে, যে নদী চন্দ্রস্থানের বিশাল হ্রদের মধ্য দিয়ে প্রবহমানা। হিন্দু ভূগোলবিদদের সংগৃহীত তথ্য যাঁদের কাজে লেগেছে তার মধ্যে স্পেকের নাম উল্লেখযোগ্য। নীলনদের উৎস সন্ধানে এঁর অবদান অনেক।

আফ্রিকার ভূগোল সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদের এত জানাশোনা থেকে অনুমান করা যায় যে পূর্ব আফ্রিকায় ভারতীয় আগন্তুকেরা শুধুমাত্র উপকূল ও বন্দরগুলোতেই যাতায়াত করেন নি। মহাদেশের অভ্যন্তরেও তাঁরা কিছুটা অনুপ্রবেশ করেছিলেন। জাঞ্জিবারের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ইংগ্রাম্‌স এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ভারতীয়রা পূর্ব উপকূল থেকে অনেক ভিতরে গিয়ে হ্রদ অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে (ভিক্টোরিয়া, নায়াসা, ট্যাঙ্গানিকা, রুডল্‌ফ, অ্যালবার্ট) বাণিজ্য করতেন।

বলাবাহুল্য এ দেশ থেকে যাঁরা যেতেন তাঁরা প্রায় সকলেই সওদাগর ছিলেন। হিন্দুধর্ম প্রচারবাদী নয় বলে বিদেশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ-স্থাপনে ধর্মপ্রচারকদের ভূমিকা নগণ্য। এদেশের সংস্কৃতি আবার ধর্মের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ডোরে বাঁধা। তাই ধর্মের মত ভারতের সংস্কৃতিও আফ্রিকায় রপ্তানী হয় নি। ভারতের মত বিশাল উপ-মহাদেশে রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত, অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলে যুদ্ধোত্তর লুণ্ঠনের আকর্ষণ অনেক। তাই সাগর পেরিয়ে সৈন্য পাঠিয়ে আফ্রিকায় রাজ্য জয়ের চেষ্টা হিন্দু রাজারা করেন নি। এক কথায়, প্রাচীনকালে শুধু বাণিজ্য মারফত ভারতবর্ষ ও পূর্ব আফ্রিকার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। যদিও এ যোগাযোগ নিয়মিত, তবু এর প্রভাব ক্ষীণ এবং পরোক্ষ হতে বাধ্য ছিল।

দুই

অবস্থার পরিবর্তন ঘটল আফ্রিকায় ইওরোপীয় অনুপ্রবেশের পর। ইওরোপীয় অনুপ্রবেশকে ভারতীয় অনুপ্রবেশের ভূমিকা বলা চলে। ইওরোপীয় শাসকেরা নিজদের স্বার্থে স্ব স্ব অধিকৃত অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে লাগলেন। এছাড়া আধুনিক শাসন সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হল। ফলে সাধারণভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়তে লাগল এবং এর ফলে ভারতীয় বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য আরো সম্প্রসারিত হল।

তার ওপর অধিকৃত আফ্রিকায় শাসন চালানোর জন্য নানা কাজে অনেক লোকের দরকার হল, যাদের ইওরোপ থেকে আনা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই ভারতবর্ষ থেকে বহু লোককে চাকরি দিয়ে আনা হল। এমনভাবে যারা

গেছে, তারা অনেকে আর দেশে ফেরে নি। তাদের সন্তান-সন্ততিরা আজ আফ্রিকার বাসিন্দা।

শাসনকাজে কম মাইনের চাকরি ছাড়া ভারতীয়রা এসেছে কেনিয়া-উগাণ্ডা রেলপথ নির্মাণের কাজে আর দক্ষিণ আফ্রিকায় বাগিচার শ্রমিক হিসাবে। কেনিয়া-উগাণ্ডা রেলপথে একসময় প্রায় ১৮,০০০ শ্রমিক নিয়োজিত হয়েছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশ আসে পাঞ্জাব থেকে। চুক্তি শেষে এরা অনেকে রেলকর্মচারী কারিগর কিংবা ছোট ব্যবসায়ী হিসাবে আফ্রিকাতে রয়ে গেছে।

১৮৭৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার আখ বাগিচার মালিকদের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য ২০ বছর ধরে, বছরে ১০,০০০ পাউণ্ড খরচ করার ব্যবস্থা হল। ১৮৭৪ সাল থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যে ৩০,০০০ এর মত এশিয়ান শ্রমিক নাটালে আসেন। বহু ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ বা ইনডেঞ্চার্ড শ্রমিক সর্ত অনুযায়ী চুক্তিকাল শেষ হওয়ার পর ছোটখাট জমি নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস শুরু করেন। এমনি করে স্বাধীন ভারতীয় অধিবাসীদের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয় বাসিন্দাদের ভারতীয়-বিদ্বেষ ততই জোরালো হতে থাকে। ১৮৯১ সালে নাটাল সরকার চুক্তিমুক্ত ভারতীয় শ্রমিকদের জমি দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। তার ৪ বছর পরে নাটালে আইন করা হল যে ভারতীয় বাসিন্দারা প্রতি বছর ৩ পাউণ্ড দিয়ে সে দেশে বাস করার লাইসেন্স নিতে বাধ্য থাকবেন। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম হল ব্যবসায়ে নামতে গেলে এশিয়ান বাসিন্দাদের লাইসেন্স নিতে হবে। বোঝার ওপর শাকের আঁটি হিসাবে এল ১৯০৩ সালের নতুন ট্যাক্স। চুক্তিমুক্ত শ্রমিকদের সন্তানরা প্রাপ্ত বয়স্ক হলে মাথা পিছু ৩ পাউণ্ড করে কর দিতে হবে, এমনি আইন করা হল দক্ষিণ আফ্রিকায়। এই সব বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিক্রিয়া ভারতে পড়তে দেরি হয় নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ভারত সরকার ১৯১১ সালে ভারতবর্ষে শ্রমিক সংগ্রহের কাজ বন্ধ করে দেন।

এদেশ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন করে শ্রমিক পাঠানো বন্ধ হল। যাঁরা রয়ে গেলেন তাঁদের বিদায় করার জন্য একদিকে চালু রইল বৈষম্যমূলক আইন; অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার স্থির করলেন, যে সব চুক্তিমুক্ত শ্রমিক অনতিবিলম্বে দেশে ফিরে যাবেন তাঁদের জাহাজভাড়া রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে দেওয়া হবে। কিন্তু বিনা পয়সায় দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া

সত্ত্বেও বেশী লোক দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়ে নি। আর দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া আফ্রিকার অন্য দেশে রাহা খরচ দিয়ে ভারতীয় বাসিন্দাদের 'দেশে' পাঠাবার চেষ্টাই হয় নি। ফলে আজ সারা আফ্রিকায় ভারতীয় বাসিন্দাদের সংখ্যা প্রায় আট লক্ষ। হাওড়া শহরে যত লোক বাস করেন এক দক্ষিণ আফ্রিকায় তত ভারতীয় আছেন।

তিন

ভারতীয় বাসিন্দারা ছড়িয়ে আছেন পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে। এ সব দেশের এশীয় বাসিন্দাদের সংখ্যা এবং সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে তাঁরা শতকরা কতজন তার একটি হিসাব নীচে দেওয়া হল: কেনিয়া—১৭৪,০০০ (২% এর কিছু কম); ট্যাঙ্গানাইকা—৮৭,৩০০ (১% এর কম); জাঞ্জিবার—১৮,০০০ (৬.১%); উগাণ্ডা—৭১,৯৩৩ (১% এর কম); মালাবি—১৩,২০০ (.৩% এর কিছু বেশী), জাম্বিয়া ৮,৪০০ (.২%এর কিছু বেশী); রোডেশিয়া—৬,২০০ (.২%); মোজাম্বিক—১৫,২৩৫ (.২% এর কিছু বেশী); দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন—৪৭৭,৪১৪(৩%)। এ হিসাবগুলি সবই ৬ কি ৭ বছর আগেকার। এবং এখানে এশীয় বাসিন্দাদের সংখ্যা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ভারতীয় ছাড়া পাকিস্তানীরাও এর মধ্যে পড়ে, যদিও ভারতীয় বাসিন্দারাই হলেন সংখ্যাধিক।

উপরের হিসাব থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সংখ্যার বিচারে সবগুলি দেশেই ভারতীয়রা নগণ্য। কিন্তু সর্বত্র ভারতীয় বাসিন্দাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদের জনসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী। এর প্রধান কারণ তাদের অর্থ-নৈতিক ক্ষমতা। আজকের ভারতীয় বাসিন্দাদের পূর্বপুরুষদের বেশীর ভাগ এসেছিলেন 'কুলি' হয়ে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাঁরা নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল করেছেন, সম্পন্ন চাষী হয়েছেন, ব্যবসায়ী হয়েছেন। ১৯৫১ সালের এক হিসাবে অনুযায়ী, নাটালের সামগ্রিক আয় ১০ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে সেখানকার এশিয়ান (প্রধানতঃ ভারতীয়) বাসিন্দাদের বার্ষিক আয় ১ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ডের সমান। ১৯৪৬ সালে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় এশিয়ানদের হাতে প্রায় ১৫০,০০০ একর জমি ছিল। বছর পনের আগেকার হিসাবে দেখা যায়, ট্যাঙ্গানাইকার আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ ও রপ্তানী

বাণিজ্যের শতকরা ৬০ ভাগ এশিয়ান ব্যবসায়ীদের হাতে। সেখানকার ৫০,০০০ এশিয়ান বাসিন্দা ৪২০,০৫৮ একর জমির মালিক।

উগাণ্ডায় এশিয়ান বাসিন্দারা তুলার ব্যবসার বেশীর ভাগ নিয়ন্ত্রণ করেন। এ ছাড়া দুই বিরাট চিনির বাগিচা তাঁদের হাতে। ১৯২৮ সালে অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে দেশের শতকরা ৯০ ভাগ বাণিজ্যের মালিক হলেন এশীয় বাসিন্দারা, যাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন গুজরাট ও পশ্চিম-ভারতের ব্যবসায়ীরা।

কেনিয়ায় এশিয়ান বাসিন্দারা ব্যবসায় ছাড়া-ও কাজ নিয়েছেন অফিসে, দোকানে ও কলকারখানায়। ট্যাক্সেশন ইনক্যোয়ারী কমিটির হিসাব মত ১৯৪৪ সালে সারাদেশে পরোক্ষ কর বাবদ যত টাকা আদায় হয়েছিল তার ২৭৩/৪% আসে এশিয়ানদের কাছ থেকে, যেখানে ইউরোপীয় অধিবাসীরা দিয়েছিলেন ৩৭%। একাধিক সরকারী কমিটি কেনিয়ার অর্থনীতিতে এশিয়ান অধিবাসীদের মূল্যবান অবদানের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন।

জাঞ্জিবারে ভারতীয় সওদাগরেরা বহুদিন ধরে যাওয়া-আসা করছেন। ১৫০ বছর আগেও যে ভারতীয় বণিকরা জাঞ্জিবারের বাণিজ্যর বেশীর ভাগ নিয়ন্ত্রণ করাতন সে কথা ক্যাপ্টেন স্মীর বিবরণ থেকে জানতে পারা যায়। আজও জাঞ্জিবারের অর্থনৈতিক জীবনে এশিয়ান (প্রধানতঃ ভারতীয় ও পাকিস্তানী) ব্যবসায়ীরা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। কয়েক বছর আগেকার হিসাব অনুসারে জাঞ্জিবার রপ্তানীর ৯৮% ভাগ জিনিস বাজারে চালান দেওয়া ও বিক্রির কাজে এশিয়ান ব্যবসায়ীরা অগ্রণী এবং জাঞ্জিবার দ্বীপে এঁরা প্রায় ১০,০০০ একর জমির মালিক।

পর্তুগীজ উপনিবেশ মোজাম্বিকে ভারতীয়দের অবস্থা একটু অন্যরকম। ভারতীয়দের সেখানে দু'ভাগে ভাগ করা হয়: স্বাধীন ভারতের (পূর্বকার বৃটিশ ভারতের) বাসিন্দা আর ভূতপূর্ব পর্তুগীজ ভারতের বাসিন্দা (প্রধানতঃ গোয়ানীজ, কিছু সংখ্যক লোক দিউ থেকেও এসেছেন)। ভারতবর্ষের পূর্বতন পর্তুগীজ উপনিবেশ ছাড়া অন্য জায়গা থেকে আসা লোকদের মোজাম্বিকে বিশেষ আমল দেওয়া হয় না। ব্যবসায়েও লাইসেন্স বণ্টন ব্যাপরে তাঁদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এর ফলে ১৯৪০-৫০, এই দশ বছরে তাঁদের সংখ্যা ২০%কমে গেছে বলে প্রকাশ।

অন্যদিকে ভারতবর্ষের পূর্বতন পর্তুগীজ উপনিবেশ থেকে আসা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে মোজাম্বিকে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয় না। ফলে এঁদের সংখ্যা গত দুই দশকে ধীরে ধীরে বেড়েছে। এবং এঁদের শতকরা ৮০ ভাগ সরকারী কিংবা বেসরকারী দপ্তরে নানা ধরনের প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত। পক্ষান্তরে অন্য ভারতীয়দের এক বিরাট অংশ ব্যবসায়ী।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সত্ত্বেও পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার কোন দেশেই ভারতীয় বাসিন্দাদের জীবন নিরুপদ্রব ও সমস্যাহীন নয়। ওপরে যে সব দেশের কথা বলা হয়েছে তার সব গুলিতেই ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় বাসিন্দারা ইওরোপীয় বৈষম্যের শিকার হয়েছেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বৃটিশ শাসিত ট্যাঙ্গানাইকার হাসপাতাল, কয়েদখানা ও রেলপথে ইওরোপীয় ও ভারতীয়দের জন্য পৃথক ও অসম বন্দোবস্ত ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী স্কুলে এশীয় ছাত্রদের মাথা পিছু যত খরচ ১৯৫২ সালে করা হয়, ইওরোপীয় ছাত্রদের জন্য মাথা পিছু খরচ ছিল তার চেয়ে ৭ গুণেরও বেশী।

তেমনি কেনিয়ায় জলবায়ু ও উর্বরতার বিচারে সবচেয়ে লোভনীয় অঞ্চলে (পূর্বনাম শ্বেত মালভূমি বা হোয়াইট হাইল্যাণ্ডস) ঔপনিবেশিক যুগে আফ্রিকান ও ভারতীয় বাসিন্দাদের জমি কেনার অধিকার ছিল না। এছাড়া ১৯১২ সাল থেকে কেনিয়া সরকার শহর অঞ্চলের কতকগুলি এলাকায় ভারতীয় ও আফ্রিকানদের জমির মালিকানার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আসছে। ১৯৪৯ সালে বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকার তিনটি দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে এশীয়দের আগমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যদিও এমন কোন আইন ইওরোপীয়দের সম্পর্কে করা হয় নি।

পূর্ব আফ্রিকার মত মধ্য আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও বৃটিশ শাসকেরা ভারতীয় বাসিন্দাদের প্রতি নানাবিধ বৈষম্যমূলক ব্যবহার করেছে। কিন্তু যে দেশে ভারতীয় অধিবাসীরা সবচেয়ে বেশী অধিকার হারিয়েছেন তা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকান ইউনিয়ন। ওদেশের বিভিন্ন প্রদেশে ভারতীয়রা ব্যবসায় করার জন্য লাইসেন্স নিতে বাধ্য। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করে ভারতীয় ব্যবসায়কে চরম আঘাত করা হয়েছে। সম্পত্তি ক্রয় ও ভোগ করার ব্যাপারেও ভারতীয়দের অধিকার সঙ্কুচিত করা হয়েছে। ১৮৮৫ সাল থেকে ট্রান্সভালে ভারতীয়দের সম্পত্তি ক্রয় করার অধিকার নেই। নাটালে

১৯৪৩ সালে ট্রেডিং অ্যাণ্ড অক্যুপেশন অফ ল্যাণ্ড (ট্রান্সভাল অ্যাণ্ড নাটাল) রেস্ট্রীকশন অ্যাক্ট (কুখ্যাত) তিন বছরের জন্য ইওরোপীয় ও এশিয়ান অধিবাসীদের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে। এর পর আসে বহু সমালোচিত ১৯৫০ সালের গ্রুপ এরিয়াজ অ্যাক্ট। এই আইনের সাহায্যে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ভাগ করে দেবেন। এক অঞ্চলে নির্দিষ্ট সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের লোকে সম্পত্তি কেনা বা ভোগ-দখল করতে পারবেন না। যদি কোন লোকের অন্য সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় সম্পত্তি থাকে তবে তাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার নিজের সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় চলে যেতে হবে। সেখানে তার বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য সরকার দায়ী থাকবে না। 'যার যেথা ঘর' সেখানে সে ব্যবসায় করতে পারবে। এই আইনের আসল লক্ষ্য যে ভারতীয় সম্প্রদায় তা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। ভারতীয়দের বেশীর ভাগ শহরের বাসিন্দা। এই আইন তাদের শহরের অনেক এলাকা থেকে উৎখাত করবে। ভারতীয় কারিগর ও ব্যবসায়ীরা অর্থোপার্জনের জন্য যত্রতত্র বসবাস করতে পারবেন না। এর ফলে এরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১৯৫৩ সালে এশিয়ান প্রতিনিধিরা হিসাব করে দেখান যে গ্রুপ এরিয়াজ অ্যাক্ট প্রয়োগ করা হলে ১,৪৬,০০০ এশিয়ান বাসিন্দাকে উচ্ছেদের সম্মুখীন হতে হবে; আর শুধুমাত্র ডারবান শহরেই ৩৬ কোটির বেশী টাকার সম্পত্তি বিসর্জন দিতে হবে।

এসব আইন ছাড়া আরও নানা আইনের মারফত দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্য চলছে। ১৯৪৯ সালে আইন করে মিশ্র-বিবাহ (ইওরোপীয়ের সঙ্গে আফ্রিকান বা এশিয়ানের বিবাহ) বন্ধ করা হয়। পরের বছর নতুন আইনের মারফত যে কোন রকমের মিশ্র-যৌন মিলন বে-আইনী করা হল। বর্ণ সচেতন সরকার বারাঙ্গনাদেরও বাদ দিল না। এ ছাড়া, পাছে ভারতীয়দের সংখ্যা বেড়ে যায় তাই আইন করা হল কোন ভারতীয় অধিবাসী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর অনুমতি ছাড়া বিদেশে গিয়ে বিয়ে করে স্ত্রী-সন্তান দক্ষিণ আফ্রিকায় আনতে পারবে না। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—এমন কোন আইন ইওরোপীয়দের সম্পর্কে করা হয় নি। হোটেল, রেস্তোরাঁ, সিনেমা, ডাকঘর, ট্রাম-বাস, রেলপথ ইত্যাদি সার্বজনিক স্থানে যেসব পৃথক ব্যবস্থা চালু ছিল তাকে পুরোপুরি আইন সঙ্গত করল ১৯৫৩ সালের পাবলিক অ্যামেনিটিজ অ্যাক্ট।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্ণবৈষম্য আংশিকভাবে চালু ছিল। কিছুদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার আইন করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের এক সঙ্গে পড়াশোনা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। অবশ্য বলা হয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান খোলা হবে। কিন্তু তাতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের অসুবিধা কমবে না। ধরা যাক, নাটালে ভারতীয়দের জন্য কলেজ করা হল। তার মানে কেপটাউনে যে ভারতীয় থাকে তাকে কেপটাউনে না পড়ে এক হাজার মাইল দূরে ডারবানে গিয়ে পড়তে হবে। কারিগরী, ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডাক্তারী যারা পড়তে চায় তাদের নিশ্চয়ই আরো অসুবিধা হবে—কারণ এসব পড়ানোর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যায় কম হতে বাধ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পৃথকীকরণ ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকান সরকার ইওরোপীয় শিক্ষার জন্যে যা খরচ করেন ভারতীয় শিক্ষার জন্য তার চেয়ে অনেক কম খরচ করেন। ১৯৫০ সালে সরকার ৫ লক্ষ ইওরোপীয় ছাত্রের জন্য খরচ করেন ২½ কোটি পাউণ্ডের কিছু বেশী। একই বছরে পৌনে তিন লক্ষ ভারতীয় ও বর্ণসঙ্কর (ইউরো-আফ্রিকান) ছাত্রের জন্য খরচ করা হয় মাত্র ৪৭ লক্ষ পাউণ্ড। সে বছরের হিসাবে দেখা যায় সমস্ত ইওরোপীয় ছাত্রের ২২% মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ শিক্ষা পাচ্ছে। ভারতীয় ও বর্ণসঙ্কর ছাত্রদের মধ্যে এমন ছাত্রের সংখ্যা ১৯৫০ সালে ছিল ৪% এরও কম।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় অধিবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার থেকেও পুরোপুরি বঞ্চিত করা হয়েছে। প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় কোন আইনসভাতে ভারতীয় প্রতিনিধি নেই। ভারতীয়রা ভোটাধিকার থেকেও বঞ্চিত।

বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতীয় জনমতের চাপে ভারত সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বাসিন্দাদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করে আসছেন। ১৯২৬-২৭ সনে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকান সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত কেপটাউন চুক্তির ফলে ভারতীয় বাসিন্দারা সাময়িকভাবে কিছুটা লাভবান হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকান সরকার পূর্ণোদ্যমে তাদের কোণঠাসা নীতি কার্যকরী করতে থাকেন। অবস্থা চরমে ওঠে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর।

১৯৪৬ সালে দি এশিয়াটিক ল্যাণ্ড টেনিওর অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান রেপ্রেসেণ্টেশন অ্যাক্ট নামে এক নতুন আইনের ফলে ভারতীয় অধিবাসীদের সম্পত্তি ক্রয়

নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের হাতে আসে। এই আইনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য চুক্তি রদ করা হয়। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার সমগ্র বিষয়টি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের নজরে আনেন। দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে ফিল্ড মার্শাল স্মাট্স যুক্তি তোলেন যে বিষয়টি দক্ষিণ আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। অতএব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এ ব্যাপারে কোন এক্তিয়ার নেই। এই বিতর্কে যদিও অধিকাংশ সদস্য দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে যান, তবু দক্ষিণ আফ্রিকার অনমনীয় অসহযোগের ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নি।

১৯৪৯ সালে সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বিরোধের মীমাংসার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত ও পাকিস্তান আলাপ-আলোচনা চালাবে। প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৫০সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান থেকে প্রতিনিধি দক্ষিণ আফ্রিকায় এলেন। ঠিক হল এক গোলটেবিল বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে জুন মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার গ্রুপ এরিয়াজ অ্যাক্ট বলে এক নতুন আইন প্রণয়ন করলেন। এই আইন যে কত সর্বনাশা তা আমরা আগেই দেখেছি। ভারত সরকার এই আইনের প্রতিবাদে প্রস্তাবিত বৈঠকে যোগ দিতে অসম্মতি জানালেন। পাকিস্তানী সরকার বললেন, যদি আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই আইন স্থগিত রাখা হয় তবেই তাঁরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক আর অনুষ্ঠিত হয় নি।

এরপর প্রতি বছর ভারত সরকার দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় অধিবাসীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রস্তাব এনেছেন, প্রস্তাব অধিকাংশ প্রতিনিধির সমর্থনও পেয়েছে। কিন্তু প্রতিবার দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার আপত্তি তুলেছেন: বিষয়টি দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ব্যাপার; সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এর ওপর কোন এক্তিয়ার নেই।

এমনি করে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার আন্তর্জাতিক জনমতের কোন রায় মানতে রাজী হন নি। ভারত সরকারের পক্ষে তাই দক্ষিণ আফ্রিকার কোণঠাসা নীতির বিরুদ্ধে প্রচার, বাণিজ্য বয়কট ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া অন্য কোন প্রকার চাপ দেওয়া সম্ভব হয় নি।

অবশ্য বিনা প্রতিবাদে ভারতীয়রা অন্যায় সহ্য করেন নি বা করছেনও

না। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯০৮ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়। সে আন্দোলনে বহু ভারতীয় জেলে গিয়েছেন। সত্যাগ্রহীরা অনেক উৎপীড়ন সহ্য করেছিলেন। এবং তাঁদের আন্দোলন আংশিক সফলতালাভ করেছিল। ১৯১৩ সালে যখন ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকায় আসা বন্ধের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে আর একবার অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। পরের বছর গান্ধী স্মাট্‌স চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এ চুক্তির ফলে ভারতীয় বাসিন্দারা যা চেয়েছিলেন তা পুরোপুরি পান নি। বরং এর পর নানা আইন পাস করে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার আরও বেশী স্বৈরাচারী ক্ষমতা হাতে নিয়েছে এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে তার কোণঠাসা নীতি চালু করেছে।

চার

গত কয়েক বছরে পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকায় একাধিক আফ্রিকান রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ও রোডেশিয়া ছাড়া সাধারণ-ভাবে ভারতীয় বাসিন্দাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহারের অবসান ঘটেছে এবং তাঁদের অনেকে স্ব স্ব দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। এদিকে ভারতবর্ষের নেতারা বার বার বলছেন, আফ্রিকার ভারতীয় বাসিন্দারা যেসব দেশে আছেন সেসব দেশের অধিবাসী বলে নিজদের মনে করুক এবং নিজ সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে সুস্থ আত্মবিশ্বাস নিয়ে আফ্রিকানদের পাশে এসে দাঁড়াক। কিন্তু এমন জিনিস যে পুরোপুরি ঘটেছে সে কথা মনে করা ভুল হবে। তবু আজকের আফ্রো-ভারতীয় সম্পর্ক শুধু আফ্রিকার ভারতীয় বাসিন্দাদের সমস্যাকে কেন্দ্র করেই দাঁড়িয়ে নেই। বস্তুতঃ আফ্রো-ভারতীয় সম্পর্কে এ সমস্যার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত গৌণ। বরং বাণিজ্য সম্প্রসারণ, কারিগরী সাহায্য ও রাজনৈতিক বোঝাপড়া প্রভৃতি প্রশ্ন আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

আফ্রো-ভারতীয় বাণিজ্য আজ বাড়তির পথে। ১৯৬৩-৬৪ সালে আফ্রিকা থেকে ভারতে আমদানীকৃত পণ্যের দাম ছিল ৫০ কোটি টাকা পরের বছর এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৫ কোটি টাকায়। অনুরূপভাবে একই সময় আফ্রিকায় ভারতের রপ্তানি ৪৬ কোটি টাকা থেকে ৪৯ কোটি টাকায়

উঠেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এদেশের সনাতন রপ্তানি পণ্য পাটজাত দ্রব্য, সুতির কাপড় ও চা প্রভৃতির সঙ্গে আজ যোগ হয়েছে ছোটখাট শিল্পজাত পণ্য এমন কি বড় ও মাঝারি যন্ত্রপাতি পর্যন্ত।

এছাড়া আফ্রিকার অনেক ছাত্রছাত্রী, কারিগরী ও এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাবিদ আজ ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় ও কারখানাগুলিতে শিক্ষা পাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে ভারত সরকার, কলম্বো পরিকল্পনা ও কমনওয়েলথের আফ্রিকান সহায়তা পরিকল্পনা থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকেন।

খুব সম্প্রতি আফ্রো-ভারতীয় যৌথ উদ্যোগে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ছোট ও মাঝারি রকমের কারখানা স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে। ১৯৬৬ সালের মে মাস পর্যন্ত ২১টি এমন শিল্প ভারত সরকারের অনুমোদন পায়। এদের মধ্যে কতকগুলি ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। প্রস্তাবিত যৌথ উদ্যোগের মধ্যে আছে এমন সব কারখানা যেখানে তৈরি হবে সুতি ও পশমী বস্ত্র, প্ল্যাস্টিকের জিনিস, সিমেণ্ট পাইপ, এনামেলের জিনিস, দাড়ি কামানোর ব্লেড, ওষুধ, চিনি, পেন্সিল ইত্যাদি।

একই সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ হতে সচেষ্ট হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা, বর্ণবৈষম্য ও উন্নতিকামী দেশগুলিকে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যদান প্রভৃতি প্রশ্নে ভারতবর্ষ ও বহু আফ্রিকান রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভিতরে ও বাইরে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করছে।

এমনিভাবে ইওরোপীয় প্রভুত্বের অবসানান্তে দু'হাজার বছরের বেশী পুরানো আফ্রো-ভারতীয় সম্পর্কের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যুক্ত হচ্ছে।

শেষ কথা

আমাদের আফ্রিকা পরিক্রমা শেষ হল। আফ্রিকার ইতিহাস কিন্তু শেষ হয় নি। বরং সেই ইতিকথায় নতুন যুগের সূচনা ঘোষিত হয়েছে। এই নবযুগ স্বাধীনতার যুগ নিজ শাসনভার স্বহস্তে তুলে নেবার, বিশ্বরঙ্গমঞ্চে মাথা উঁচু করে নিজের কথা বলবার যুগ।

আফ্রিকার ইতিহাসের সদ্য-সূচিত এই নতুন যুগে কোন দেশের পথই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। স্বাধীনতা তো সর্ববিষহর ঔষধ নয় যে স্বাধীনতা পাওয়া মাত্র সব সমস্যা তিরোহিত হবে। স্বাধীনতা হল নিজের সমস্যা নিজের মত করে সমাধান করার একটা সুযোগ মাত্র। বরং পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিকল্পনা সহ দেশের সমস্যার মোকাবিলা করার সময় মনে হতে পারে দেশের সমস্যাবলীর তীব্রতা বেড়ে গেছে।

তা ছাড়া, স্বাধীনতা সত্যই নতুন ধরনের সমস্যার উৎপত্তি ঘটায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে যেমন কোন দেশের সামগ্রিক চৈতন্য উদ্দীপিত হয়, তেমনি হয়, দেশের নানা অংশ, সম্প্রদায়, ও জনগোষ্ঠীর স্ববৈশিষ্ট্য চেতনা ও স্বাধিকার বোধের জন্ম।

অংশতঃ এই প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ংক্রিয়। কিন্তু সারাদেশের আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে গিয়েও অনেকসময় বিভিন্ন সুষুপ্ত জনগোষ্ঠীকে নিজ অধিকার ও শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করতে হয়। আবার যেখানে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিজেদের সুসংহত ও সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে তুলেছে, সেখানে প্রায়ই এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখতে পাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মুখপাত্র সংগঠন।

যতদিন স্বাধীনতা অর্জিত হয় নি ততদিন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় গোষ্ঠীর অন্তর্বিরোধ বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে প্রাধান্য লাভ না করতেও পারে (অনেক সময় করে, তার উদাহরণ, অবিভক্ত ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব)। কিন্তু স্বাধীনোত্তর যুগে আন্তঃসাম্প্রদায়িক ও আন্তঃগোষ্ঠী প্রতিযোগিতা তীব্রতর হওয়া স্বাভাবিক। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে বা পরে এই ধরনের বহু সংঘাত আফ্রিকার দেশগুলিতে মাথাচাড়া দিয়েছে। ঘানায়

অশান্তি ও অন্যান্য কৌমের স্বাতন্ত্র্য প্রচেষ্টা। নাইজেরিয়ায় হৌসা-য়োরুবা-ইবোদের ত্রিভুজিক দ্বন্দ্ব, সিয়েরা লিওনে উপকূলবাসী বর্ণসঙ্করদের সঙ্গে অভ্যন্তরের অধিবাসীদের প্রতিযোগিতা, উগাণ্ডায় বাগাণ্ডা বনাম অন্য কৌম সমূহ, আর কঙ্গোর কথা তো না তোলাই ভাল। তাই ভারতবর্ষের মত জাতীয় সংহতির ভিত্তিমূল গভীরতর করাই হল আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান সমস্যা।

অন্য যে সমস্যা প্রকটভাবে দেখা দেয় তা হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র পরদেশের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থেকে মুক্তিতে সমাপ্ত হয় না, এর সঙ্গে সঙ্গত কারণে থাকে জীবনযাত্রা উন্নত করার বাসনা। যে বাসনার সফল রূপায়ন কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নেই লভ্য! অর্থনৈতিক প্রগতির কথা অবশ্য মুখে বলা যত সহজ, কাজে তত নয়। মূলধন, দক্ষ কারিগর ও শ্রমিকের অভাব, পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা, এবং অনেক দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিকে করেছে পশ্চাৎপদ।

আবার কোন কোন দেশে অর্থনীতি শুধু একটি পণ্যের রপ্তানীর সঙ্কীর্ণ ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। (যেমন, ঘানার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ হল কোকো)। এই অবস্থার বিপদ হল : যদি কোন কারণে পৃথিবীর বাজারে সেই বিশেষ পণ্যের দাম কমে যায় তবে দেশের অর্থনীতির সমূহ ক্ষতি। তাই, এমন দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা বিশেষ অঙ্গ হবে অর্থনীতির বনিয়াদের বহুমুখিতা সাধন অর্থাৎ অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন। কিন্তু আগে যা বলছিলুম, সাধারণভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থনীতির বহুমুখিতা সম্প্রসারণ : এর কোন কাজটাই অনায়াসসাধ্য নয়।

আর এইখানেই আফ্রিকার নতুন রাষ্ট্রগুলির অন্যতম প্রধান সমস্যা বিদ্যমান।

এখানে কেবল দুটি সমস্যার কথা বলা হল তাদের গুরুত্বের জন্য। কিন্তু তা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে আফ্রিকার নবযুগের যাত্রা নির্বিঘ্ন হবে না। কারই বা হয়েছে? এশিয়ার দেশগুলির কি হয়েছে? হয়েছে ভারতবর্ষের?

তবু, বিঘ্নবিপদ তুচ্ছ করার মত সাহস ও মনোবল আফ্রিকার আছে।

বিষুবরৈখিক গহন অরণ্য, সাহারার দুস্তর মরুভূমি, কিলিমাঞ্জারোর দুর্গম গিরি যারা জয় করেছে, প্রকৃতির কৃপণদানে যারা ডরায় নি, তাদের উচ্ছল প্রাণশক্তি সমস্ত প্রতিবন্ধক ধ্বংস করবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

হয়তো কুটিল, বন্ধুর পথে অগ্রগামী যাত্রীদের বার বার ক্ষতবিক্ষত হবে পদতল ; মৃগতৃষ্ণিকার হাতছানিতে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে তারা পথও ভুল করবে বারংবার। অবশেষে কোন এক দীপ্ত উষার মাঙ্গলিক গানের সমারোহে তারা নিজদের প্রকৃত লক্ষ্যের পথ খুঁজে পাবে। প্রকৃতির বহুবিচিত্র বর্ণের আলপনার সঙ্গে মানবসমাজেও সেদিন সবার রঙে রঙ মেশানো হবে।

পরিশিষ্ট ঃ এক

বাঙলায় আফ্রিকা-চর্চা

যাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়, তাদের দেশ, ভূগোল, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনৈতিক অবস্থা ও ভাষা-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের স্বাভাবিক কারণে ঔৎসুক্য জাগে এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানে নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য এইসব বিষয়ে চর্চা করতেই হয়। যে কোন রকমের সম্পর্কের পক্ষে এ-কথা প্রযোজ্য। কারণ বন্ধুকে চেনা ও জানা যেমন প্রয়োজনীয়, শত্রুর পরিচয়ের তাগিদ তার থেকে কিছু কম নয়। বহির্বিশ্বে যে জাতি যত ছড়িয়ে পড়েছে; অন্য দেশ, অন্য জাতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ ও বৃদ্ধির সুযোগ তার তত বেশী মিলেছে। অবশ্য, ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির মান, কী ধরনের লোক বাইরে যাচ্ছে এবং ব্যক্তিবিশেষের আহৃত জ্ঞান জাতীয় স্বার্থে কাজে লাগাবার কী ধরনের সাংগঠনিক ব্যবস্থা আছে, তার ওপর নির্ভর করবে পূর্বোক্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার কার্যত কতদূর হচ্ছে।

প্রাচীন গ্রীকরা ছিল সমুদ্রচারী বণিক ও দেশবিজেতা। অন্য দেশ ও জাতি সম্বন্ধে গ্রীকরা তাই যথেষ্ট জ্ঞান রাখত। মেগাস্থেনেসের ভারত-বৃত্তান্ত আমাদের কাছে সুপরিচিত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রীকলেখক-সংকলিত 'পেরিপ্লাস অফ দি ঈরিত্রিয়ান সি' নামক গ্রন্থ লোহিত-সাগর, পূর্ব আফ্রিকার উপকূল ও আরব সাগর সম্বন্ধে বহুমূল্য সংবাদের আকর। পরের শতাব্দীতে রোমক সম্রাট হাড্রিয়ানের রাজত্বকালে আলেকজান্দ্রিয়ার রচিত ক্লডিয়ুস টলেমিয়ুস টলেমির ভূবৃত্তান্ত তো সে-যুগের সুপ্রসিদ্ধ ভূগোল।

সাম্রাজ্যবিস্তার ও শাসনের খাতিরে রোমক নাগরিকেরা গেছেন দেশ-বিদেশে। এঁদের অনেকে স্বীয় অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন। তার মধ্যে স্বয়ং জুলিয়াস সীজার প্রণীত 'ডি বেলো গলিকো' বা গলদেশীয় (ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী, হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত) যুদ্ধ অন্যতম।

আরব সভ্যতার সম্প্রসারণ-যুগে আরব পর্যটক, বণিক, শাসক ও পণ্ডিতেরা অন্য দেশ সম্পর্কে বহু বিবরণ রেখে গেছেন। তার মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আল বেরুণী এবং পশ্চিম আফ্রিকা সম্বন্ধে এল. বেকরী ও এল. ফজরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সর্বশেষে, ইওরোপের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগে ইওরোপীয় পর্যটক, বণিক, ধর্মপ্রচারক, শাসক ও বিজ্ঞানীদের অবদানের উল্লেখ নিশ্চয়ই বাহুল্যমাত্র।

দুই

বাঙলায় যে যথেষ্ট আফ্রিকা-চর্চা হয় নি, তার একটা বড় কারণ বঙ্গদেশের সঙ্গে আফ্রিকার যোগাযোগ অকিঞ্চিৎকর। ইওরোপের অধিবাসীরা আফ্রিকায় গেছে বাণিজ্য. শাসন ও ধর্মপ্রচারে। এমন কি, ভারতের অন্য প্রদেশের অধিবাসীরাও অর্থোপার্জনার্থে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি করেছে। গত একশ বছরে সিন্ধি, গুজরাটি ও পাঞ্জাবীরা পূর্ব আফ্রিকায় এবং গুজরাটি ও তামিলেরা দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রধানতঃ শ্রমিক ও ব্যবসায়ী হিসাবে গেছে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক বাঙালীরা বেশি সংখ্যায় আফ্রিকা মহাদেশে যায় নি, স্থায়ীভাবে বসতি করা তো দূরের কথা। অবশ্য, ব্যক্তিগতভাবে কিছু লোক যে একেবারে না গেছে, তা নয়। এই নিবন্ধের পরবর্তী অংশে বাংলা পুস্তকতালিকায় উল্লিখিত একটি গ্রন্থের লেখক শ্রীশ্যামলাল মিত্র ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মিশর-অভিযানে বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। শ্রীমিত্র মিশরে জনৈক ভদ্রলোকের আতিথ্যে আপ্যায়িত হন এবং কথায় কথায় প্রকাশ পায়, গৃহস্বামী বাঙালী ব্রাহ্মণ। কৈশোরে দেশ ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে মিশরে এসে সেখানেই বিয়ে করে স্থায়ীভাবে সংসার পাতেন। কিন্তু এই সব ঘটনা বিচ্ছিন্ন এবং সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

প্রশ্ন উঠবে, গুজরাটি, পাঞ্জাবী ও তামিলেরা অনেকে আফ্রিকায় যাওয়ার ফলে কি তাদের ভাষায় আফ্রিকার দেশ, জাতি, ভাষা, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে? তামিল সম্পর্কে কিছু বলা মুশকিল। কিন্তু যতদূর জানি, গুজরাটি ও পাঞ্জাবীতে আফ্রিকা-চর্চা খুব বেশি এগিয়েছে বলে মনে হয় না।

অথচ গুজরাট ও পাঞ্জাবে আফ্রিকা-জিজ্ঞাসু পাঠকের সংখ্যা নেহাত কম

হওয়ার কথা নয়। ব্যবসায় ও চাকরিব্যপদেশে এই দুই প্রদেশ থেকে বহু লোক আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে গেছে। অতএব, নিজেদের স্থূল বৈষয়িক স্বার্থেই আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর রাখা তাদের প্রয়োজন। এ-প্রয়োজন অবশ্য অংশতঃ মেটে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাবিনিময়ে, মৌখিক আলাপ-আলোচনায়। বাকি যেটুকু থাকে তার দাবি মিটিয়েছে ইংরাজী পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা। ইংরাজী প্রভুত্ব সর্বক্ষেত্রেই ভারতীয় ভাষাগুলির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল বা এখনও আছে। আফ্রিকা-চর্চাও তার ব্যতিক্রম নয়।

বাঙলাসাহিত্য অবশ্য ইংরাজী-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রগতির পথে কিছুটা এগিয়েছে। তবু তত্ত্ব ও তথ্যপ্রধান যে কোন বাঙলা বইকে ইংরাজী বই-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। ইংরাজী বই-এর উৎপাদনব্যয় বেশি হলেও তার বাজার বিশ্বব্যাপী। অর্থাৎ ইংরাজী গ্রন্থ-প্রকাশকের আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে এদেশের প্রকাশকদের মূলধনের তুলনা হয় না। ইংরাজী প্রকাশক বহু অর্থব্যয়ে তথ্য ও তত্ত্ববহুল গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করার ঝুঁকি নিতে পারেন। কারণ তাঁর ক্রেতারা সংখ্যায় অনেক বেশী। বাঙলাপুস্তক-ব্যবসায়ীর পক্ষে যেটা সম্ভব তা হচ্ছে উৎকর্ষ সম্বন্ধে মাথা না ঘামিয়ে, বই-এর দাম কম করা, যাতে বাঙলাভাষী লোকের কাছে এর বিক্রয় বেশি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও অসুবিধা আছে। এখনও বাঙলাদেশের সঙ্গে আফ্রিকার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নগণ্য। এবং সামান্য কয়েক বছর আগে পর্যন্ত আফ্রিকা-জিজ্ঞাসু বাঙালীর সংখ্যা ছিল একান্ত অল্প। তাই একেবারে রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার ও শিকারকাহিনী ছাড়া অন্য বই-এর চাহিদা ছিল না বললেই চলে। এ ছাড়া, আফ্রিকার নৃতত্ত্ব, প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গুরুতর রচনা এখনও ভাষাগত কারণে দুরূহও বটে।

তিন

এতক্ষণ আমরা ধরে নিয়েছিলুম বাঙলায় আফ্রিকা-চর্চা প্রায় হয় নি। এবার তার সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা যাক। দেখা যাবে, বাঙলাভাষায় আফ্রিকা সম্পর্কিত বই-এর সংখ্যা খুব কম। তার ওপর, নির্ভুলতা, তথ্য-বহুলতা, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার-বিশ্লেষণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এইসব বই আরও অনেক উৎকর্ষের দাবি রাখে।

আফ্রিকা সম্বন্ধে বাঙলাভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর এক তালিকা

লেখকদের নামের বর্ণানুক্রমে নিচে দেওয়া হল। এই তালিকা-প্রণয়নে কলকাতার জাতীয় পাঠাগারের গ্রন্থতালিকা, বৃটিশ মিউজিয়াম পাঠাগারের মুদ্রিত বাঙলা গ্রন্থের তালিকা (মোট তিন খণ্ড, ১৮৮৬, ১৮৮৬—১৯১০ ও ১৯১১—১৯৩৪) এবং বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার ১৯৬০ সালের পুস্তকতালিকার সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য, এতে যে তালিকার অসম্পূর্ণত্ব ঘুচেছে এমন দাবি কেউ করবে না।

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ [কলিকাতা—১৯৩১]
গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ। পৃথিবীর ইতিহাস : ৮ম খণ্ড—মিশর [কলিকাতা—১৯২৩]
চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ। প্রাচীন মিশর [কলিকাতা—?]
দত্ত, কালীপ্রসন্ন। বুয়র যুদ্ধ [কলিকাতা—১৯০২]
প্রিনসেপ, জেমস। প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় [কলিকাতা—১৮৩০]
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা। আফ্রিকার চিত্র [কলিকাতা—?]
বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র। বিদ্যাকল্পদ্রুম…ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত : 'এনসাই-ক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেনসিস'-এর ষষ্ঠ খণ্ড [কলিকাতা—১৮৪৭]
বসাক, নীলমণি। ইতিহাস সার (অর্থাৎ…ইওরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত] [কলিকাতা—১৮৫৯]
বসু, কৃষ্ণদয়াল। ডেভিড লিভিংস্টোন [কলিকাতা—?]
বিশ্বাস, রামনাথ। মাউ মাউ-এর দেশে [কলিকাতা—?]
ঐ । দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা [কলিকাতা—?]
ঐ । ভয়ঙ্কর আফ্রিকা : ১ম ও ২য় খণ্ড [কলিকাতা—?]
মিত্র, শ্যামলাল। মিশরযাত্রী বাঙালী [কলিকাতা—১৮৮৩]
মুখোপাধ্যায় অসিত ও চক্রবর্তী, মধুসূদন। আবিসিনিয়া [কলিকাতা—১৯৩৫]
মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বীরাজ। আবিসিনিয়া ও ইটালী [কলিকাতা—১৯৩৬]
মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ ও মুখোপাধ্যায়, প্রথমনাথ। বুয়র ইতিহাস [কলিকাতা—১৯০০]
সরকার, বিনয়কুমার। বর্তমান জগৎ : ১ম ভাগ—মিশর [কলিকাতা—১৯১৫]
সর্বাধিকারী, দেবপ্রসাদ। দক্ষিণ আফ্রিকা দৌত্য কাহিনী [কলিকাতা—১৯৩৫]
সেন, চাণক্য। ধীরে বহে নীল [কলিকাতা—১৯৫৮]

উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে দু-টি অনুবাদ। একটি গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের কাহিনী, অপরটি জেমস প্রিনসেপ সংকলিত প্রাচীন ইতিহাসের অনুবাদ। ভ্রমণকাহিনী ছ-টি, তার মধ্যে তিনটি রামনাথ বিশ্বাসের লেখা। বাকি তিনটি ভ্রমণকাহিনী নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের মিশর ভ্রমণকাহিনী নিছক গতানুগতিক পিরামিড দর্শন ও প্রাসাদোপম হোটেলে রাত্রিবাসের কাহিনীই নয়। সারা গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে অনেক সারগর্ভ আলোচনা। পাঠকের চমক লাগবে লেখকের বহু বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যে। শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ভ্রমণকাহিনী উল্লেখযোগ্য তার ঐতিহাসিক গুরুত্বে, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে লেখককে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সেদেশে পাঠানো হয়। শ্যামলাল মিত্রের 'মিশরযাত্রী বাঙালী' বইটি পড়তে রোমাঞ্চকর কাহিনীর মতো লাগে কারণ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মিশর-অভিযানে অংশগ্রহণকারী বাঙালী সৈনিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এতে আছে। বইটির প্রকাশক ভূমিকায় লিখছেন, "বাঙ্গালাভাষায় এরূপ ধরনের পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের লেখক ভিন্ন কোনও বাঙালী এ পর্যন্ত সমুদ্রপার হইয়া দূরদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন নাই।"

গ্রন্থপঞ্জীতে মোট আটখানি বই আছে মিশর সম্বন্ধে। তার মধ্যে ছ-খানি মিশরের ইতিহাস বিষয়ে আর দু-খানি ভ্রমণ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ। এ ছাড়া গত শতাব্দীর শেষে বুয়র যুদ্ধের সময় দু-খানি এবং ১৯৩৫ সালে শুরু ইতালো-ইথিওপীয় যুদ্ধের সময় দু-খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেগুলিও আমরা তালিকাভুক্ত করেছি।

তালিকায় আরও কিছু নাম দেওয়া যেত: রোমহর্ষক শিশুপাঠ্য দুঃসাহসী কাহিনীর। কিন্তু এইসব কাহিনীর বাস্তব ভিত্তির একান্ত অভাব এবং আফ্রিকা-চর্চায় এদের প্রয়োজনও বিশেষ নেই। বরং শিশুদের গ্রহিষ্ণু মনে নানা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে এরা বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান বিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সর্বোপরি, পূর্বোক্ত তালিকায় দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর ও ইথিওপিয়া সম্বন্ধে পুস্তকের বিপুল সংখ্যাধিক্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ স্বাভাবিক। মিশরে বিকশিত হয়েছে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা। তাই সে দেশকে বাদ দিয়ে মানুষের বিবর্তনের গতি বোঝা যায় না। আর ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইথিওপিয়ায় ইতালীর বর্বরোচিত

আক্রমণের তরঙ্গ যে বাঙলার মননশীল মহলে এসে লাগে তার প্রমাণ উর্ধ্বোল্লিখিত বই দুটি। কিন্তু এই দেশে তিনটি বাদে পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় যে বিরাট ভূখণ্ড পড়ে রয়েছে, যার আয়তন ভারতবর্ষের কয়েক গুণ, তার সম্বন্ধে পুস্তকের একান্ত অভাব।

জেমস প্রিনসেপ প্রণীত ও স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮৩০ সালে প্রকাশিত 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়'-এর প্রথম পরিচ্ছেদে মিশরীয়দের সম্বন্ধে আলোচনাটিই বোধহয় বাঙলাভাষায় আফ্রিকা সম্পর্কে প্রথম রচনা। আসলে এটি ইংরাজিভাষায় রচিত এবং এর বঙ্গানুবাদ করেন হিন্দু কলেজের তরুণ কর্মীরা ও চুঁচুড়ার পিয়ার্সন সাহেব। এদেশের ছাত্রদের জন্য রচিত, তাই মিশরের ভৌগোলিক বর্ণনা, অধিবাসীদের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার, ধর্ম, এবং ইতিহাসের সঙ্গে আছে প্রতি অধ্যায়ের বক্তব্যের ওপর সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী। আর আছে ছাত্রদের নৈতিক মান উন্নত করার জন্য প্রতি অধ্যায় থেকে গ্রহণযোগ্য উপদেশ। কয়েকটি উপদেশের নমুনা :

"লিপি বিদ্যাবিষয়ে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের উচিত, কি জন্য না, তাহাতে পূর্ব বৃত্তান্ত সমস্ত আমরা জানিতে পারিতেছি ; আর ছাপা বিদ্যাতেও কৃতার্থ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করা কর্তব্য, কারণ তাহাতে ঐ সকল ইতিহাস পুস্তক আমরা প্রত্যেক জন অল্পমূল্যে পাইতেছি।" [পৃষ্ঠা ৬৫]

মিশরীর সভ্যতার মহৎ কীর্তির ধ্বংসের প্রতি তরুণ ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখক বলছেন :

"দেখ, যাহারা ঐ ২ নগরের পত্তন করিয়াছিল, এবং যতলোক সেই ২ স্থানে বাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে ; তদ্রূপ অল্প দিবসের পর আমাদের এই মাটির দেহ মাটিতে মিশাইয়া যাইবে ; অতএব লোকান্তরে গমন করিতে প্রস্তুত থাকা আমাদের কর্তব্য কি না।" [পৃষ্ঠা ৬৫]

অন্যত্র :

"বিচারকর্তাকে নিযুক্ত করিবার বিষয়ে যে কতকগুলি কথা লেখা গিয়াছে, তাহাতে এই বোধ হয়, যে মিশর দেশের লোকেরা রাজ্যের ন্যায় বিচার করা ও সত্যকথা কহা যে কেমন উচিত কর্ম তাহা জানিত ; ইহাতে এই বড় খেদের বিষয়, যে এতদ্দেশে (বঙ্গদেশে) প্রায় সকলেই বাল্যাকালাবধি মিথ্যাবাক্য কহিয়া কালযাপন করে।" [পৃষ্ঠা ৬৯]

সে যুগের মানদণ্ডে 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়'-এর আলোচনা হয়তো

নিম্নস্তরের নয়। কিন্তু তার সত্তর বছর পরে প্রকাশিত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'সচিত্র বুয়র ইতিহাস'-এ যুক্তিহীন, অর্থহীন, অপ্রাসঙ্গিক অর্ধসত্যের ভিড়। এর অযৌক্তিকতার কিছু নিদর্শন এখানে উপস্থিত করা যাক।

বুয়রদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে লেখকদ্বয় বলছেন: বুয়রদের "শয়ন করিবারও কিছুমাত্র স্থান নির্ণয় নাই, যাঁহার যে স্থানে ইচ্ছা, তিনি সেই স্থানেই মেজের ওপর পড়িয়া থাকেন।......একবার ইহারা যে বস্ত্র পরিধান করেন, তাহা মাসাবধির মধ্যে প্রায়ই আর পরিবর্তন করেন না।" (পৃষ্ঠা ১৪৭)

'সচিত্র বুয়র ইতিহাস'-এর ঐতিহাসিক গবেষণার নিদর্শনস্বরূপ অন্য একটি উল্লেখ্য অনুচ্ছেদ :

"বুয়রদের বিশেষত বুয়র স্ত্রীলোকদিগের একটু বেশ 'হাতটান' রোগ আছে।......স্ত্রীলোকগণ দোকান হইতে কোনো দ্রব্য ক্রয় করিবার সময় প্রায়ই কিছু না কিছু দোকানদারগণের বিনানুমতিতে আপন আপন পকেটে রাখিতে ত্রুটি করেন না। দোকানদারগুলিও প্রায় অতিশয় চতুর হয়; কি কি দ্রব্য বুয়র রমণীগণ অপহরণ করিতেছেন দোকানদারগণ তাহার দিকে বিশেষ-রূপ লক্ষ্য রাখে। কিন্তু কিছু না বলিয়া রমণী যে দ্রব্য খরিদ করেন, তাহার বিলের সহিত অপহৃত দ্রব্যগুলিরও মূল্য লিখিয়া দেয়; বুয়র রমণীও আর কোনো কথা বলিতে সাহস না করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে অপহৃত দ্রব্যগুলিরও মূল্য প্রদান করিয়া থাকেন।"

এমন ইতিহাস চর্চায় মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বাঙলাভাষায় যে আফ্রিকা সম্বন্ধে তথ্যমূলক ও যুক্তিনিষ্ঠ গ্রন্থ একেবারে রচিত হয় নি তা নয়। কালীপ্রসন্ন দত্ত লিখিত 'বুয়র যুদ্ধ' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এর আলোচ্য বিষয় দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস। লেখকের অবশ্য বুয়র বৃটন দ্বন্দ্বে খানিকটা বৃটিশপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা আছে। তা সত্ত্বেও এটি স্থূল প্রচারধর্মী হয়ে ওঠে নি। বরং স্বীয় মতের সমর্থনে লেখক তথ্যপ্রমাণ দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হল বুয়র যুদ্ধের ঘটনা। তাছাড়া, পরিশিষ্টে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল সন্নিবিষ্ট হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: স্যাণ্ড নদী কনভেনশন (১৮৫২), প্রিটোরিয়া কনভেনশন (১৮৮১) এবং বাঙলা ১৩০৯ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'বুয়ার নীতি'।

পূর্বোক্ত তালিকা থেকে আমরা একথাও বুঝতে পারি যে বাঙলায় আফ্রিকা-চর্চা অবিচ্ছিন্ন ধারায় হয় নি। লণ্ডনের ইণ্টারন্যাশনাল আফ্রিকান ইন্সটিট্যুট ও রয়্যাল এম্পায়্যার সোসাইটি কিংবা পারীর ম্যুসে দ্য লম্-এর মত কোন প্রতিষ্ঠান বাঙলাদেশে নেই। যেটুকু কাজ হয়েছে, তার কৃতিত্ব তথা দায়িত্ব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার এবং তার প্রগতি স্বভাবতই সবিরাম ও অনিয়মিত হতে বাধ্য। আফ্রিকা মহাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা ও সমস্যা উল্লিখিত গ্রন্থাবলীর প্রায় অধিকাংশের প্রেরণা যুগিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের ধনসমস্যা ও ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের শোচনীয় অবস্থাকে কেন্দ্র করে তিনটি বই লেখা হয়েছে। ইঙ্গ-বুয়র যুদ্ধ দুটি, ১৮৮২ সালের বৃটিশবাহিনীর মিশর-অভিযান একটি এবং ইতালো-ইথিওপীয় যুদ্ধ দুটি পুস্তকের বিষয়বস্তু। রামনাথ বিশ্বাসের একটি ভ্রমণকাহিনী কেনিয়ার 'মাউ মাউ' বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত। শ্রীচাণক্য সেনের 'ধীরে বহে নীল' মিশরীয় জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আরবজগতে বৃটিশপ্রভুত্ব অবক্ষয়ের কাহিনী।

উল্লিখিত রচনাবলীতে রাজনীতি ও ইতিহাসের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ ছাড়া, বাকি সবগুলিই প্রায় পূর্বোক্ত পর্যায়ের। অর্থাৎ ভাষান্তরে আফ্রিকার ভূগোল, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, অর্থনীতি নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বাঙলাভাষায় কোন আলোচনা হয় নি বললেই চলে। আর আফ্রিকা দূরে থাক, ভারতবর্ষ তথা বাঙলাদেশ সম্বন্ধে এ ধরনের আলোচনা বাঙলাভাষায় কতই বা হয়েছে।

চার

এতক্ষণ বাঙলাভাষায় আফ্রিকা-চর্চার কথা বলা হল। এবার বাঙলাদেশে আফ্রিকা-চর্চার প্রসঙ্গে আসা যাক। যে কারণে বাঙলাভাষায় আফ্রিকা-চর্চার সুযোগ সীমিত, কিছুটা সেই কারণে বাঙলাদেশে আফ্রিকা সম্পর্কে পঠন-পাঠন ও গবেষণা অনগ্রসর। অবশ্য উত্তর আফ্রিকার মুসলমান-প্রধান আরব দেশগুলি (বিশেষ করে মিশর) ঐস্লামিক কিংবা আরব-ইতিহাসের প্রতি আমাদের কিছুটা মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তেমনি কমনওয়েলথের ইতিহাসের কল্যাণে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন সম্পর্কে নাতিগভীর জ্ঞান

আমরা রাখি। কিন্তু তথাকথিত 'নিগ্রো' আফ্রিকার মানুষ ও তার সমস্যা নিয়ে আলোচনা বা চর্চা বিশেষ হয় নি বা হয় না বললেই চলে। ইদানীংকালে অবশ্য কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধিৎসায় আফ্রিকা সম্বন্ধে ইংরাজীতে গ্রন্থরচনা করেছেন কিংবা প্রবন্ধ লিখেছেন। তার মধ্যে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'আফ্রিকানিজম' বইটি উল্লেখযোগ্য। যোগাযোগের অভাবই বোধহয় এই ব্যর্থতার একমাত্র কারণ নয়। বাঙলা-দেশের সঙ্গে জাপানের কী বা যোগাযোগ? অথচ 'দূর প্রাচ্য' বা 'পূর্ব এশিয়া' কলকাতা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়ে থাকে। যোগাযোগ ছাড়া তাই আঞ্চলিক গুরুত্বও উল্লেখনীয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একদিন আফ্রিকার ভূমিকা ছিল অকিঞ্চিৎকর। তাই তার পঠন-পাঠনে এত কার্পণ্য। অবশ্য ভারতের বিদেশী শাসকদের কাছে আফ্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য তত্ত্বের প্রয়োজন যে একেবারে ছিল না তা নয়। কিন্তু তার জন্য তো লণ্ডনে ছিল ইণ্টারন্যাশনাল আফ্রিকান ইন্সটিট্যুট, রয়্যাল এম্পায়্যার সোসাইটি এবং কলোনিয়াল অফিস।

পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের প্রতিফলন পাওয়া গেল ১৯৫৭ সালে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভাগে 'বর্তমান আফ্রিকা' নামক একটি ঐচ্ছিক বিষয় প্রবর্তনে। দুঃখের বিষয়, তিন বছর বাদে এই পাঠ্যক্রম উঠিয়ে দেওয়া হয়। অধুনা, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিপার্টমেণ্ট অফ আফ্রিকান স্টাডিজ'ই প্রধানতঃ আফ্রিকা-তত্ত্বের পঠন-পাঠন ও গবেষণা চালায়। এ ছাড়া কলকাতা, রাজস্থান প্রভৃতি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আফ্রিকার ইতিহাস ও রাজনীতির ওপর ঐচ্ছিক পার্বক্রম প্রবর্তিত হয়েছে।

অথচ, আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে। তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বাড়তির পথে। এ ছাড়া পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় দশলক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত আফ্রিকা-বাসীদের কথা ভুললে চলবে না। একে একে এই সব দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ভারতীয় বাসিন্দাদের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে। এক কথায়, আজ না হোক কাল আফ্রিকা-চর্চা করেছে এমন বহু লোকের প্রয়োজন আমাদের হবে। ভবিষ্যতের এ দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি আজ থেকেই করা উচিত।

কিন্তু তার আয়োজন কোথায়?

পরিশিষ্ট ঃ দুই

আফ্রিকার এযুগের ইতিহাসের বর্ষপঞ্জী ঃ ১৪৫০-১৯৬০

১৪১৫ পর্তুগাল কর্তৃক সেউতা (মরক্কো উপকূলে অবস্থিত) দখল।

১৪৪০-৫০ সর্বপ্রথম আফ্রিকান ক্রীতদাস পর্তুগালে আনীত হয়।

১৪৮৬ বার্থোলোমিউ দিয়াজ উত্তমাশা অন্তরীপ পৌছান।

১৪৯৮ ভাস্কো ডা গামা কালিকট পৌছান।

১৫০২ হাইতি দ্বীপে সর্বপ্রথম আফ্রিকান ক্রীতদাস আনীত হয়: আমেরিকায় দাসব্যবসায়ের শুরু।

১৫৬২ সার জন হকিসের নেতৃত্বে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা আফ্রিকা এবং আমেরিকার মধ্যে দাসব্যবসায় শুরু করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ দাস-ব্যবসায়ের স্বর্ণ যুগ। পর্তুগালের সঙ্গে হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

১৬৫২ ইয়ন ফন রীবেকের নেতৃত্বে ওলন্দাজরা উত্তমাশা অন্তরীপে বসতি স্থাপন করে।

১৭৮৭ মুক্ত ক্রীতদাসের পুনর্বাসনের জন্য সিয়েরা লিওন কোম্পানী স্থাপিত হয়।

১৮০৬ উত্তমাশা অন্তরীপ ইংল্যাণ্ডের অধিকারে আসে।

১৮০৭ বৃটিশ পার্লামেণ্ট দাসব্যবসার বেআইনী ঘোষণা করে।

১৮০৮ সিয়েরা লিওন কোম্পানী ইংল্যাণ্ডের রাজার হাতে সিয়েরা লিওন উপনিবেশ প্রত্যর্পণ করে।

১৮১৪ নেপোলিয়ান-এর পরাজয়ের পর ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কেপ (উত্তমাশা অন্তরীপ) উপনিবেশের অধিকার ইংল্যাণ্ডকে দেয়।

১৮২৩ আমেরিকা থেকে মুক্ত ক্রীতদাসদের লাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়।

১৮৩০ ফ্রান্স আলজেরিয়া দখল করে।

১৮৩৩ বৃটিশ সাম্রাজ্যে দাসপ্রথা বেআইনী করা হয়।

১৮৩৬-৪০	হাজার হাজার বুয়র ঔপনিবেশিক কেপ উপনিবেশ ছেড়ে উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করে ('গ্রেট ট্রেক' বা 'মহাভিনিষ্ক্রমণ')।
১৮৪৩	নাটাল বৃটিশ উপনিবেশ ঘোষিত হয়।
১৮৪৭	লাইবেরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।
১৮৫২	স্যাণ্ড নদী চুক্তি মারফত বৃটেন ট্রান্সভালের স্বাধীনতা স্বীকার করে।
১৮৫৪	ব্লুমফন্টেন চুক্তি মারফত বৃটেন অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের স্বাধীনতা স্বীকার করে। কেপ প্রদেশে সব জাতির সমান অধিকার সহ প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৮৫৫	লিভিংস্টোন ভিক্টোরিয়া প্রপাত আবিষ্কার করেন এবং জাম্বেসী নদীর মোহনায় পৌছান।
১৮৬০	চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক আখের বাগিচায় কাজ করবার জন্যে নাটালে আনীত হয়।
১৮৬৬	দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বর্লে-য় হীরক আবিষ্কার।
১৮৬৮	বাসুতোল্যাণ্ড বৃটিশ 'আশ্রিত' রাজ্যে পরিণত হয়।
১৮৬৯	সুয়েজ খালে জাহাজ চলাচল শুরু।
১৮৭১	স্ট্যানলে ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদের উপকূলে উজিজিতে লিভিংস্টোনকে খুঁজে পান।
১৮৭২	কেপ প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৮৭৭	বৃটেন ট্রান্সভাল দখল করে।
১৮৮০	প্রথম বুয়র যুদ্ধ।
১৮৮১	ফ্রান্স টিউনিসিয়া আক্রমণ করে এবং 'আশ্রিত' রাজ্যের পত্তন করে। ট্রান্সভালের স্বাধীনতা পুনঃস্বীকৃত।
১৮৮২	ফ্রান্স আইভরী কোস্ট দখল করে। মিশরে বৃটিশ সামরিক হস্তক্ষেপ শুরু হয়। সুদানে বিদ্রোহ।
১৮৮৪	স্বাধীন কঙ্গো রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। জার্মানীর দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা অধিকার করে এবং ক্যামেরুন্স ও টোগোল্যাণ্ডে আধিপত্য বিস্তার। বৃটেন বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডে আশ্রিত রাজ্য ঘোষণা করে।

১৮৮৪-৮৫ বের্লিন সম্মেলন। কঙ্গো স্বাধীন রাজ্যের জন্ম।

১৮৮৫ জার্মানী জাঞ্জিবারে নৌবাহিনী প্রেরণ করে। জার্মান পূর্ব আফ্রিকা (যার মধ্যে ছিল ট্যাঙ্গানাইকা ও রুয়াণ্ডা উরুণ্ডি) স্থাপিত হয়। খার্তুমে গর্ডনের মৃত্যু।

১৮৮৬ উইভ ওয়াতার্সর‍্যান্দে স্বর্ণ আবিষ্কার।

১৮৮৮ সেসিল রোড্স রোডেশিয়াতে খনির কন্‌সেশন পান।

১৮৮৯ সুদানে ইঙ্গ-মিশরীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

১৮৯০ জাঞ্জিবার বৃটিশ 'আশ্রিত' রাজ্যে পরিণত হয়।

১৮৯১ নায়াসাল্যাণ্ড বৃটিশ 'আশ্রিত' রাজ্য বলে ঘোষিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়ার অধিকাংশ বৃটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা কোম্পানী পায়।

বেচুয়ানাল্যাণ্ড ও মাণ্টাবেলেল্যাণ্ডেও বৃটেনের 'আশ্রিত' রাজ্য বলে ঘোষিত হয়।

১৮৯৩ উগাণ্ডা বটিশ 'আশ্রিত' রাজ্যে পরিণত হয়।

১৮৯৪ ফ্রান্স দাহোমে রাজ্য অধিকার বরে।

১৮৯৫ কেনিয়ায় বৃটিশ 'আশ্রিত' রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেনিয়া-উগাণ্ডা রেলপথ নির্মাণ শুরু। ট্রান্সভালে জেমসন আক্রমণ।

১৮৯৯-১৯০২ দ্বিতীয় বুয়র যুদ্ধ। ট্রান্সভাল এবং অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট বৃটিশ অধিকারে আসে।

১৯০০ নাইজেরিয়া নিয়ন্ত্রণ রয়্যাল নাইজার কোম্পানীর হাত থেকে বৃটিশ কলোনিয়্যাল অফিসের হাতে স্থানান্তরিত হয়।

১৯০৪-১৯০৬ উত্তর নাইজেরিয়ায় বৃটিশ অভিযান।

১৯০৫ ইতালী সোমালিল্যাণ্ডের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে।

১৯০৬ ট্রান্সভালে পাস-আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় সত্যাগ্রহ শুরু হয়।

১৯০৭ অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট ও ট্রান্সভালে দায়িত্বশীল সরকারের পুনঃপ্রবর্তন করা হয়।

১৯০৮ বেলজিয়াম কর্তৃক কঙ্গো স্বাধীন রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ।

১৯১০ দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন সংগঠিত হয়।

১৯১১ ইতালী তুরস্কের কাছ থেকে লিবিয়া ছিনিয়ে নেয়।

১৯১২ মরক্কোয় আরব ও স্প্যানীয় 'আশ্রিত' রাজ্য স্থাপিত হয়।

১৯১৪ মিশর বৃটিশ 'আশ্রিত' রাজ্যে পরিণত হয়।

১৯১৪-১৮ প্রথম মহাযুদ্ধ।

১৯১৯ জার্মানীর আফ্রিকান উপনিবেশগুলি বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনে ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথম প্যান-আফ্রিকার কংগ্রেসের অধিবেশন।

১৯২২ মিশর নামে মাত্র স্বাধীনতা পায়।

১৯২৩ দক্ষিণ রোডেশিয়ায় দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তিত হয়।

১৯২৪ বৃটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা কোম্পানীর হাত থেকে উত্তর রোডেশিয়ার শাসনভার বৃটিশ সরকার গ্রহণ করে।

১৯৩১ স্টাটুট অফ্ ওয়েস্টমিনস্টার বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয়। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন পূর্ণ স্বাধীনতা পায়।

১৯৩৫ ইতালী ইথিওপিয়া আক্রমণ করে।

১৯৩৬ কেপ প্রদেশের সাধারণ ভোটার তালিকা থেকে আফ্রিকানদের নাম সরিয়ে ফেলা হয়। অর্থাৎ আফ্রিকানদের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। ইথিওপিয়া ইতালীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৩৯ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অরেম্ভ হয়।

১৯৪০ প্রথম কলোনিয়াল ডিভেলপ্‌মেণ্ট ও ওয়েলফেয়ার অ্যাক্ট পাস হয়।

১৯৪১ ইথিওপিয়া থেকে ইতালী বিতাড়িত হয়। সম্রাট হাইলে সেলাসি পুনর্বার সিংহাসনে বসেন।

১৯৪৪ ব্রাজাভিলে ফরাসী ঔপনেবিশিক শাসন পর্যালোচনার জন্য সম্মেলন।

১৯৪৫ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও অছি ব্যবস্থা স্থাপিত হয়।

১৯৪৬ ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকায় আর. ডি. এ স্থাপিত হয়। চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৮ দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের সাধারণ নির্বাচনে ন্যাশানালিস্ট পার্টি ক্ষমতা পায়।

১৯৫০ মেরেৎসে খামা ও সেকেদি খামা নির্বাচিত হন। ভূতপূর্ব ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড দশ বছরের জন্য 'অছি' অঞ্চল বলে ঘোষিত হয়।

১৯৫১ গোল্ডকোস্ট উপনিবেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ডক্টর নক্রুমা পরিচালিত ক্যনভেনশন পিপল্‌স পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।
আইন ও কার্যনির্বাহী পরিষদে নির্বাচিত আফ্রিকান সংখ্যাধিক্য সহ নতুন সংবিধান নাইজেরিয়ায় প্রবর্তিত হয়।
দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের কেপ প্রদেশে আফ্রো-ইওরোপীয় বর্ণসঙ্কর ভোটারদের সাধারণ ভোটার তালিকা থেকে অপসারণকে কেন্দ্র করে সাংবিধানিক বিবাদের সূত্রপাত হয়।

১৯৫২ লিবিয়া স্বাধীন হয়। কেনিয়ায় মাউ মাউ আন্দোলনের শুরু।
ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়।

১৯৫৩ উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া এবং নায়াসাল্যাণ্ড নিয়ে মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। বুগাণ্ডার কাবাকা (রাজা) নির্বাসিত হন। মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৪ আলজেরিয়ার বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। কেনিয়ায় লিটল্টন বহু-জাতিক সংবিধান প্রবর্তিত হয়। গোল্ডকোস্টে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন : ডক্টর নক্রুমার পুনরায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। গোল্ডকোস্টে বিরোধীদল হিসাবে ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেণ্টের উৎপত্তি। নাইজেরিয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীক সংবিধান গৃহীত হয়।

১৯৫৫ উগাণ্ডার কাবাকার প্রত্যাবর্তন এবং উগাণ্ডায় নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয়। সুদান স্বাধীন হয়।

১৯৫৬ গোল্ডকোস্টের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন। নক্রুমা ও তাঁর দলের জয়লাভ। মেরেৎসে খামা বাসুতোল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। সুয়েজ সঙ্কট। কেপ প্রদেশের আফ্রো-ইওরোপীয় বর্ণসঙ্কর ভোটারদের সাধারণ নির্বাচক তালিকা থেকে অপসারিত করা হয়।

মে, ১৯৫৬ বৃটিশ টোগোল্যাণ্ডের গণভোটে ঠিক হয় বৃটিশ টোগোল্যাণ্ড স্বাধীন রাজ্য ঘানার অন্তর্ভুক্ত হবে।

মার্চ, ১৯৫৭ কেনিয়ায় প্রথম আফ্রিকান সদস্য নির্বাচিত হয়।

মার্চ, ১৯৫৭ ঘানা স্বাধীনতা লাভ করে।

জুলাই, ১৯৫৭ জাঞ্জিবার আইনসভার প্রথম নির্বাচন হয়।

এপ্রিল, ১৯৫৮ স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্র সমূহ আক্রা সম্মেলনে মিলিত হয়।

মে, ১৯৫৮ আলজেরিয়ার সংকট চতুর্থ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটায় ও জেনারেল দ্য গল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

সেপ্টেম্বর, '৫৮ পঞ্চম ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গণভোটে দেওয়া হয়। গিনি স্বাধীনতার জন্য ভোট দেয়। অন্য ফরাসী আফ্রিকান দেশ সংবিধান গ্রহণ করে।

নভেম্বর, '৫৮ সুদানে সামরিক চক্র ক্ষমতা দখল করে। ঘানা ও গিনি ঘোষণা করে যে তারা এক ঐক্যবদ্ধ রাজ্য গঠন করবে।

ডিসেম্বর, '৫৮ বাসুতোল্যাণ্ডে নির্বাচিত আইন সভা গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

১৯৫৯ আদ্দিস আবাবায় আফ্রিকার কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্মেলন। লেওপোল্ডভিলে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বেকার শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলে বেলজিয়ান সরকার কঙ্গো সম্পর্কে নীতি পরিবর্তন করে।

গিনির স্বাধীনতা লাভ।

মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান পর্যালোচনার জন্য মঙ্কটন কমিশন নিয়োগ করা হয়।

১৯৬০ সারা বছরে: মোট ১৭টি দেশ স্বাধীনতালাভ করে: কামেরুন, টোগো, মরিতানিয়া, আইভরী কোস্ট, মালি, সেনেগাল, ভলতা, নাইজার, দাহোমে, নাইজেরিয়া শাদ, গাবোঁ, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (পূর্বতন ফরাসী মধ্য কঙ্গো), মালাগাসী, সোমালিয়া, কঙ্গো (পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গো)

জুলাই, ১৯৬০ স্বাধীনতা পাবার অব্যবহিত পরেই বেলজিয়ান কঙ্গোয় আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সূত্রপাত হয়।

ডিসেম্বর, ১৯৬০ মোবুতুর সৈন্যদল লুমুম্বাকে বন্দী করে।

ডিসেম্বর, ১৯৬০ দ্বাদশ আফ্রিকান রাষ্ট্রের ব্রাজাভিল সম্মেলন।

ডিসেম্বর, ১৯৬০ মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য সম্মেলন।